শত্রুপক্ষের মেয়ে

মনোজ বসু

১৯৬০

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চা

কলি -১২

এই লেখকের—

ভুলি নাই (২৫শ সং)
ওগো বধূ সুন্দরী (৩য় সং)
আগষ্ট, ১৯৪২ (৪র্থ সং)
বাঁশের কেল্লা (৪র্থ সং)
যুগান্তর (২য় সং)
নবীন যাত্রা (৩য় সং)
জলজঙ্গল (২য় সং)
শ্রেষ্ঠ গল্প (৪র্থ সং)
বনমর্মর (৪র্থ সং)
নরবাঁধ (৪র্থ সং)
পৃথিবী কাদের ? (৩য় সং)
দুঃখ-নিশার শেষে (৩য় সং)
একদা নিশীথকালে (৪র্থ সং)
দেবী কিশোরী (৩য় সং)
উলু (২য় সং)
দিল্লি অনেক দূর
কাচের আকাশ
খদ্যোত (২য় সং)
বকুল (৩য় সং)
এক বিহঙ্গী (২য় সং)
সৈনিক (৬ষ্ঠ সং)
শত্রুপক্ষের মেয়ে (৪র্থ সং)
কুঙ্কুম (২য় সং)
কিংশুক
চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব (৫ম সং)
চীন দেখে এলাম ২য় পর্ব (২য় সং)
সবুজ চিঠি
নূতন প্রভাত (৪র্থ সং)
প্লাবন (৪র্থ সং)
বিপর্যয়
রাখিবন্ধন

মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতিতে

তুমি আমি এবং আর পাঁচটি ভদ্রসন্তান শুইয়া বসিয়া হাই তুলিয়া আরাম করিয়া এই কাহিনী পড়িতেছি। আমার মনের মধ্যে বারম্বার ছবি ভাসিতেছে—জনহীন ছায়াহীন দিগন্তবিসারী এক বালুক্ষেত্র। তারই কিনারে উন্মুক্ত আকাশের নিচে না জানি এতক্ষণ মালঞ্চ নদীর কত খেলাই জমিয়া আসিল! জোয়ার যদি আসিয়া থাকে, লক্ষকোটি তরঙ্গ-শিশু খলবল করিতে করিতে দূর-দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে, আনন্দ-বন্যায় দুই কূল ডুবাইয়া ভাসাইয়া ছোট ছোট বাহু দিয়া তারা বাঁধের গায়ে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, একবার বা ছলাৎ শব্দে লাফাইয়া মুখ উঁচু করিয়া দেখিতে চায়, ওদিকের কাণ্ডটা কি? দেখিতে পায় না কিছুই—আবার লাফাইয়া ওঠে—আবার—আবার। বাঁধের খোলে মাছের আবাদ, জলের তুফান। মানুষজন নাই একটা, টিলার উপর কেবল অনেকগুলা ভিটা—দ্বীপের মতো সংখ্যাতীত ভিটা জাগিয়া রহিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধের গায়ে লুটোপুটি খাইয়া অবসন্ন জল-তরঙ্গ অবশেষে ভাঁটার টানে ফিরিয়া যায়, চর জাগিয়া ওঠে। মসৃণ চরের কাদায়, শান্ত গাঙের জলে সূর্যলোক বিষণ্ণ হাসির মতো ঝিলমিল করিতে থাকে।

কতদিন ঐ পথে নৌকা করিয়া গিয়াছি। তোমরা কি ভাবিবে জানি না, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়। সেবার হইল কি—একদিন খররৌদ্রে দুপুরের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়া গেলাম, অসাড় নিস্পন্দ বালুচর। ফিরিবার মুখে রাত্রি হইল। ওরই কাছাকাছি আসিয়া বড় ঝড় উঠিল। নোঙর ফেলিয়া চরের উপর নামিয়া সভয়ে ঝড় থামিবার প্রতীক্ষা করিতেছি, মনে হইল, স্পষ্ট মনে হইল—আমাদেরই মতো আরও বহু জন তেপান্তরের মাঠে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে, তাদের নিশ্বাস নদীর এপার-ওপার ফুঁসিয়া বেড়াইতেছে। অনেক রাত্রে ঝড় থামিয়া গেল, কিন্তু মেঘ কাটিল না। এমন গাঢ় নিনিরীক্ষ অন্ধকার যে সে যেন জগদ্দল পাথর হইয়া বুক পিষিয়া মারে। নৌকা আবার

চলিল। জলের ঢেউয়ে জোনাকির মতো এক একবার আলোর ফিনকি ফোটে। কোনদিকে কিছু নাই, কি মনে করিয়া বাহিরে তাকাইয়াছি—দেখিলাম, আমাদেরই পাশে পাশে ভাঁটা সরিয়া-যাওয়া অনাবৃত নদীবক্ষের উপর দিয়া সারি বাঁধিয়া ছায়ামূর্তির প্রকাণ্ড এক দল চলিয়াছে—এক—দুই—তিন—চার—একের পর এক—কে তাদের গণিয়া পারিবে? দৃপ্ত সমুন্নত গতি-ভঙ্গিমা, কবাট-বক্ষ—নিঃশব্দে পা ফেলিয়া জলস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তারা চলিয়াছে।

মাঝি! মাঝি!

ছইয়ের মধ্য হইতে একজনে তাড়াতাড়ি আমার টর্চটা লইয়া আসিল। আলো ফেলিয়া দেখি, কিছুই না।

আর একবার পূর্ণিমার রাত, বড় পরিষ্কার জ্যোৎস্না, বোধ করি সেটা চৈত্রের শেষাশেষি হইবে। বাঁধে নূতন মাটি দিয়াছে, হু-হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে, বালু উড়াইয়া শরীর পাখা মেলিয়া সমস্ত চরটাই যেন আকাশে উড়িয়া যাইতে চায়। পালে নৌকা চলিতেছিল, দাঁড়িরা শুইয়া শুইয়া খঞ্জনী বাজাইতেছে, বাজনা থামাইতে বলিলাম। মনে হইল, যেন অসমান বহুবিস্তীর্ণ বাঁধের ওধারে লোকালয়-সীমার বহুদূরে আজ রাত্রে বাংলার দুরন্ত সন্তানগুলি শ্মশান-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। যে লাঠিগুলা একদা মালঞ্চের স্রোতে তারা ভাসাইয়া দিয়াছিল, খুঁজিয়া পাতিয়া সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া অম্বুবাচীতে, বীরাষ্টমীতে, লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় পৌষমাসের দুরন্ত শীতের রাত্রে জলন্ত আগুনের আলোয় যেমন করিয়া বীরভঙ্গিমায় দাঁড়াইত, আজ আবার তেমনি দাঁড়াইয়াছে। জানি, এসব কিছু নয়, দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। বাতাস উড়াইয়া লইয়াছে তাদের চূর্ণীভূত অস্থি-পঞ্জর, যুগ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে তাদের সমস্ত স্মৃতি। বিশ্বাস কর ভাই, পিছনের জন্য আমি দুঃখ করি না, আমাদের আনন্দ-বেদনা আগামী দিনকে ঘিরিয়া। অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখিতে তবু ভাল লাগে। এ মোহ কাটাইয়া ওঠা যায়।

প্রথম অধ্যায়

(১)

চিতলমারির খাল আসিয়া পড়িয়াছে মালঞ্চ নদীতে। খালের যেমন শিষ্ট-শান্ত হওয়া উচিত, চিতলমারি সে রকমের নয়। অনেকগুলা দহ—বিশেষ করিয়া মোহানার কাছাকাছি চণ্ডীদহ নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে জোয়ারের সময় জল যেন পাগল হইয়া ওঠে। খালের এপারে ঢালিপাড়া—ইহারা শ্যামগঞ্জ তরফের। অনেক দিন আগেকার কথা—শ্যামগঞ্জের নরহরি চৌধুরির সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শিবনারায়ণ ঘোষ ওপারে বরণডাঙায় গিয়া নূতন বসতি করিলেন। তারপর ওপারে ঠিক এই রকম এক ঢালিপাড়া পত্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। শিবনারায়ণের পরম ভক্ত সাকরেদ চিন্তামণি—নরহরির তুলনায় কোনদিক দিয়া খাটো হইতে রাজি নয়। সে চায়, শিবনারায়ণ আবার নূতন তালুক-মুলুক করিবেন, সদর্পে দলবল লইয়া চিন্তামণি খাল-ধার দিয়া ওপারের সঙ্গে টক্কর দিয়া বেড়াইবে। কিন্তু সকল উৎসাহ নিভাইয়া দিলেন শিবনারায়ণ। বলিলেন, না বাপু, ওতে শান্তি নেই। ও-পথ ছাড়তে না পার তো শ্যামগঞ্জে ফিরে যাও। নরহরি লুফে নেবে তোমাদের।

দলের অনেকেই সেই হইতে শ্যামগঞ্জে ফিরিয়া গিয়া মহাস্ফূর্তিতে আছে। চিন্তামণি কেবল ওপারে রহিয়া গিয়াছে, মরমে মরিয়া আছে। আর যে ক'জন আছে তারা অক্ষম অপটু—বয়স হইয়া গিয়াছে, দাঙ্গাবাজিতে আর আগ্রহ নাই তাদের। তারা জন-কিষাণ খাটে, ঘর-গৃহস্থালী করে। ক্রমশ বাহিরের আরও দু-দশজন জুটিয়া বরণডাঙার গাঙেও ছোট-খাট নিরীহ একটি পাড়া জমিয়া উঠিল।

চিন্তামণির সহিত ঘোষ-গিন্নি সৌদামিনীর দেখা হইলে হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, লাঠি কি ফেলে দিয়েছ ওস্তাদ ?

না মা, আছে আড়ার উপর তোলা। গরু তাড়াই, ডিঙি বাই বিলের মধ্যে। তাতে লাঠি লাগে না, লগি আর পাচনবাড়িতে কাজ চলে যায়।

তবে রেখেছ কোন ভরসায় ?

শিবনারায়ণের নাবালক ছেলে কীর্তিনারায়ণ। হয়তো তখন মায়ের ভয়ে দুলিয়া দুলিয়া সশব্দে শব্দরূপ কণ্ঠস্থ করিতেছে, আর চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। তাকে দেখাইয়া চিন্তামণি বলে, ঐ উনি ভরসা আমাদের। কর্তাভাই বড় হয়ে যদি নিরাশ করেন, সেইদিন মালঞ্চে লাঠি ভাসিয়ে দেব।

নিশ্বাস পড়ে সৌদামিনীর। এই ছেলে আবার বড় হইবে, বাপের মতো হইবে !

একটা গল্প বলি শোন—ঐ শ্যামগঞ্জ গ্রাম গড়িয়া উঠিবার গল্প। আগে এ অঞ্চলে কোন বসতি ছিল না, পূর্বদিকে মালঞ্চ আর উত্তর-পশ্চিমে ডাকাতের বিলের মাঝখানে পোড়ো-মাঠ ধূ-ধূ করিত। এই মাঠের মধ্যে আসিয়া পাঞ্জা সাজাইলেন শ্যামশরণ চৌধুরি মহাশয়। শ্যামশরণের নামেই মাঠ আজ শ্যামগঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঁচিশ বিঘা জমির উপর ইট-পাথরে তিনি প্রকাণ্ড চক-মলানো তিনমহল বাড়ি তুলিলেন। লোকলস্কর হাতিঘোড়া অতিথিশালা কোন-কিছুর অভাব রহিল না। এতদিন তো হইয়া গিয়াছে, আজও বাড়ির এক টুকরা মালমশলা খসে নাই—এমন মজবুত কাজকর্ম। কথা কহিলে এখনও কক্ষের মধ্যে গমগম করিয়া বাজে।

শোনা যায়, শ্যামশরণ বিষম জেদি মানুষ ছিলেন। এক রাত্রে মশারি না পাইয়া মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া যান, সে পৈতৃক বাড়িতে জীবনে আর পা দিলেন না। মায়ের মৃত্যুকালে—তখন শ্যামশরণ ধুমধাম করিয়া নগর পত্তন করিতেছেন—ভাইরা আসিয়া হাত-পা ধরিয়া কত কান্নাকাটি করিল,

শ্যামশরণ নিশ্চল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, যাও তোমরা, ব্যস্ত হোয়ো না—দেখা হবেই। তা হইল বটে! মায়ের শব শ্মশানে নামাইলে দেখা গেল, মলিন অবসন্ন মুখে সকলের পিছনে শ্যামশরণ একলা বসিয়া কাঁদিতেছেন। চিতার আয়োজন হইতে লাগিল। যতক্ষণ না চিতায় তোলা হইল, শ্যামশরণ মৃতার পা দু-খানির তলায় মাথা গুঁজিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিতার আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারপর শ্যামশরণ আর সেখানে নাই।

আর আর ভাইরা পৈতৃক বাড়িতে সাধ্যমতো শ্রাদ্ধ-শান্তি করিল, শ্যামশরণ বিপুল সমারোহে নিজের বাড়ি দানসাগরের আয়োজন করিলেন, ভাইদের কারও ডাকিলেন না। ভাইরা নাছোড়বান্দা হইয়া ডাকাডাকি লাগাইলে বরকন্দাজ ডাকিয়া তাদের হাঁকাইয়া দিলেন—এমনও শোনা যায়।

রাত্রিবেলা এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, তখন শ্যামশরণ একরকম শিশু বলিলেই হয়। আর একদিন হাঁকডাক করিয়া গ্রাম বসাইতে লাগিলেন, দোল-দোল-দুর্গোৎসবে অফুরন্ত টাকা খরচ করিতে লাগিলেন, দেশের মধ্যে ভয় ও সম্ভ্রমের অন্ত রহিল না। শ্যামশরণের তখন গোঁফে চুলে পাক ধরিয়াছে। লোকে বলিত, সাত ঘড়া সোনার মোহর তাঁর শোবার দালানের মেজেয় পুঁতিয়া তার উপর বিছানা পাতিয়া বুড়া ঘুমাইতেন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে ঘরের দরজা-জানলা সমস্ত আঁটিয়া নিজের হাতে সাবলে মেঝের পাথর উঠাইয়া বুড়া ঘড়াগুলি সমস্ত বাহির করিতেন; সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পাথরের উপর সোনার মোহর ঢালিতেন, তুলিতেন, চটুল হাসি হাসিতেন, আপনার মনে কত কথা বলিতেন, গল্প করিতেন···জানলায় কান দিয়া বুড়ার কোন কোন কর্মচারী একটু-আধটু তাহা শুনিতে পাইত। বৎসরের কেবল এই একটিমাত্র রাত্রি। পরদিন হইতে শ্যামশরণ আবার কঠোর রুক্ষ স্বল্পভাষী ভয়ানক মানুষটি। আর তিনশ' চৌষট্টি দিনের মধ্যে মুখে তাঁর তিলার্ধ বাচালতা নাই।

নিঃস্ব গৃহহারা গ্রাম্যশিশুর ভাগ্যে কি করিয়া অবশেষে এত সোনা জুটিল, সঠিক তাহা জানিবার উপায় নাই। কেউ বলে, রাজা প্রতাপাদিত্যের এক ভাঙা গড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে দেয়াল ধ্বসিয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া

যান। হাঁটু ভাঙিয়া গেল, তারপর খোঁড়া পায়ে কোন গতিকে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, দেয়ালে পোতা সারি সারি কলসির মধ্যে সোনা ঝিকমিক করিতেছে।

কিন্তু বরণডাঙার ঘোষ-বাড়িতে এখন এই সব গল্প কর দেখি—তারা নাক সিঁটকাইয়া বলিবে, ছাই! আসল খবর শুনিতে চাও যদি…

বউভাসির ঘাট বলিয়া বটের ছায়া-স্নিগ্ধ একটা জায়গা আছে ডাকাতের বিলের লকগেটওয়ালা বাঁধালের ধারে। অনেককাল আগের কথা। একবার মাঘের শেষাশেষি এক যুবা তার তরুণী বউকে বাপের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে পানসি করিয়া যাইতেছিল। বাপের বড় অসুখ—খবর পাইয়া বউটির আহার-নিদ্রা নাই। ন'পাড়ার হাটে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। সেখান হইতে চাল ডাল হাঁড়ি মশলাপত্র কিনিয়া ওপারের চরে পানসি বাঁধা হইল, বউটি পরম যত্নে রান্নাবান্না করিয়া স্বামীকে খাওয়াইল, দাঁড়ি-মাঝিদের খাওয়াইল, নিজে কিছু মুখে দিল না। এক ঘুমের পর যুবা জাগিয়া দেখে, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—বধূ কিন্তু ঘুমায় নাই, বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। পথের বিপদ-আপদের কথা শোনা আছে, তবু সে পানসি খুলিতে হুকুম দিল। পথ সোজা হইবে বলিয়া আড়াআড়ি বিল ফুঁড়িয়া যাইতে বলিল। তাহা হইলে ভোরের কাছাকাছি ঘাটে পৌঁছানো যাইবে। নহিলে নদীতে জোয়ারের অপেক্ষায় থাকিলে কাল বিকালের আগে যাওয়া যাইবে না।

তাদের দেখাদেখি ন'পাড়ার ঘাট হইতে একখানা হাটুরে-নৌকা খুলিয়া দিল। ছপ-ছপ করিয়া সেখানা খানিকটা পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। সে নৌকার লোক চেঁচাইয়া কহিল, আস্তে চল ভাই, একসঙ্গে যাওয়া যাক। দু-খানা একসঙ্গে দেখলে কোন সুমুন্দি এগোবে না।

এক বাঁক দু-বাঁক এমনি চলিল। জ্যোৎস্নার আলোর বিসর্পিল রেখার মতো অনতিস্পষ্ট বাঁধাল দেখা যাইতেছে। ভুল-পথে আসিয়াছে—এইখানে তো পথ আটকাইয়া গেল। খালের মধ্যে পড়িবার কথা—সেই খাল সোজা একেবারে মালঞ্চে পড়িয়াছে।

বধূ বিরক্তকণ্ঠে বলিল, রাখ দিকি একটুখানি তোমাদের বাওয়া। পথটা ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।

তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্য হইতে যুবা বাহির হইতেছিল, এক মুহূর্তে ঝকঝকে এক সড়কি তার গায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধিয়া গেল। সেইখানে সে কাত হইয়া পড়িল। দাঁড়িরা দাঁড় ফেলিয়া ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। নিশিরাত্রে বিলের বুক প্রতিধ্বনিত করিয়া গ্রাম-বধূ চিৎকার করিয়া উঠিল।

হঠাৎ বাঁধালের শুকনা পথে ঘোরার খুরের আওয়াজ। দূর হইতে গম্ভীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, মেয়েমানুষ কাঁদছে কেন হে সর্দার?

শ্যামশরণ বুড়া হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছেন সেই সময়, এসবে অরুচি ধরিয়া আসিয়াছে। সর্দার ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল। তার ভয়ও হইল। এখন শ্যামশরণ চৌধুরি কি জন্য এই বাঁধাল দিয়া চলিয়াছেন, কে জানে? সর্দার বলিল, কিছু নয় চৌধুরি মশায়, একটু-আধটু সোনা গায়ে আছে—দিতে চাচ্ছে না।

চৌধুরি বলিলেন, থাকগে—থামতে বল।

কিন্তু তার আগেই কান্না থামিয়া গেছে। বধূ বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামশরণের তখন এমন নামডাক পড়িয়া গেছে যে তাঁর পাল্লায় পড়িবার আগে মানুষ মরিয়া জুড়াইতে চায়।

মশাল জ্বালিয়া অনেক খোঁজাখুঁজি হইল। পাওয়া গেল পরদিন দিনের আলোয়—মরিয়া ফুলিয়া বাঁধালের ধারে পড়িয়া আছে। সেই বটগাছ আজও আছে, বউভাসির ঘাট বলে বটতলাকে।

শ্যামশরণের নামে সত্য-মিথ্যা এমন অনেক গল্প মানুষে রটাইয়া বেড়ায়। বিশেষ করিয়া শত্রুপক্ষ—বরণডাঙার ঘোষ-গিন্নির দল। সেকালে মানুষে আর ডাকাতের বিলে যত ডাকাতি হইত, তার সকল জিনিসপত্র বেচিয়া সকল গহনা গলাইয়া জমিয়াছিল নাকি শ্যামশরণের ঐ সোনা। একলা শ্যামশরণ নিজের দু-খানা হাতেই নাকি একশ-একটা মানুষ মারিয়া ডাকাতের বিলের হোগলা-কলমির দামের নিচে চালাইয়া দিয়াছিলেন।

সে যাই হোক, নগণ্য এক পথের ভিখারি কি করিয়াছিল, কি করিয়া

বেড়াইত, কে-ই বা তার খবর রাখে—কিন্তু দালান-ইমারত সোনা-জহরতের মালিক শ্যামশরণকে একটি দিনও কেউ রাত্রে বাহির হইতে দেখে নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতে শোবার ঘরের চারিপাশে খুব উজ্জ্বল অনেক আলো জ্বালিয়া শ্যামশরণ দরজা আঁটিয়া দিতেন। সেই দিনের মতো আলোয় বাহিরে ঢালিরা ঢাল-সড়কি লইয়া সমস্ত রাত্রি টহল দিয়া ফিরিত। কিন্তু চৌধুরির শত্রুরা রটনা করে, একশ-এক সেই বিদেহী আত্মা তাদের হকের ধন পাছে কাড়িয়া লইয়া যায়, তাই তাঁর এ সতর্ক ব্যবস্থা।

রাতের পর রাত কাটিয়া যাইত, বুড়া কখনও ঘুমাইতেন না। বাহিরের ঢালিদের এক মুহূর্ত যদি ঝিমুনি আসিত, পদক্ষেপ ক্ষীণ হইয়া উঠিত, বজ্রকণ্ঠে বুড়া অমনি চিৎকার করিয়া উঠিতেন, কোথা ?

রাত্রির নিস্তব্ধতা সে বজ্রস্বরে কাঁপিয়া উঠিত। ঢালির খড়ম আবার চলিতে শুরু করিত খট-খট-খট—

শ্যামশরণের মনের কথা হইত একটু-আধটু কেবল দয়াময় ঘোষালের সঙ্গে। দয়াময় ছিলেন দেওয়ান। একদিন কথায় কথায় বয়সের কথা উঠিল। দয়াময় বলিলেন, কি আর এমন বয়স আপনার চৌধুরি মশায় ? ওর দুনো বয়সে মানষে চতুর্থ পক্ষে নামছে। আপনি একটি বিয়ে করুন।

রুক্ষদৃষ্টি মেলিয়া শ্যামশরণ বলিলেন, কেন ?

সে দৃষ্টির সামনে একটু ঘাবড়াইয়া দয়াময় বলিলেন, মানে আপনার অতুল ঐশ্বর্য দেখবে কে ? দু-একটা ছেলেপুলে না থেকে বাড়ি যেন আঁধার হয়ে আছে।

কেমন এক ধরনের অদ্ভুত হাসিতে শ্যামশরণের মুখ ভরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতেই লাগিলেন। তারপর বলিলেন, দু-একটা নয় দয়াময়, আমার সাত-সাতটা ছেলে। আবার বলিলেন, তারা আমার ঘর আলো করে রয়েছে—দেখবে ? একদিন দেখিয়ে দেব তোমায়।

সে দেখানো কোনদিন হইয়াছিল কিনা, কে জানে! তখন হাসিয়া দয়াময়ের কথাটা উড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু শ্যামশরণের মুখের হাসি বেশিক্ষণ

থাকিল না। মনে নিরন্তর ঐ ভাবনাটাই কাঁটার মতো ফুটিতে লাগিল, তাঁর অবর্তমানে এ বিপুল স্বর্ণ রক্ষা করিবে কে? রাতের ঘুম তো ছিলই না, দিনের কাজকর্মও অতঃপর সমস্ত ঘুচিয়া গেল। বিবাহে রুচি হইল না; সমস্ত জীবন পথে পথে ঘুরিয়া বিয়ে-থাওয়া সংসার-ধর্মে এমনি আতঙ্ক জন্মিয়াছিল যে সেটাও বোধকরি ডাকাতের বিলের স্বর্ণলিপ্সু ঐ একশ-এক আত্মার চেয়ে এক বিন্দু কম নয়। দিন-রাত ভাবিয়া ভাবিয়া শ্যামশরণ এক অতি ভীষণ বিচিত্র সঙ্কল্প করিলেন।

(২)

ডাকাতের বিলে আজকাল অজস্র পদ্ম ফুটিয়া থাকে, সেকালের মতো গভীর জল নাই, জলে ঢেউ নাই, জলের চেয়ে ইদানীং পাঁকই বেশি। বড় নৌকার পথ নাই—ডিঙি ও ডোঙা চলে মাঝে মাঝে। আর বারো মাসই নানারকম ফুলে বিল আলো হইয়া থাকে—কলমিফুল, সাপলাফুল, কেউটেফণার ফুল, লাল ও সাদা রঙের বড় বড় পদ্ম—যেন তার সীমা নাই, দৃষ্টি যতদূর যায় কেবল ঐ ফুলের সমুদ্র।

ঐ ডাকাতের বিলের ধারে—আজকাল যেখানটা নরহরি চৌধুরির গোলাবাড়ি, ওরই কাছাকাছি কোনখানে শ্যামশরণ মাটির নিচে সারি সারি সাতটা পাথরের কুঠারি তৈয়ারি করিলেন, দরজাগুলা তার লোহার। শ্যামশরণের বাড়ির কোন্ একটা গোপন জায়গা হইতে সুড়ঙ্গ আসিয়া সেই সাত দরজার মুখে লাগিয়াছে। সে-সুড়ঙ্গের মুখও পাথরে বাঁধানো, বাহির হইতে দেখিয়া কিছুই টের পাইবার জো নাই।

এত সব কাণ্ড হইয়া গেল, কতদিন ধরিয়া কত লোকজন খাটিল, অথচ বাহিরে কাক-পক্ষীতেও টের পাইল না। এই কাজে দয়াময় ঘোষাল নাকি দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশ দূর হইতে রাতারাতি রাজমিস্ত্রি আনিয়াছিলেন। নৌকা বাহিয়াছিল শ্যামশরণের যৌবন-দিনের সাকরেদরা—গলা কাটিয়া তাদের মারিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কথা বাহির হয় না। মিস্ত্রিদের অন্দর মহলে ঢুকাইয়া দিয়া দয়াময়

খালাস। তারপর শ্যামশরণ নিজের হাতে একটি একটি করিয়া সমস্ত দরজা-জানলা আঁটিয়া দিলেন, বাহিরে ক্ষীণতম শব্দটিও আসে না। মাসখানেক পরে আবার এক রাত্রিবেলা সেই দরজা খুলিয়া গেল। উঠান জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে মিস্ত্রিগুলার লাস; কাজের শেষে তারা বখশিশ পাইয়াছে। দরজা খুলিয়া শ্যামশরণ ইঙ্গিত করিলেন। খালকে তখন ভরা জোয়ার, বিপুল স্রোত। গরুর গাড়ি বোঝাই লাস ঢালা হইল সেখানে। সেই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া হতভাগারা বোধকরি বা নিজ দেশেই ফিরিয়া চলিল। দয়াময় ঘোষাল আগাগোড়া অন্দরবাড়ি খুঁজিয়া দেখিলেন, আরও অনেকে দেখিল—আশ্চর্য! মিস্ত্রিগুলা এতদিন ধরিয়া যে কি করিল, কোনখানে তার খোঁজ পাইবার জো নাই। অবিকল সেই আগেকার উঠান, একটি পাথরের কণিকা কোথাও খসে নাই, দেয়ালের জমাটে ক্ষীণতম রেখাটি পড়ে নাই। সুড়ঙ্গের গোপন মুখ জগতের মধ্যে জানিয়া রাখিলেন একমাত্র শ্যামশরণ।

গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা আকাশ হইতে যেন আগুন-বৃষ্টি হইতেছে। এমন সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শ্যামশরণের অতিথি-শালায় উঠিলেন, সঙ্গে বারো বছরের ফুটফুটে নধর গোছের একটি ছেলে। কথায় কথায় প্রকাশ হইল, ছেলেটি মামার বাড়ি থাকিয়া পড়াশুনা করে, মামা অধ্যাপক মানুষ—সম্প্রতি বাপকে পাইয়া জেদ করিয়া দিন কয়েকের জন্য তাঁর সঙ্গে বাড়ি চলিয়াছে। এত পথ রৌদ্রে হাঁটিয়া ঘামিয়া কচি মুখখানা জবাফুলের মতো টকটক করিতেছে। শ্যামশরণ তাড়াতাড়ি হাঁক-ডাক করিয়া বাড়ির মধ্য হইতে তরমুজের শরবৎ আনাইয়া বাপ-ছেলেকে খাওয়াইলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। অচেনা পথ-ঘাট, সামনে অন্ধকার রাত্রি—সেদিন রাত্রিটাও ঐখানে কাটাইয়া দেওয়া হইবে, এই রকম সাব্যস্ত করিয়া শ্রান্ত ব্রাহ্মণ ছেলে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুম যখন ভাঙিল, তখন ঘোর হইয়া গিয়াছে। ছেলে পাশে নাই। কোথায় গেল? কোথায় গেল? কেউ সে খবর দিতে পারে না। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোথায় হয়তো কোন এক ছেলের দলের সঙ্গে ভাব করিয়া খেলাধূলায় মাতিয়াছে।

কিন্তু রাত্রি গভীর হইল, ছেলের সন্ধান নাই। বাপ শেষে পাগলের মতো হইয়া উঠিলেন। আর আর যারা খুঁজিতে গিয়াছিল, অবসন্ন হইয়া তারা ফিরিয়া আসিল : সমস্ত রাত্রি কেবল একটি লণ্ঠন হাতে বিপন্ন ব্রাহ্মণ অশ্রান্ত কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিলেন।

তখন ছেলে রুদ্ধদ্বার পাতালপুরীতে—বাপের ডাক সেখানে পৌঁছে না। শ্যামশরণ মাটির নিচে পাষাণ-কক্ষে কোমল করিয়া শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন, টানিতে টানিতে সোনা-বোঝাই একটা ঘড়া আনিয়া এখন শয্যার শিয়রে রাখিলেন। তারপর ঘুমন্ত ব্রাহ্মণ-শিশুকে সুড়ঙ্গ-পথে লইয়া গিয়া সেখানে শোয়াইয়া যেই পিছু ফিরিয়াছেন, অমনি আলো-বায়ুহীন কক্ষের মধ্যে বোধকরি বা নিশ্বাস ফেলিবার কষ্টেই বালক জাগিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া শ্যামশরণ ঘড়াং করিয়া লোহার দরজা বন্ধ করিলেন। তারপর কান পাতিলেন, শব্দ কিছুই বাহিরে আসিবার ফাঁক নাই। কিন্তু বুকের মধ্যে সেই সদ্য-জাগ্রত অসহায় বালকের আর্ত কণ্ঠ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটু স্থির থাকিয়া তারপর সুড়ঙ্গ ধ্বনিত করিয়া উন্মাদের মতো শ্যামশরণ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, জেগেছিস ? বেশ, বেশ বাবা, জাগলি তো খুব সজাগ হয়ে ঘড়া আগলে বসে থাক। যে নজর দেবে একটা মোচড় দিয়ে তার ঘাড় ফিরিয়ে দিবি অন্য দিকে—

দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া একলা এমনি হাসিয়া আবার শ্যামশরণ সহজ সাধারণ মানুষ হইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

ছেলে-ধরার ভয়ে ও-অঞ্চলের মানুষ তখন আর ছেলেপেলে ঘরের বাহির হইতে দেয় না, দিন-রাত চোখে চোখে সামাল করিয়া রাখে। তবু এমনিভাবে আরও ছয়-ছয়টা ব্রাহ্মণ-বালক চুরি হইয়া গেল। পৃথিবীর নিরন্ধ্র তলদেশে না খাইয়া তৃষ্ণায় শুকাইয়া দিনের পর দিন কঙ্কালসার হইয়া অবশেষে সেই কঙ্কাল গলিয়া পচিয়া গুঁড়া হইয়া কি প্রক্রিয়ায় যে অবশেষে পাতাল-রাজ্যের ধন-রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল, কে জানে! কিন্তু সাতটা যক্ষ দিনরাত সজাগ থাকিয়া ডাকাতের বিলের কাছাকাছি কোন এক অনির্দেশ্য জায়গায় শ্যামশরণের বিপুল

ন বহুকাল পাহারা দিয়া বেড়াইয়াছে, এ কাহিনী অবিশ্বাস করিবে তেমন মানুষ তখনকার দিনে এ অঞ্চলে একটা জন্মে নাই।

আরও মাস কয়েক ঘুরিয়া আবার কোজাগরী পূর্ণিমা আসিল—পরিষ্কার মেঘশূন্য রাত্রি। এ রাত্রে বিজন কক্ষে শুইয়া শুইয়া শ্যামশরণের ঘুম আর আসে না। কোথায় অনেক দূরে মাটির সুগভীর নিম্নে অবরুদ্ধ কক্ষতলে সাত ঘড়ার সকল সোনা ঝনঝন করিয়া বাজিয়া যাইতেছে, সাতটি সোনার শিশু সারা বৎসরের অন্ধকারের মধ্যে কত কান্না কাঁদিতেছে! অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া অনেক ইতস্তত করিয়া শ্যামশরণ অবশেষে নিষুপ্ত মধ্যরাত্রে দ্বার খুলিলেন। ইদানীং বাহিরে ঢালির পাহারা বন্ধ, পাকা পাহারার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে—মানুষের আর প্রয়োজন কি? জ্যোৎস্নালোকিত জনহীন উঠানের প্রান্তে গুপ্ত সুড়ঙ্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া কম্পিত শ্যামশরণ একটা মশাল জ্বালিয়া লইলেন, তারপর পাথর সরাইয়া ধীরে ধীরে সোপান বহিয়া পাতালে নামিয়া গেলেন। এমনি কতদূর চলিয়াছেন—দপ করিয়া হঠাৎ মশাল নিভিল, দম আটকাইয়া আসিল, অন্ধকারের মধ্যে কে যেন লোহার মত ভারী হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে। শ্যামশরণের চেতনা-লোপ হইয়া আসিল, তাহারই মধ্যে একবার উপরের দিকে তাকাইলেন। জ্যোৎস্নার যে ক্ষীণ রশ্মি সুড়ঙ্গের প্রবেশপথে ঢুকিয়াছিল, কোথাও তার একবিন্দু চিহ্ন নাই। সর্বনাশ! পাথর পড়িয়া গিয়া মুখ ইতিমধ্যে কখন আটকিয়া গিয়াছে, বাহিরের বাতাসের ঢুকিবার ফাঁক নাই। অতদূর উঠিয়া আসিয়া কাঁধে তুলিয়া মুখের সে পাথর সরাইয়া দিবেন, সে শক্তি শ্যামশরণের নাই। মুখ থুবড়াইয়া সেইখানে তিনি পড়িয়া গেলেন। সেই রাত্রে সোনার প্রহরী সাত যক্ষের সঙ্গে মিতালিটা তাঁর কি রকমের হইল, বাহিরের মানুষ কোনদিন তার তিলার্ধ জানিতে পাইল না।

(৩)

কিন্তু শ্যামশরণের এই রকম মৃত্যুর কাহিনী চৌধুরি-বাড়ির কাহাকে কোন দিন শুনাইও না, শুনিলে তোমাকে আস্ত রাখিবেন না। পুরাণো জমাখরচেও প্রমাণ রহিয়াছে, শ্যামশরণের চিতায় দশ মন চন্দনকাঠ এবং আড়াই মন ঘি পুড়িয়াছিল। শত্রুপক্ষেরা কিন্তু নাক সিটকাইয়া বলে, ঐ ঘি আর চন্দনকাঠ পর্যন্ত—আর কিছু নয়। মরার খবর পাইয়া ভাইরা আসিয়া মালঞ্চের কূলে তাড়াতাড়ি লোক-দেখানো প্রকাণ্ড এক চিতা সাজাইল। কিন্তু শব ছিল না তাহাতে। কলসি কলসি জলে চিতা ধুইয়া দিয়া তারা ভাবিল, চৌধুরি-বংশে শ্যামশরণ যে কালি লেপিয়াছেন, তাহাও নিঃশেষে ধুইয়া গেল বুঝি! তৃপ্তমনে তারা নিজেদের গরিব ঘরে ফিরিয়া গেল—যে পাষাণ-অট্টালিকা হইতে শ্যামশরণ একদা অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। দেওয়ান দয়াময় কত খোশামোদ করিলেন, কিছুতে না।

অগত্যা দয়াময় এবং তারপর তাঁর ছেলে-নাতিরা ঐ শ্যামগঞ্জের বাড়িতে বসবাস করিতে লাগিলেন। বাড়িটায় জঙ্গল হইয়া সাপ-শূকরের আস্তানা হয় নাই, সে কেবল তাঁরা ছিলেন বলিয়া। এই সময়ে এক কাণ্ড হইল। চৌধুরি-বংশের এক কুলাঙ্গার ছোট লোকের সমাজে ছড়া কাটিয়া আর গান গাহিয়া সমস্ত কিশোর বয়সটা কাটাইয়া দিয়া শেষে বুঝিলেন, ছড়ায় গানে পেট ভরিবার উপায় হয় না। নরহরি তাঁর নাম—এক সকালে সদলবলে তিনি হঠাৎ শ্যামগঞ্জের বাড়ি আসিয়া উদয় হইলেন। যারা নরহরির সঙ্গে কালীকীর্তন গাহিত, তারাই সব 'জয় কালী কালবারিণী' হুঙ্কার দিয়া লাঠি-সড়কি লইয়া বাড়ি ঢুকিয়া পড়িল। শুধু মাত্র গায়ের জোরেই একদণ্ডের মধ্যে দয়াময়ের নাতি-নাতবউদের পথে তুলিয়া দিয়া বাড়ি দখল হইয়া গেল।

ঢালিদের লইয়া দিন কয়েক খুব খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা সমারোহ চলিল। বাপ-মা ছিল না—নরহরি ভাই-ভাইপোদের আনিতে গেলেন

পৈতৃক বাড়ি হইতে। তারা আসিবে না। নরহরি কত লোভ দেখান, মিথ্যা করিয়া বলেন—সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া শ্যামশরণের সেই সাত ঘড়া মোহর পাইয়া গিয়াছেন, অতুল ঐশ্বর্যবান এখন তিনি। কিছুতেই তারা রাজি নয়—পূর্বপুরুষ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বারম্বার সেই কথা তোলে। রাগ করিয়া তখন নরহরি বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দিলেন। খোড়ো-ঘরগুলি ছাই হইয়া গেল দেখিতে দেখিতে।

বিয়ে করিলেন, এক ছেলে হইল, নাম রাখিলেন শ্যামকান্ত। নামের ঐক্যে যদি শ্যামশরণের বিদেহী আত্মা ইহার মধ্যে ভর করেন, সেকালের সেই শক্তি-সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য আবার যদি ফিরিয়া আসে! সুড়ঙ্গের খোঁজে সত্যই নরহরি তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন। উঠানের সমস্ত পাথর খুঁড়িয়া তোলাইলেন, দেয়ালের এখানে ওখানে সন্দেহ করিয়া কতবার ভাঙাভাঙি করিলেন, বছরের পর বছর কত চেষ্টা হইল, সোনার মোহরের একটি কণিকা মিলিল না।

মিলিবে কেমন করিয়া? শ্যামশরণের সে সোনা কি আছে, চাঁদামাছ হইয়া মালঞ্চের স্রোতে কবে ভাসিয়া গিয়াছে! দুষ্ট ছেলে-মেয়েরা যখন ঘুমাইতে চাহে না, মায়েরা এই গল্প করিয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকেন। এই মায়েদের মায়েরাও একদা এই গল্প করিয়া গিয়াছেন।

শ্যামশরণের মৃত্যুর অনেক বছর পরের কথা। তখন নাককাটির খাল ছিল না, চিতলমারি ছাড়া মালঞ্চের সঙ্গে আর কোন সংযোগই ছিল না ডাকাতের বিলের। একদিন খর দুপুরে জনমানবহীন বিলের প্রান্তে হঠাৎ পাতাল ভেদ করিয়া সাত যক্ষ মাটির উপরে উঠিয়া বসিল। সাতটি বড় বড় মলিন পিতলের কলসি—কিন্তু জীবন্ত চলনশীল। এত কাল পরে পৃথিবীর আলো-বাতাসের এতখানি আকস্মিক তৃষ্ণার হেতুটা কি বলা শক্ত, কিন্তু যক্ষেরা উঠিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল না—গড়াইতে গড়াইতে ধীরে ধীরে মালঞ্চের দিকে চলিল। এক বুড়ি ওদিককার গ্রামে দুধ বেচিতে গিয়াছিল। দুধ বেশি খরচ হয় নাই, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছিল—মাঠের মধ্যে অপরূপ ব্যাপার দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আরও আশ্চর্য কাণ্ড, যক্ষ বুড়িকে

ডাকিয়া বলিল ; সকলের আগে যেটি চলিতেছিল, তার সেই কলসির দেহ হইতে মিষ্টি রিণরিণে ছেলেমানুষের কন্ঠ আওয়াজ বাহির হইল, তেষ্টা পেয়েছে বুড়ি-মা, দুধ দাও—খাই। বুড়ির বিস্ময়ের ভাব তখন একরকম কাটিয়া গিয়াছে—কি করি না করি, মনের অবস্থাটা এই রকম। কলসির মধ্য হইতে পুনশ্চ কথা আসিল, মুখে ঢেলে দাও না একটু দুধ। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বুড়ি একপো দুধ মাপিয়া কলসিব মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বলিল, দাম? কলসি বলিল, আমার পিছে যে আসছে দাম দেবে সে-ই। পরের জন আগাইয়া আসিলে বুড়ি বলিল, বাবা আমার এক পো দুধের দাম? সে বলিল, আমার পিছে। এমনি করিতে করিতে সবার শেষের কলসি বলিল, আমার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দাও—একেবারে দু-হাতে যত সোনা ধরে নিয়ে নাও। আনন্দে বুড়ি কি করিবে ভাবিয়া পায় না। কোঁচড় পাতিয়া তাড়াতাড়ি দু-হাত ভরিয়া সোনা একবার তুলিল। আবার ভাবিল, এত সোনা রয়েছে, নিই না আর একবার—কি আর হবে! আর একবার যেই হাত ঢুকাইতে গেছে, কলসি গড়াইয়া অমনি তার ঘাড়ের উপর আসিল। বুড়ি পড়িয়া গেল, কলসির কানায় তার নাক দুই খণ্ড হইয়া গেল। কোঁচড়ের দিকে তাকাইয়া দেখে, সমস্ত সোনা চাঁদামাছ হইয়া লাফাইতে শুরু করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে মাঠের উপর দিয়া অনতি-গভীর খাল নামিয়া গেল। সাতটা যক্ষ উপুর হইয়া সমস্ত সোনা ঢালিয়া দিল, সোনা চাঁদামাছ হইয়া লাফাইতে লাফাইতে খালে পড়িল, বুড়ির আঁচলের গুলাও পড়িয়া গেল। সে খাল আজও আছে—নাককাটির খাল উহার নাম। নরহরির রান্নাবাড়ির পাশ দিয়া বাদাম-বনের ছায়ায় ছায়ায় মালঞ্চে গিয়া পড়ে।

(৪)

কালীর কিঙ্কর নরহরি চৌধুরি।

মাসের মধ্যে যে কয়টা দিন নরহরি বাড়ি থাকিতে পারেন, সকালবেলা রঘুনাথের সঙ্গে কুস্তি লড়েন, মাটি মাখিয়া বেলা দেড় প্রহর অবধি বসিয়া থাকেন,

দু-জনে। বিকালে ওস্তাদ চিন্তামণি দলসুদ্ধ সকলকে লাঠি-সড়কির তালিম দেয়। সন্ধ্যার পর কালীর গানের আসরও বসে কখন কখন। জনশ্রুতি, অমাবস্যার নিশিরাত্রে শ্মশানঘাটে গিয়া বারকয়েক নরহরি শব-সাধনার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অভাবে সাধনা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

হাতী-ঘোড়া লোক-লস্করে যখন শ্যামশরণের জমজমাট অবস্থা তিনি সেই সময়ে এক মন্দিরের ভিত্তি গাড়িয়াছিলেন, আর পাশে এক দীঘি কাটাইতেও শুরু করিয়াছিলেন। কোনটাই শেষ হয় নাই। নরহরি শেষ করিতে লাগিয়া গেলেন। মন্দিরে কালী-প্রতিষ্ঠা হইবে; আর দীঘির নাম আগেই দেওয়া হইয়াছে—কালীদীঘি।

সোনা খুঁজিয়া খুঁজিয়া নাজেহাল, তবু তিনি লোভ ছাড়েন নাই। এখন আর পাষাণ-প্রাসাদের মধ্যে নয়—যে নদী-খালের জলে সোনা মাছ হইয়া চরিতেছে, সেই জলের উপর ঘুরিয়া বেড়ান সোনার খোঁজে। কিছু পাইয়াছেনও নিশ্চয়, নহিলে হঠাৎ অবস্থা এমন ভাল হইয়া উঠিল কিরূপে? সম্প্রতি এক ভাল কারবার ফাঁদিয়াছেন—ধান-চাল কেনা-বেচা। আরও নাকি কোন কোন কারবার আছে। তার কতক লোকে জানে, কতক বা রটাইয়া বেড়ায়। কালীর করুণায় এসব হইতেছে—সঙ্কল্প করিয়াছেন, মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে প্রতি অমাবস্যায় বিপুল সমারোহে সেখানে কালীপূজা হইবে।

ইদানীং কাহন পনের ধান লইয়া নরহরি বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। ধানটা গত বছরের কেনা। গোলা বোঝাই পড়িয়া আছে, পোকায় খাইয়া তুষ করিয়া দিতেছে, কাটাইয়া দিবার নিতান্ত গরজ। কিন্তু ব্যাপারিরা দেখিয়া মুখ সিটকায়। বলে, ও-ধানের কাহন পাঁচ টাকার বেশি দেওয়া যাবে না, ভানাতে গেলে একটা চালও বেরুবে না—ক্ষুদ হয়ে আসবে।

কারবারে ভাগীদার সম্ভবত রঘুনাথও। মুনাফার বখরা কি আন্দাজে পাইয়া থাকে, বাহিরের কাহারও জানিবার উপায় নাই। কিন্তু শীত নাই, বর্ষা নাই, সময়-অসময় নাই, চৌধুরির মুখের কথাও লাগিবে না, একটুখানি চোখের ইশারা পাইলেই হইল—আর তাহাকে রুখিবে কে?

নরহরির মুখে ব্যাপারির প্রস্তাব শুনিয়া রঘুনাথ সজোরে ঘাড় নাড়ে।

না চৌধুরি মশায়, ষোল টাকা পড়তা পড়েছে—কি হবে পাঁচ টাকায় বেচে? ও পোকার পেটেই যাক, খেয়ে বাঁচুক পোকামাকড়। তাতে পুণ্যি আছে।

নরহরি বলেন, না হে—দিয়ে দাও ঐ পাঁচ টাকায়। ডাক ব্যাপারিদের। কালীর করুণা থাকে তো পাঁচই ঘুরে ফিরে পঁচিশ হয়ে সিন্দুকে উঠবে।

দুপুরবেলা ব্যাপারিরা ধান ঝাড়িয়া বস্তাবন্দি করিয়া নৌকায় তুলিল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল, সেই বস্তাগুলিই আবার ডিঙা বোঝাই হইয়া নাককাটির খালের মোহনার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। কিনারায় কসাড় গেঁয়োবন। তার মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে একটানা একটা শব্দ হইতেছে—টু-টু-টু! শুনিলে মনে হয়, অসহায় কোন পাখীর ছানা আঁধারে মাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। কাতর হইয়া ডাকাডাকি করিতেছে।

ডিঙা প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া সেই গেঁয়োবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পাখীর ছানার ডাকও সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ। নরহরি অপেক্ষা করিতেছিলেন, অন্ধকারে তাঁর চোখ দুইটি জ্বলিতেছিল। ডাকিলেন, রঘুনাথ!

রঘুনাথ ডিঙা হইতে লাফাইয়া পড়িল। বলিল, কিছু বেগ পেতে হয় নি চৌধুরি মশায়। ওস্তাদ সড়কি উঁচিয়ে দাঁড়ালেন, আমি একটা বাড়ি কষে দিলাম ব্যাপারির মাথায়। জোরে নয়, আস্তে—মোলায়েম করে। হাউ-হাউ করে সব বেটা কেঁদে উঠল। হুকুম করতেই তারা চরের উপর এক-হাঁটু জলে নেমে দাঁড়িয়ে শীতে আর ভয়ে হি-হি করে কাঁপতে লাগল। ধীরে সুস্থে ডিঙিতে মাল তুলে নিয়ে এই আসছি।

ওস্তাদ চিন্তামণি এখন একেবারে ভালমানুষ হইয়া ডিঙার গলুয়ে বৈঠা ধরিয়া বসিয়াছিল। সে হাসিয়া বলে, নৌকোয় উঠে তারা ঝপাঝপ উল্টোমুখো উজান ঠেলে ছুটেছে। জন্মে আর এ পাইতকে আসবে না, চৌধুরি মশায়।

বেশ ভালো! নরহরি রঘুনাথের পিঠে জোরে থাবা দিলেন। বলিলেন, ইদিকে আমিও বসে ছিলাম না—মহাদেব সা'র সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে ফেলেছি। প্রথমটা কিছুতেই রাজী নয়। বলে, জল-পুলিশের বড় হাঙ্গামা।

শেষকালে অবশ্য রাজী হল, কিন্তু কাহন দিতে চায় মোটে তিন টাকা হিসাবে।

রঘুনাথ আশ্চর্য হইয়া বলে, তিন টাকায় এক কাহন ধান ?

নরহরি বলেন, বাস্তু-ঘুঘু যে বেটা! দু-কথায় আঁচ পেয়ে গেছে, জুত পেয়ে দাও মারছে।

তারপর গম্ভীর হইয়া বলেন, তাই সই। ক্ষতি কি আমাদের ? কালীর করুণায় এই রকম দু-তিন বার হাত-ফিরতি হলেই পুষিয়ে যাবে। খাটনিটা বেশি হচ্ছে, কিন্তু দিনকাল খারাপ পড়ে গেছে—কি করা যাবে বল ?

জোয়ার আসিল একটু পরেই। গেঁয়োগাছের হাত দেড়েক অবধি ইহারই মধ্যে জলে ডুবিয়া গিয়াছে, ডালের গায়ে নদীজল ছলছল করিতেছে। মহাদেব সা'র মহাজনি ভাউলে দেখা দিল। প্রকাণ্ড নৌকা—মাঝি-মাল্লা দিয়া পনেরো-ষোল জন হইবে, তার কম নয়। ঘস্‌স্‌ করিয়া নৌকা চরে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব লাফাইয়া পড়িল দূর-বিস্তৃত সোনা-কাদার উপর। খালের মধ্যে অলক্ষ্য কোন জেলেদের উদ্দেশে সে হাঁক দিয়া বলে, মাছ কিছু পড়ল নাকি বেড়জালে ? চাট্টি মাছ দেবে, ও ভাই ? ডাল-ভাত গিলে তো পারা যাচ্ছে না।

আসিতেছে, মাছ আসিতেছে বই কি—দেখা যাইতেছে ঐ তো! ছায়ামূর্তির মতো নরহরি গেঁয়োবনের বাহিরে আসিলেন, আসিয়া মহাদেবের নৌকায় উঠিলেন। ফিসফিস কথাবার্তা—অন্ধকারের মধ্যে টাকা বাজিবার মৃদু আওয়াজ। তারপর নৌকার কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া নরহরি নামিয়া গেলেন। মাছ আসিয়া পড়িবে এইবার। মালঞ্চের নির্জন চরে নক্ষত্রের মৃদু আলোয় অতি নিঃশব্দে গেঁয়ো-জঙ্গল হইতে বস্তার পর বস্তা আসিয়া উঠিল মহাজনি নৌকায়। মহাদেব খুশী মনে নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিল। ছপছপ চারিখানা দাঁড় ফেলিয়া জোয়ারের সঙ্গে মন্থরগতিতে নৌকা চলিল।

নরহরি ও রঘুনাথ বাঁধের উপর। একদৃষ্টে নরহরি তাকাইয়া আছেন।

বাঁকের মুখে নৌকা অদৃশ্য হইল। দাঁড়ের আওয়াজ মৃদুতর হইতেছে। ক্রমশ তাহাও মিলাইয়া গেল।

রঘুনাথ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। এই রাত্তেই?

গম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, হুঁ—

দু-জনে ডিঙায় উঠিলেন। মাঝির জায়গায় বসিয়া চিন্তামণি।

রঘুনাথ বলিল, ওদের পাছু লাগতে হবে, ওস্তাদ—

তারপর নিচুগলায় চিন্তামণিকে বোঝাইতে লাগিল, কি অন্যায় দেখ—তিন টাকা করে কাহন কিনে নিয়ে গেল। কালকে শোলাদানার হাট—হাটে যদি ওর থেকে দু-পাঁচটা বস্তাও বেচে ফেলে, পোষানো যাবে না।

চিন্তামণি ভাল-মন্দ কিছু বলিল না, লগির ঠেলা দিয়া ডিঙা জঙ্গলের বাহিরে আনিল। বারকয়েক বৈঠা বাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। নরহরির দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। জল-পুলিসের কড়া নজর—কোথায় কোন বাঁকে ঘাপটি মেরে আছে, পাছু লাগলে সন্দ করবে।

রঘুনাথ বলিল, আগে মেরে ওঠ তা হলে। ওরা শোলাদানার হাটে চলেছে। ভীমখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে খাওয়া-দাওয়া করিগে আমরা। হুমুন্দিরা পৌঁছে গেলে তখন বোঝাপড়া হবে।

নরহরি গুম হইয়া ছিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, না, কাজ-কারবার চলবে না এমন করে। ব্যাপারিগুলো কি রকম ছ্যাঁচড়া! যোল টাকার মাল তিন টাকায় নিয়ে যায়—এটা তো বুঝে দেখবে না পুলিশ-বেটারা।

ছয় বৈঠা একসঙ্গে পড়িতেছে, ডিঙা তীরবেগে চলিয়াছে। রঘুনাথ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হাত-ফিরতি এমন কতবার চলবে চৌধুরি মশায়?

বিরস মুখে নরহরি বলিলেন, চলা না চলা আমাদের হাত নয়, ব্যাপারি মশায়দের দয়া। যতক্ষণ পড়তায় না পোষাবে, এই রকম চলবে। ব্যবসা করতে বসে লোকসান দিয়ে মরতে পারি নে তো!

চিন্তামণি বলে, কিন্তু যা বললাম চৌধুরি মশায়, ওঁদের নজর পড়ে যাচ্ছে। আজ সকালে নিজের চোখে দেখেছি, কার্তিকদা'র কাছে তিনখানা বোট

বাঁধা। কাদের নারকেল-বাগানে ঢুকে কাঁদি কাঁদি ডাব পাড়ছে আর খুব ডাব খাচ্ছে।

নরহরি বলিলেন, ওসব শুনে আর করব কি—দেখে শুনে সামাল হয়ে কাজকর্ম করতে হবে। সাধ করে কি এত ঝঞ্ঝাট পোহাচ্ছি? এই শ্যাম-গঞ্জে মাল তুলে দিলাম, বরাপোতায় খালাস হল। তেঘরার জঙ্গলে মাল বোঝাই হল, খালাস হবে গিয়ে ভীমখালিতে। আবার কোথায় না জানি কাল বোঝাই দিতে হবে! ব্যাপারিরা একটু বিবেচনা করলে এত সব কে করতে যেত বল, ওস্তাদ?

ভীমখালির ঘাটে দোকান আছে একটা। ভাল দোকান। চাল-ডাল নুন-লঙ্কা সমস্ত মিলিল, মিলিল না কেবল তেল-ঘি কোনটাই। ঘি কোন দিনই থাকে না, ঘি খাইবার লোক এ অঞ্চলে নাই। তেলটা ফুরাইয়া গিয়াছে আজ দু-তিন দিন মাত্র, গঞ্জ থেকে আনাইয়া লইতে হইবে। দোকানদার অভয় দিয়া বলিল, দিন আষ্টেকের মধ্যেই এসে পড়বে মশায়।

রঘুনাথ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলে, হিসেব করে নাও দিকি ওস্তাদ, ফি জনের আধসের হিসাবে। চৌধুরি মশায় খাবেন না, তাঁকে বাদ দাও। উনুন খুঁড়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দিতে হবে এক্ষুণি। তোফা হবে।

তোফা খিচুড়ির আয়োজন হইতে লাগিল। দোকানদার বাসন ধার দিয়াছে, বটতলায় রান্না চাপানো হইয়াছে। রঘুনাথের হাতে খুন্তি—প্রধান পাচক সে-ই। আর জন আষ্টেক উনুন ঘিরিয়া বসিয়াছে, সবাই রান্নার উপদেশ দিতেছে। কেউ বলে, জল দাও; কেউ বলে, ঝাল দাও; কেউ বা বলে, নুন কম হয়ে যাবে কিন্তু। সবাই তো সড়কি চালায় আর নৌকা বায়—তার মধ্যে এ বিদ্যায় কবে বিশারদ হইয়া বসিল, সেইটা সমস্যার বিষয়।

নরহরি ইহাদের মধ্যে নাই, একাকী ডিঙার উপর বসিয়া। সেখান হইতে চাপা-গলায় একবার বলিলেন, খিচুড়ি রাঁধ আর যা-ই কর বাপু, ওদিকে

যেন নজর থাকে। খালে ঢুকে চুপি-চুপি সরে না পড়ে। আমি দেখছি অবশ্য, তা হলেও—

তারা অভয় দিয়া বলে,—হাঁ—হাঁ, নজর থাকবে বই কি! দশজনের দশ জোড়া চোখ। যাবে কোন দিকে মহাদেব-শালা?

কিছুক্ষণ হইতে মেঘ জমিতেছিল। চারিদিকে গাঢ় আঁধার। রঘুনাথ খুন্তিতে খিচুড়ি তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। মহা স্ফূর্তিতে বলিয়া উঠিল, পাতা পেতে ফেল, আর দেরি নেই। সারবন্দি বসে পড় সবাই।

সবে পাতার উপর খিচুড়ি পড়িয়াছে। এমন সময়—বিধাতা বিমুখ—ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আসিল। ডিঙাতেও ছই নাই। পাতার উপর হাত ঢাকা দিয়া সকলে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। দোকানের মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ জায়গা, এত লোকের সেখানে স্থবিধা হইবে না।

রঘুনাথ বলিল, ভাবিস কি, টপাটপ খেয়ে নে। বৃষ্টি পড়ছে—সে তো ভালই—ঐ জল মিশে যাচ্ছে, আলাদা করে আর জল খেতে হবে না।

সে-যা হয় একরকম হইত, বিপদের উপর বিপদ—নরহরি সেই মুহূর্তে হাঁক দিয়া উঠিলেন, গোন লেগেছে রে। শিগগির আয় সব, ডিঙি ছাড়তে হবে। এক্ষুনি—এক্ষুনি—

বৃষ্টির ছাট উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু নরহরির হাঁক না শুনিয়া পারিবার জো নাই। যে যতটা পারিল, খিচুড়িতে মুখ ভরতি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই চক্ষের দৃষ্টি পুঞ্জিত করিয়া রঘুনাথ দেখিল, সত্যই অনেকদূরে একেবারে ওপার ঘেঁসিয়া গতিশীল একটি কালো রেখা—

ওপারে গ্রাম। গাছপালা জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তারই তলে যখন আসিয়া পড়ে নৌকা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, ফাঁকায় আসিলে মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্নায় আবছা একটি রেখার মতো আবার নজরে আসে। স্পষ্ট কিছু বুঝিবার জো নাই। ছপ-ছপ করিয়া ছ-খানা বৈঠা পড়িতেছে; ডিঙা ছুলিতে ছুলিতে ছুটিল। নরহরির চোখে পলক নাই। বলিতেছেন, জোরে—আরও জোরে, শব্দ-সাড়া না হয়—হাত চেপে বৈঠা চালাও। ঐ যে সামনে—চলো—

সামনে এমন ঝুঁকিয়াছেন যেন জল না হইলে ডিঙার অনেক আগে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন তিনি। নৌকার পিছু ধরিয়া ডিঙা চলিল। দু-বাঁক তিন-বাঁক এমনি চলিল। কোন রকমে সুবিধা হয় না—লোকের সাড়া আসিতেছে, হাটুরে লোক নদীতীরের পথে ফিরিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম চলিয়াছে। অবশেষে তারা ফাঁকায় আসিয়া পড়িল। দু-পারেই দিগন্তব্যাপ্ত বিল।

চিন্তামণি তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, আরে রঘুনাথ, মহাজনি ডাউলে কোথা? এ যে হল বজরা—

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু···ঐ দেখুন—ঐ যে উঁচুতে হাল ধরে আছে!

চিন্তামণি বলে, হাল না হাতী। ও হল পালের বাঁশ। চোখের মাথা খেয়ে বসেছ এর মধ্যে?

নরহরিও দেখিয়া বলিলেন, না রঘুনাথ, মহাদেব সা'র নৌকা এ নয়। ভুল করে আমরা এদিকে এসে পড়েছি—এসেছিও অনেকটা দূর। সে নৌকো খাল দিয়ে এতক্ষণ বারোবেঁকিতে পড়েছে। কপাল ভাল মহাদেব বেটার।

নিশ্বাস ফেলিয়া নরহরি চুপ করিলেন।

রঘুনাথ বলে, না-ই বা হল মহাদেবের নৌকো। বজরা তো বজরাই সই! এদ্দূর যখন এসেছি, কারবারে লোকসান হতে দেওয়া হবে না। কি বলিস রে তোরা সব?

হাঁ-হাঁ করিয়া প্রায় সকলেই সায় দিল। এত পথ পিছু পিছু আসিয়া বেকুব হইয়া ফিরিতে কেহ রাজী নয়।

(৫)

বজরার মধ্যে শিবনারায়ণ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী আর ছোট দু'টি ছেলে-মেয়ে। শিবনারায়ণের বড় দুঃসময়। জমাজমি ছিল, পাকাবাড়ি ছিল, বাড়িতে বারো-মাসে তের পার্বণ হইত। কিন্তু মানুষে নয়—নদীতে সর্বনাশ করিয়াছে; ঘরবাড়ি ভাঙিয়া লইয়াছে। এক নাজিরমেথির তালুকে সম্বৎসরে যা আদায়

হইত, তাহাতে শিবনারায়ণের মতো তিনটা পরিবার পুঁথিপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া গায়ে ফুঁ দিয়া স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতে পারিত। নাজিরঘেরির গোটা তালুকটাই গ্রাস করিয়াছে রাক্ষসী নদী। তালুকটা শিবনারায়ণের নিজের আমলে অনেক কৌশলে ও বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া বন্দোবস্ত লওয়া—সেই জন্ত উহার শোক মনে বেশি বাজিয়াছিল। আরও গিয়াছে—শক্ত সমর্থ ষোল বছরের একটি ছেলে। সে অবশ্য নদীগর্ভে যায় নাই, ওলাওঠায় মারা গিয়াছে। নদীকূলে তার শেষকৃত্য চুকাইয়া শিবনারায়ণ দেশ ছাড়িয়াছেন, চিরদিনের জন্ত ছাড়িয়াছেন। সঙ্গে কিছু টাকাকড়ি আছে। মতলব, ফতেহাবাদের মধ্যে প্রেমভাগ উঁচিত জায়গা, পুণ্যস্থানও বটে—আচার্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী বসবাস করিতেন—অতীত জীবনের সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া সেইখানে কুঁড়েঘর বাঁধিয়া সামান্ত ভাবে থাকিবেন। দুটি দায়িত্ব আছে জীবনে—মেয়ে মালতীকে পাত্রস্থ করা আর শিশু কীর্তিনারায়ণকে মানুষ করিয়া তোলা। আর কয়েকটা বছর তাই পঙ্কিল সংসারের ভিতর না কাটাইয়া উপায় নাই।

ছয় বৈঠার ডিঙা একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। চিন্তামণি প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা মাঝি?

বজরা-নৌকার মাঝি—ভারিক্কি চাল—জবাব দিল না। অকস্মাৎ গলা ছাড়িয়া গঙ্গা-বন্দনা গাহিতে শুরু করিল, বন্দ মাতা সুরধনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী—

দুই নৌকা আগে পিছে রশিখানেক এমনি চলিল। তারপর ডিঙা হইতে করুণ আবেদন জানায়, ও মাঝি ভাই, আঁশ-বঁটি আছে তোমাদের সঙ্গে? একটুখানি যদি দাও—

বজরা তবু নিঃসাড়ে চলিতে লাগিল। ডিঙা হইতে আবার বলে, দাও ভাই বঁটিখানা। আমাদের দা ছিল, সে ঘোড়ার ডিম খুঁজে পাচ্ছি না। আশা করে এক পাতাড়িমাছ কেনা গেছে, কোটার অভাবে তা পড়ে রয়েছে।

শিবনারায়ণের স্ত্রী সৌদামিনীর করুণা হইল। বলিলেন, দিয়ে দাও মাঝি। আহা, বলছে এত করে—

এস গো বাঁদিক পানে—

মাঝি বঁটিটা জলের দিকে উঁচু করিয়া ধরিল। দাঁড়-টানা বন্ধ রাখিয়াছে। নরহরির ডিঙা তীরের মতো বজরার গায়ে ভিড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সড়কি হাতে মরদেরা লাফাইয়া পড়িল বজরায়। রঘুনাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল, বঁটি দিয়ে লড়বি নাকি তোরা? রেখে দে বঁটি। কি কি আছে, বের কর্ শিগগির।

জানে না কামরার মধ্যে আছেন শিবনারায়ণ, জানে না শিবনারায়ণের পাশে আছে পাকাবাঁশের পাঁচহাতি লাঠিখানা। তিনটা জেলায় যত ঢালি-ওস্তাদ আছে, এককালে ঐ লাঠির নামে তাদের বুকের ভিতর কাঁপিয়া যাইত। ইদানীং অবশ্য উহার ব্যবহার নাই। শিবনারায়ণ সর্বস্ব ফেলিয়া আসিয়াছেন, লাঠিও রাখিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অজানা পথঘাটে নারী ও শিশু লইয়া একলা যাইতেছেন—সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত লাঠি সঙ্গে আনিয়াছেন।

দীপের আলোয় শিবনারায়ণ নিবিষ্ট মনে কি একখানা পুঁথি পড়িতে-ছিলেন। পুঁথি পড়িয়া ভক্তিরসে মনটা নিষিক্ত করিয়া রাখিতে চান, কিন্তু ইহারা তাহা হইতে দিবে না। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, ভারি যে বকবক করছ, কারা তোমরা? কি চাও?

চিন্তামণি সড়কি তাক করিল। সড়কি দেখিয়া শিবনারায়ণের মাথায় চনচন করিয়া রক্ত ঠেলিয়া উঠিল। হুঙ্কার দিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। লাঠির এক ঠোক্করে শিশুর হাতের খেলনার মতো সড়কি চিন্তামণির হাত ফসকাইয়া পড়িয়া গেল। নরহরি ঠিক এই সময়ে লাফাইয়া উঠিতেছিলেন বজরায়। লাঠি ঘুরাইয়া শিবনারায়ণ নরহরির কবজির উপর বাড়ি মারিলেন। সে কি বাড়ি—হাতখানাই শুধু নয়—সর্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া যেন অসাড় হইয়া গেল। নরহরি জলে পড়িয়া গেলেন। এত সহজে পলাইতে দিবেন না, শিবনারায়ণের সঙ্কল্প—স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিঃসহায় নৌকায় রহিল, সে খেয়াল নাই—তিনিও ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরহরির সঙ্গে সঙ্গে। চিন্তামণি বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া। এমন করিয়া তাকে একেবারে পুতুল বানাইয়া দিল—এই আশ্চর্য লোকটির কাণ্ডকারখানা সে অবাক হইয়া দেখিতেছে।

আরও হইল। বছর দশেকের ফুটফুটে মেয়ে মালতী—এক-গা গহনা—সত্য ঘুম ভাঙিয়া দুয়ারের ধারে চোখ মুছিতেছিল। এত কাণ্ড হইল, এতটুকু মেয়ে ভয় পায় নাই। সমস্তই ইহাদের তাজ্জব। গহনায় রঘুনাথের নজর পড়িয়াছে; মালতীকে সে ধরিবে। যেন লুকোচুরি খেলিতেছে, এমনি ভাবে এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল মেয়েটা। এক একবার ধরিয়া ফেলে আর কি! কিন্তু পারিয়া উঠে না, পাঁকালমাছের মতো পিছলাইয়া যায়। তারপর এক সময়ে ঝপ্‌ঝাস করিয়া জলে ঝাঁপ দিল। চিন্তামণি সহসা যেন সম্বিৎ পাইয়া হাহাকার করিয়া ওঠে। সে-ও ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বেকুব রঘুনাথ ও দলের সকলে ডিঙায় ফিরিল। ডিঙা তখন সরিয়া অনেক দূরে গিয়াছে। বজরার মাঝি হতবুদ্ধি হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে; জলস্রোতে সজোরে নৌকা পাক খাইল। ঝড়-জল কিছু নাই—এত বড় বজরা চালকের অভাবে জলতলে ডুবিয়া যায় আর কি!

সৌদামিনী বাহিরে আসিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন, না পার তো মাঝি সরে দাঁড়াও। আমি দেখছি। উজ্জ্বল গৌর গায়ের বর্ণ, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, উত্তেজনায় মাথার ঘোমটা খসিয়া পড়িয়াছে, মুখের উপর আগুন জ্বলিতেছে যেন। সাত বছরের কীর্তিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মাকে জাপটাইয়া ধরিল। সেই হইয়াছে বিষম বাধা—নহিলে তিনি কখন এমন চুপচাপ থাকিতেন না।

মাঝি যেন চমক ভাঙিয়া ওঠে। বলিল, না মা, সে কি কথা!

দৃঢ় হাতে আবার হাল বাহিতে লাগিল।

সৌদামিনী আদেশ দিলেন, ঐ আমার মেয়ে ভাসছে, কর্তার কাছে পৌঁছতে পারছে না। নৌকো ঘুরিয়ে নাও ঐদিকে।

হুকুম, হুকুম!

বন্দুকের আওয়াজ। খালের মধ্য হইতে নীলরঙের বোট তীরের মতো বাহির হইয়া আসিল। মেঘ কাটিয়া পরিষ্কার জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। দিগ্‌ব্যাপ্ত নদীজল জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিকমিক করিতেছে। বন্দুকের শব্দে ওপারের

অশ্বথতলা হইতে উল্টা দিকে উজান ঠেলিয়া আরও খান দুই পুলিশের বোট আসিতে দেখা গেল। জল-পুলিশ তবে এখানে আসিয়াও আস্তানা পাতিয়াছে!

শিবনারায়ণ ও নরহরি খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন। নরহরি বলিলেন, উঃ—জোর বটে তোমার লাঠির! ডান হাতের দফা শেষ করে দিয়েছ, এবার মাথাটার উপর লোভ বুঝি! এমন লাঠি ধরতে জান তো পুলিশের লেজুড় ধরে বেড়াচ্ছ কি জন্যে? মরদের মতো মাথায় লাঠি মারো, ক্ষোভ থাকবে না। কিন্তু দোহাই ভাই, পুলিশের হাতকড়ি পরিও না।

শিবনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি বোষ্টম মানুষ,—শাক-পাতা খাই—মাথার উপর লোভ নেই আমার। হাতখানা চুরি-ডাকাতির কাজে লাগিয়েছ কেন? নইলে ওটার পরেও কোন আক্রোশ হত না।

সাঁতার দিয়া নীল-বোটের কাছে গিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার মেয়ে নৌকো থেকে জলে পড়ে গেছে—তারই হৈ-চৈ। আর কিছু নয়।

নরহরিকে দেখাইয়া বলিলেন, অতি মহাশয় ব্যক্তি। আমার বিপদ দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এঁরা সব।

মেয়ে জলে পড়িয়াছে, শিবনারায়ণ ঘাড় ফিরাইয়া তখনই দেখিয়াছেন। তা বলিয়া তাঁর মনে কোন উদ্বেগ নাই। ভাঁটি-অঞ্চলের মানুষ—ইহাদের কাছে ডাঙায় হাঁটিয়া বেড়ানো যা জলে সাঁতার কাটা তার চেয়ে কষ্টকর কিছু নয়। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ আলোয় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মালতী ভাসিতে ভাসিতে অনেকটা দূর গিয়াছে, চিন্তামণি পারিয়া উঠিতেছে না—পিছনে পড়িয়াছে। ডাকিতেছে, ভয় নেই মা—পালিও না, ধরতে দাও। কিন্তু উল্টা-পাল্টা হাওয়ায় আহ্বান মালতীর কানে পৌছিতেছে না বোধ হয়। ভয় পাইবার মানুষই বটে এই মেয়ে! ঘুরিয়া একবার বা কাছাকাছি আসে, চিন্তামণি ধরিবার জন্য দ্রুত বাহুবিক্ষেপে জল কাটাইয়া তীরবেগে নিকটে গিয়া পড়ে। পানকৌড়ির মতো মালতী ভুস-ভুস করিয়া ডুব দেয়। চিন্তামণিও সেইখানটায় আসিয়া ডুব দিল—অর্থাৎ তাহাকে নির্ঘাৎ ধরিয়া ফেলিবে এবার। কিন্তু কোথায় সেই চঞ্চলা মেয়ে—ডুব-সাঁতার দিয়া একেবারে হাত কুড়িক গিয়া সে ভাসিয়া

উঠিয়াছে। এ তো আততায়ীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার প্রয়াস নয়—ঠকাইয়া বেকুব বানাইয়া দিতেছে দুর্ধর্ষ এক জোলো-ডাকাতকে।

জল-পুলিশের বোট বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইল। তরঙ্গ-মুখর মালঞ্চের উপর জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিবেলা বজরায় উঠিয়া ভিজা কাপড়ে নরহরি ও শিবনারায়ণ কোলাকুলি করিলেন। ডিঙা বেগতিক বুঝিয়া প্রাণপণে বৈঠা বাহিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, নরহরি হুকার দিতে বজরার পাশে আসিয়া ভিড়িল। নদীজল হইতে উঠিয়া মালতী বাপের গা ঘেঁসিয়া বসিল।

নরহরি বলিলেন, তোমায় ছাড়ব না ভাই, শ্যামগঞ্জে নিয়ে যাব। যেতেই হবে।

শিবনারায়ণ জবাব না দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

লাঠিতে হেরে গেছি—কিন্তু বুকে নিয়েছ, সেই জোরে তোমাদের টেনে নিয়ে তুলব এই বজরাসুদ্ধ। ঝেড়ে ফেলে দেবে তো বুক জড়িয়ে ধরলে কেন ভাই?

শিবনারায়ণ বলিলেন, নাগালের মধ্যে এসে পড়লে যে!

সবাইকে বুকে নিয়ে যাও এই রকম?

চেষ্টা করি অন্তত। ধরে নিয়ে শ্যামঠাকুরের দরবারে হাজির করে দিতে চাই। ঠাকুর অন্তরের কালিমা মুছে দেন।

নরহরি মুখ ফিরাইলেন। মুখ তাঁর কালো হইয়া গিয়াছে।

বুড়া চিন্তামণি ওদিকে শিবনারায়ণের পায়ের গোড়ায় বসিয়া বলিতেছে, লাঠি-সড়কি কিছু জানি নে আমি, একেবারে কিছু না। আজকে টের পেলাম।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যা জান, ব্রতভ্রষ্ট হয়ে তা-ও কাজে আসছে না। লাঠির অপমান কর তোমরা—তোমাদের এই বৃত্তি অধর্ম খেলোয়াড়ের পক্ষে।

চিন্তামণি কাতর হইয়া বলে, গুরু বলে প্রণাম করলাম, দু-একখানা চাল আর দুটো-একটা বাড়ি অন্তত আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

ভুলে গেছি আজকাল ও-সব।

চিন্তামণি বলিতে লাগিল, আপনার দরকার না-ই যদি থাকে, মানুষ কি লাঠিবাজি ছেড়ে দেবে একেবারে? আর দশজনের তো কাজে লাগবে। পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছি, লাথি মারলেও নড়ব না।

(৬)

শিবনারায়ণকে থাকিয়া যাইতে হইল। ইহারা নাছোড়বান্দা একেবারে। প্রেমভাগে গিয়া কি হইবে, ভক্তি থাকিলে প্রেমভাগের চেয়েও মহত্তর ধাম এইখানে গড়িয়া উঠিবে। ভাই-ভাইপোকে নরহরি অনেক চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারেন নাই, পরিজনবিহীন একা পড়িয়াছিলেন। কালী কপালিনী তাই করুণা করিয়া মালঞ্চের প্রবাহে ভাই বহিয়া আনিয়া দিলেন। এ বিরাট প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে দু-ভায়ের স্থান কুলাইয়া যাইবে। শ্যামশরণের আমলের বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু নাই—কিন্তু নূতন সম্পত্তি করিতে কতক্ষণ? নরহরির ইতিমধ্যেই কিছু সঞ্চয় হইয়াছে, শিবনারায়ণও রিক্ত হস্তে আসেন নাই।

লাভজনক ধানের কারবারটা কিন্তু ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। শিবনারায়ণ নদী-খালে কিছুতে এই রকম ভাবে ঘুরিতে দিবেন না। তিনি লাঠিয়াল··· লাঠিয়ালের রীতি ইহা নয়, ইহা হীনকর্ম। তা ছাড়া দিনকাল বদলাইয়াছে। শ্যামশরণ যে ভাবে চলিতেন, তাহা এযুগে অচল। প্রবল-প্রতাপ কোম্পানি বাহাদুর উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, যারা নৌকা মারিয়া বেড়ায় তাদের সায়েস্তা করিবেনই। কশবায় আদালত বসিয়াছে, সেখানে গঞ্জও ক্রমশ জাঁকিয়া উঠিতেছে। শুধু আর মেয়েলোক নয়, পুরুষেরা অবধি বিষম সাবধানী হইয়া গিয়াছে। বেপরোয়া সাহস উপিয়া গিয়া ভয় মানুষের বুকের ভিতর বাসা বাঁধিতেছে। দুই দণ্ডের রাস্তা লোকে এখন স্থলপথে পুরা দিন ধরিয়া গরুর গাড়ি মহিষের গাড়িতে অতিক্রম করিবে, তবু দশ-বারোখানা নৌকার বহর না সাজাইয়া নদীমুখো হইতে চায় না।

কারবার ছাড়িয়া অবধি নরহরির ঘরের বাহির হইবার বড় একটা গরজ হয় না। আবার গানের নেশায় পাইয়া বসিতেছে। ঢালিপাড়ায় তাঁরই

উৎসাহে নূতন এক ভাব-গানের দল হইল। দলের খুব নাম পড়িয়া গিয়াছে। যেদিন গ্রামের মধ্যে গান হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, নরহরি শ্রোতাদের সামনে নিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। স্থির দৃষ্টি—অচঞ্চল। শমের মুখে কেবল এক-একবার দুই জানুতে দুটি হাতের মৃদু আঘাত পড়ে, ফাঁকার মধ্যে আসরের কম্পমান আলোয় আঙুলের আংটির হীরা মুহূর্তের জন্য ঠিকরাইয়া উঠে। গান ভুলিয়া গায়কদেরও এক মুহূর্ত নজর পড়িয়া যায় তাঁর দিকে। গান ছাড়া আর কোন ব্যাপারে ইদানীং নরহরিকে সন্ধ্যার পর বাহিরে দেখা যায় না। শিবনারায়ণের নিষেধ আছে, নরহরি প্রাণপণে তা মানিবার চেষ্টা করেন।

চিতলমারির এপারে একে একে পাঁচখানা চক কেনা হইয়াছে ইতিমধ্যে। ইহাদের এক নূতন নামও হইয়া গিয়াছে—পাঁচ-খামারের ভূঁইয়া। শিবনারায়ণের সমস্ত সকালবেলাটা কাটিয়া যায় বিষয়-আশয়ের তদারক করিতে, ঠাকুরের নাম লইবার অবসর ঘটে না। এজন্য তিনি বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন। মুক্তির আশায় বাহির হইয়া এ কোথায় আটকাইয়া গেলেন? দিন দিন পঙ্কে তলাইয়া যাইতেছেন। অনেকবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, নিজেকে এ-সবের মধ্যে আর জড়াইবেন না। কিন্তু নরহরির উপর যে এক বিন্দু আস্থা করিবার উপায় নাই। শক্তি আছে, বুদ্ধিও আছে—কিন্তু তাঁর হাতে কিছু ছাড়িয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অঘটন ঘটাইয়া বসিবেন। অন্তত শিবনারায়ণ যতটা বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাঁর এইরূপ আশঙ্কা।

কীর্তিনারায়ণ একদিন নরহরিকে ধরিয়া বসিল, সে-ও গান শুনিতে যাইবে তাঁর সঙ্গে। আবদার কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়, গানে বনের পশু বশ হইয়া যায়। নরহরি আপত্তির কিছু দেখিলেন না, বরঞ্চ মনে মনে খুশী হইলেন। এ বিষয়ে কীর্তিনারায়ণের সত্যিই যদি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, বাড়ির মধ্যেই তাঁর একজন জুড়ি পাওয়া যাইবে। বেলা পড়িয়া আসিতে চুপি-চুপি দু-জনে বাহির হইলেন।

সেদিন আবার বিশেষ একটু ব্যাপার। অনেক দূর—পূব অঞ্চল হইতে আর একটা দল আসিয়াছে, দুই দলে গানের পাল্লা হইবে। লোক গিস-গিস

করিতেছে, অত বড় মাঠটি নরমুণ্ডে ভরিয়া গিয়াছে। দু-পাশ দিয়া সারবন্দি কলার তেউড় বসানো, তার উপর ভুব-ভরতি সরা। ঘোর হইয়া আসিতে ভুবে কেরোসিন ঢালিয়া জ্বালাইয়া দিল। চারিদিকে আলোয়-আলোময় হইয়া গেল।

গুড়-গুড় করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। গান খুব জমিয়া গেল। চারিদিকে 'বাহবা' 'বাহবা' রব উঠিতেছে। অষ্টমীর চাঁদ ডুবিয়া গেল, গানের তবু বিরাম নাই।

আসর ভাঙিয়া গেলে বাড়ি ফিরিবার সময় কীর্তিনারায়ণের গা কাঁপিতে লাগিল। এত রাত্রি অবধি কখন সে বাড়ির বাহিরে থাকে নাই। পাঠশালা ফাঁকি দিয়া ইতিপূর্বে কখন কখন সমস্তটা দিন পালাইয়া বেড়াইয়াছে, শিবনারায়ণ তাহা লইয়া রাগও করিয়াছেন, পরে আবার সব জুড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির অনুপস্থিতির এই ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াইবে, কে জানে? নরহরি সঙ্গে রহিয়াছেন, তবু ভয় কাটিতেছে না।

নরহরিরও ভয় হইল। শিবনারায়ণ যদি চেঁচামেচি করিয়া হাতে মারিয়া শাস্তি দিতেন, আপদ চুকিত, যা হোক এক রকম আস্কারা হইয়া যাইত। কিন্তু থমথমে মুখে ক'দিন তিনি ঘুরিয়া বেড়াইলেন, ভালমন্দ একটি কথা কহিলেন না। কীর্তিনারায়ণের বিষয়ে যেন নির্লিপ্ত হইয়া যাইতেছেন, এই রকম ভাব। নরহরির সঙ্গেই ছেলের উঠা-বসা। যত দিন যাইতেছে, বাপের নিকট হইতে সে যেন দূরবর্তী হইয়া যাইতেছে।

নরহরি আর চিন্তামণি কীর্তিনারায়ণের হাত টিপিয়া একদিন খুব তারিপ করিতেছিলেন। শেষে নরহরি শিবনারায়ণকেও না ডাকিয়া পারিলেন না।

—দেখে যাও ভাই, চেয়ে দেখেছ কোন দিন? যা কবজির গড়ন, এ ছেলে সবাইকে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে, এই বলে দিলাম।

প্রশংসায় কীর্তিনারায়ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, বাপ সামনে আসিতে ছাইয়ের মতো সাদা হইয়া গেল। শিবনারায়ণ তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

না ভাই, বোষ্টম মানুষ—আমার ছেলেকে লাঠিবাজির মধ্যে নিও না আর তোমরা।

নরহরি বিদ্রূপ-কণ্ঠে বলিলেন, বয়স হয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। বাঘের বাচ্চা বাঘ হবেই। খাঁচায় পুরে যতই নিরামিষ চাল-কলা খাওয়াও, নখ-দাঁতে দেখতে পাবে আপনাআপনি ধার হয়েছে।. ঠেকাতে পারবে না।

শিবনারায়ণ বেশি তর্ক করেন না। তাঁর মনের বাসনা, শ্যামকান্তর মতোই শান্ত-সভ্য হইয়া উঠুক কীর্তিনারায়ণ। যে দিন-কাল আসিতেছে, তাহাতে টিকিয়া থাকিবে শ্যামকান্তরাই। এক একবার এমনও মনে হয়, ছেলে লইয়া ইহাদের মধ্য হইতে পলাইয়া যাওয়া উচিত। তবে আনন্দের ব্যাপারও আছে, বন্ধন ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া যাইতেছে। ছেলে বাপের চেয়ে নরহরিরই বেশি অনুগত। লীলাময় প্রভু কাঁধের বোঝা নামাইয়া দিতেছেন, তাঁর দায়িত্ব অন্য লোকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে আরাম পাইবারই তো কথা!

খালের ওপারে বরণডাঙা গ্রামের সঙ্গে হুনদাড়ি খেলায় কীর্তিনারায়ণদের একদিন পাল্লা হইয়া গেল। খেলাটা হইল চিতলমারির চরে। শেষ পর্যন্ত জিত হইল শ্যামগঞ্জের। খেলা ভাঙিতে সন্ধ্যা গড়াইয়া গেল। তা যাক, স্ফূর্তিতে সকলে তুড়িলাফ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিতেছে। এমন সময় দীঘির পাড়ের খেজুরবনে ঠন-ঠন করিয়া ভাঁড়ের আওয়াজ শোনা গেল। বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে, গাছেরও মাথা অবধি ভাল নজর চলে না। একজন বলিল, গোড়েল উঠে রস খাচ্ছে।

উঁহু। দলপতি কীর্তিনারায়ণ নজর করিয়া দেখিয়া ঘাড় নাড়ে। ঐ যে ছায়া—গোড়েল ঐ রকম লম্বা হয় বুঝি! চল তো এগিয়ে—ওদিকে দিয়ে—তিনদিক ঘিরে সামাল হয়ে যাই চল—

আবার অতি সন্তর্পণে দেখিয়া লয় একবার।

মানুষ—আক্রমণ করতে হবে। খালি হাতে নয়—জিওলের ডাল ভেঙে নাও এক-একখানা।

তাহাই হইল। হাতের মাথায় যে যেমন পাইল, এক এক ডাল ভাঙিয়া আগাইয়া চলিল। হঠাৎ—ও বাবা রে—উপর হইতে ছড়ছড় করিয়া খেজুর-রস পড়িল একজনের মাথায়, মাথা হইতে গড়াইয়া সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। শীতের রাত্রি, উত্তুরে হাওয়া দিতেছে, মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কুঁকড়াইয়া উঠিল। তার পরে যে অবস্থা হইবে, ভাবিতে ভয় হইয়া যায়—চুল এমন আঠা হইয়া মাথার সঙ্গে আঁটিয়া যাইবে, গা চটচট করিবে, যে এই রাতে রীতিমতো অবগাহন স্নান না করিয়া পরিত্রাণ নাই।

কীর্তিনারায়ণ রাগিয়া মুখ খিঁচাইয়া ওঠে। সরে আয়, দূরে আয়—শত্রু-ব্যূহে যেতে আছে ঐ রকম অসাবধান হয়ে? ভাগ্য ভালো, ভাঁড়ের রস ফেলেছে—আস্ত একটা ভাঁড় মাথায় ভাঙে নি।

গলা উঁচু করিয়া অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে সে কহিল, মেঘের আবরণে বরুণ-বাণ মারছ কেন ইন্দ্রজিৎ? ভূমে এসে রণ দাও। পরীক্ষা হোক, কার কেমন শক্তি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার, শত্রুদল কি করিতেছে ঠাহর করা যায় না। চষাক্ষেত হইতে মাটির ঢিল কুড়াইয়া ইহারা প্রস্তুত হইয়া আছে। সামনে হঠাৎ কয়েকটা ছায়ামূর্তি। কীর্তিনারায়ণ রুখিয়া উঠিল, আক্রমণ কর—ধ্বংস কর—

শত্রুদলের একজন আগাইয়া একেবারে ইহাদের মধ্যে চলিয়া আসিল। বলে, রস খাচ্ছিলাম এক ঢোক—

কীর্তিনারায়ণ তাহাকে চিনিল। নাম ভানুচাঁদ—পরে জানিয়াছে। নরহরির সহিত সেই যে গান শুনিতে গিয়াছিল, সেই আসরে উহাকে সে দেখিয়াছিল। দেখিয়াছিল তো অনেককেই, কিন্তু ইহাকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার কারণ, বাড়ি-হইতে-আনা একটা পানের খিলি সংগোপনে দিয়া ছেলেটা তাকে খাতির করিয়াছিল। ফর্সা চেহারা, কম বয়স—এই কীর্তিনারায়ণের সম্পর্কে ভানুচাঁদের মনে হইয়াছিল, সোনালি রঙের কঠিন ইস্পাত দিয়া তৈরি। চোখ আর সে ফিরাইতে পারে নাই। সবাইকে বাদ দিয়া পানের খিলি সে ইহাকেই আনিয়া দিয়াছিল।

ভাঙ্গচাদ বলে, রস খাচ্ছি তা তোমরা ওরকম লেগেছ কেন বল দিকি ?

কীর্তিনারায়ণ মুরুব্বিয়ানা করিয়া জবাব দেয়, খাবে তা চেয়ে খাওয়াই তো উচিত। না বলে নিলে চুরি করা হয় না ?

ভাঙ্গচাদ বলে, চাইলে কি দেয় ? উল্‌টে গালিগালাজ করে।

ইহার উপরে যুক্তি নাই। চাহিলে দেয় না, অতএব না চাহিয়াই ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে—আর কি তৃতীয় পন্থা থাকিতে পারে ? কীর্তিনারায়ণ তর্ক না তুলিয়া বলিল, তা হলে মোটের উপর বক্তব্যটা কি দাঁড়াচ্ছে ? সন্ধি ?

অত সব সাধু-উক্তি বুঝিবার ক্ষমতা ভাঙ্গচাদের নাই, মুরারি পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ে নাই তো! সে কেবল ঘাড় নাড়িল। কীর্তিনারায়ণ খুশী হইয়া বলে, বেশ—মঞ্জুর। ক-জন তোমরা ? গাছ ক-টা সব কি সাবাড় হয়ে গেছে ?

না, তাহারা জন চারেক মাত্র। সবে শুরু করিয়াছিল—বহুত গাছ বাকি এখনো। নিচু গাছগুলির রস খাওয়া যাইবে না, শিয়ালের উৎপাতে গাছিরা নেড়া সেঁজির আঠা দিয়া রাখে। তা লম্বা গাছ গণিয়া দেখিলে পনের-কুড়িটা হইবে বই কি!

মজা-দীঘির জলে পাট পচানো। কতক পাট কাচিয়া লইয়া গিয়াছে, পাট-কাঠি স্তূপাকার হইয়া আছে। তাহারই এক এক টুকরা ভাঙিয়া লইয়া কাঠ-বিড়ালির মতো সকলে এগাছ-ওগাছ করিতে লাগিল। আধঘণ্টার মধ্যে খাতির এমনি জমিয়া উঠিল যে ভাঙ্গচাদ ইহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তার বাড়িতে গেলে সে নূতন জিনিস খাওয়াইবে, যেন নিশ্চয় তারা যায়। কি জিনিস তাহা বলিল না, বিস্তর চাপাচাপি করিয়াও বাহির করা গেল না।

(৭)

বড় কড়া মুরারি পণ্ডিত, তিলমাত্র ফাঁকি চলে না। এক পাশে জল-চৌকির উপর তাঁর আসন, পাশে জোড়া-বেত। সামান্য যদি গুঞ্জন ওঠে পাঠশালার কোন কোণে, বেতটা কেবল ছুঁইলেই হইল, তার অধিক আবশ্যক নাই।

তবে কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা। কি কারণে সঠিক বলা যায় না, তাকে শাসন করিতে পণ্ডিতের সাহসে কুলায় না। বড় রাগ হইলে তার যে কিছু হইবে না—ঠারে-ঠোরে এইটুকু মাত্র জানাইয়া দেন।

খুঁটির গায়ে পেরেক পোঁতা। তাহাতে এক টুকরা কাঠ টাঙানো থাকে, কাঠে খুদিয়া লেখা আছে—'বাহির'। বাহিরে যাইবার গরজ হইলে পণ্ডিতের কাছে ছুটি লইবার প্রয়োজন নাই, কাঠখানা হাতে লইয়া চলিয়া যাও। দুই রকম সুবিধা এই ব্যবস্থায়—পণ্ডিতকে বারম্বার কথা বলিয়া হুকুম দিতে হয় না, তা ছাড়া কাঠ একখানা মাত্র থাকায় দরুন একসময়ে একজনের বেশি বাহিরে থাকিতে পারে না। আবার থুতু ফেলিয়া যাইবার নিয়ম। অতি দ্রুত কাজ সারিয়া থুতু শুকাইবার আগেই ফিরিতে হইবে। ছেলেরা ইটের উপর কিংবা ঘাসবন দেখিয়া থুতু ফেলে, যাহাতে অতিশীঘ্র থুতু না শুকায়। ছুটি এইরূপে যতটা দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারা যায়।

বইয়ের পড়া হয় বিকালবেলা। সেটা নিতান্তই গৌণ—সব দিন যে হইবে তার ঠিক নাই। হাটবারে পণ্ডিত হাট করিতে যান, সেদিন বিকালে পাঠশালা বসেই না। তা ছাড়া দলিল লিখাইতে, সামাজিক বা অন্য কোন গোলমাল বাধিলে সালিশি করিতে মাঝে মাঝে পণ্ডিতের ডাক পড়ে। বিকালে পাঠশালার তাই নিশ্চয়তা নাই।

আসল কাজকর্ম সকালবেলার দিকে। প্রথমে হাতের লেখা—তাল-পাতায়, কলাপাতায়, স্লেটে। নূতন স্লেট উঠিয়াছে কসবায়, অবস্থাপন্ন দু-চারিজন কিনিয়া আনিয়াছে ছেলেদের জন্য। হাতের লেখার পর কোনদিন হয় শ্রুত-লিখন, কোনদিন বা পত্র ও দলিলের রকমারি মুশাবিদা। ঘরের ভিতরের ছেলেরা ধারাপাত অভ্যাস করে।

পণ্ডিত বলিলেন, নামতা পড়া দেখি আজ ফটকে। কুড়ির ঘর অবধি।

শুকনা মুখে কটিক উঠিল। আট ছয়ে কত হয়, বলিতে পারে না—সেই পড়াইবে কুড়ির ঘর! সন্ত্রস্ত ভাবে গিয়া সে দাঁড়াইল। চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে।

হল কি ?

শেয়ালে কাল আমাদের হাঁস ধরে নিয়ে গেল পণ্ডিত মশায়—

তোমার মুখের বাক্যিও কি নিয়ে গেছে ?

শেয়াল তাড়িয়ে বেড়িয়েছি, পড়তে পারি নি।

শ্যামকান্ত বাহিরে আসিয়া বলে, আমি পড়াই পণ্ডিত মশায়।

শ্যামকান্ত সর্দার-পড়ুয়া নয়—তারও উপরে। কসবায় গিয়া বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। যতদিন ফল না বাহির হইতেছে, পাঠশালায় যাতায়াত করে, মাতব্বরি করে এই মাত্র।

মুরারি পণ্ডিত তটস্থ হইয়া বলিলেন, পড়াবে তুমি—ইচ্ছে হয়েছে ? তা বেশ, পড়াও—

কীর্তিনারায়ণের দিকে এক নজর চাহিয়া তখনই আবার মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, পরীক্ষায় তুমি প্রথম হবে। আমি নিশ্চয় জানি। মুখ উজ্জ্বল করবে তুমি চৌধুরি-বাড়ির।

নামতা পড়ানো শেষ হইল। তারপর শ্যামকান্ত বলে, কড়া-বুড়ি-পণ-কাঠা-সের—এ-ও তো হয় নি ক'-দিন। পড়াব ?

বারাণ্ডার নিচে নারিকেল-গুঁড়ি কাটিয়া ধাপ বসানো। কীর্তিনারায়ণ সে দিকে চাহিয়া আছে। তৃতীয় পৈঠায় ছায়া আসিলেই ছুটি হইয়া যায়, এখন ছায়া তারও নিচে—চতুর্থ পৈঠা অবধি নামিয়াছে। কাঠা-সের এখনো শুরুই হয় নাই। এই ভাল ছেলেগুলার জ্বালায় পড়িতে আসিয়া সুখ নাই একটু।

মাঝে মাঝে ঢাকের আওয়াজ আসিতেছে। বড় যখন বাজিয়া ওঠে, পণ্ডিত উন্মনা হন। দীননাথ হাজরাতলায় মানত-পূজা শোধ করিতে গিয়াছে। তার ছেলে কেশবের অসুখ করিয়াছিল, বিকারে দাঁড়াইয়াছিল। সারিয়াছে— তাই এ-পূজা।

কীর্তিনারায়ণকে পণ্ডিত বলিলেন, শুনছ ? কি রকমটা মনে হয় ?

কীর্তিনারায়ণ প্রণিধান করিয়া বলে, উঁহু, বলির বাজনা আলাদা—

পণ্ডিত ঘাড় নাড়িয়া বলেন, তা বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না বাপু। বলি

না বাজিয়ে যদি কেবল আরতিই বাজিয়ে যায়। বড় বজ্জাত—ও বেটা সব পারে। জানে, বাজনা শুনলেই হকদারেরা এসে পড়বে।

আবার বলেন, তুমি গিয়ে বরঞ্চ হাজির থাক ঐ জায়গায়; নইলে সরিয়ে ফেলবে। গিয়ে বলোগে, কেশব যখন এই পাঠশালার ছেলে তিনটে পাঁঠার মধ্যে অন্তত একটার মুণ্ডু আমি পাব।

কীর্তিনারায়ণ রক্ষা পাইয়া গেল। আর তিলার্ধ সে দেরি করিবে না। এক সহপাঠীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলে, আয় রে তিন্নু, দু-জনে যাই—

না, তোমার যাওয়া হতে পারে না কীর্তি, হাজরাতলা বউভাসির চকের ভিতর—ভিন্ন এলাকায়।

পণ্ডিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাইলেন। দৃঢ়স্বরে শ্যামকান্ত বলিতে লাগিল, বাইরের এলাকায় তুমি হাত পেতে গিয়ে দাঁড়াবে, চৌধুরিদের তাতে অপমান হয়। যেও না।

ছোট মুখে বয়স্কদের মতো পাকা কথা শুনিয়া কীর্তিনারায়ণ সকৌতুকে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সবটুকু শুনিয়া তিন্নুর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে যেমন যাইতেছিল, তেমনি বাহির হইয়া গেল। ভালোমন্দ একটা জবাব পর্যন্ত দিল না। অন্তত এই একটা ব্যাপারে একঘর ছেলেপুলে ও পণ্ডিতের সামনে শ্যামকান্তকে অগ্রাহ্য করিতে পারিয়া ভারি সে তৃপ্তি বোধ করিল।

বয়সে ছোট হইলে কি হয়—শ্যামকান্ত সকল খবর রাখে। বউভাসির ঘাটের ঐ জঙ্গলটায় আজকাল আবাদ হইয়া থাকে—বউভাসির চক নাম হইয়াছে জায়গাটার। ঐ চক লইয়া কর্তাদের ভিতর খুব মন-কষাকষি চলিতেছে। মালিক বরিশাল জেলার লোক—কি রকমের কুটুম্বিতাও আছে চৌধুরিদের সঙ্গে। জমি অত্যন্ত উর্বর—বাঁধ দিয়া নোনা ঠেকাইতে পারিলে একেবারে সোনা ঢালিয়া যায়। কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রলোভন—চকটা ঢালিপাড়ার ঠিক উত্তর প্রান্তে; ওটা পাওয়া গেলে মালঞ্চ চিতলমারি আর ডাকাতির বিল—এই ত্রি-সীমানার ভিতর সমস্ত জমি একলপ্তে আসিয়া যায়; বাহিরের কারও আসিয়া মাথা গলাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অতদূর বরিশাল হইতে জমিদার কালে-ভদ্রে আসেন, নায়েব-গোমস্তা কাজ চালাইয়া যায়। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, না আসিয়াও শ্যামগঞ্জ তরফের গরজটা তাঁরা ঠিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথম মাস কয়েক চিঠিপত্রে উভয় পক্ষ হইতে পরস্পরের মহিমা-কীর্তন চলিয়া অবশেষে যখন টাকার অঙ্ক প্রকট হইল, নরহরি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

শিবনারায়ণ প্রবোধ দিলেন, থাকগে—কি হবে আর জমি-জমায়? পাঁচ পাঁচখানা চক—কম নয় তো! বেশি লোভ না করাই ভাল। সম্পত্তি বাড়ানো একটা বিষম নেশা ভাই। নেশার ঘোরে চলেছি আমরা।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন, দেখ, সব মানুষই বেঁচে থাকতে চায়—সবারই বাঁচবার অধিকার রয়েছে। একের লোভ বিশ্বগ্রাসী হলে আর দশজনেরই সর্বনাশ হয় তাতে। আমার তো মনে হয়, পৃথিবীতে জায়গা-জমি যা আছে তাতে কারও অকুলান হবার কথা নয়। কিন্তু মানুষের লোভ বেড়ে চলেছে—লোভের জায়গা হচ্ছে না বলেই চারিদিকে এত অশান্তি।

নরহরির এত সব শুনিবার ধৈর্য নাই। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বলিলেন, তাই দেখ, লোভ ওদের কি রকম সীমা ছাড়িয়ে গেছে! এমন খাপছাড়া দর হাঁকবে কি জন্য? বিক্রি করবে না, স্পষ্ট বলে দিলেই পারত। চক্ষু-পর্দা আছে নাকি ওদের? আবার লিখেছে—কুটুম্ব, আপনার লোক! হাত নিশপিশ করছে—নাগালের মধ্যে পেলে কুটুম্ব আর কুটুম্বর চক নোনাজলে একসঙ্গে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়তাম।

তা নরহরি অনায়াসে পারেন, শিবনারায়ণের ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। জানেন, লাভ নাই—তবু বুঝাইতে লাগিলেন, লোভ হল আগুনের শিখা। লোভের বস্তু যত সংগ্রহ হবে, আগুনে ঘৃতাহুতির মতো লোভ ততই প্রখর হয়ে উঠবে। চকের পর চকের মালিক হয়ে তোমার লোভ বেড়েই যাচ্ছে। তাঁরা এর সুযোগ নিতে ছাড়বেন কেন? তোমার লোভে তাঁদেরও লোভ উদ্দীপ্ত হয়েছে—আগুনের সংযোগে ইন্ধন জ্বলে উঠবার মতন। এই লোভের হানাহানিতেই মানুষের সমাজে এত গণ্ডগোল।

নরহরি তখনকার মতো চলিয়া গেলেন। কিন্তু মনে মনে রাগ পুষিয়া রাখিলেন, শিবনারায়ণের বুঝিতে বাকি রহিল না। আবার আজ নূতন করিয়া মনে উঠিল, এ তিনি কোথায় চলিয়াছেন ইহাদের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া? পথের মাঝখানকার এ বন্ধন ছিঁড়িতেই হইবে, এ অবস্থায় থাকা চলিবে না।

কীর্তিনারায়ণ আর তিনু পাঠশালা হইতে বাহির হইল, কিন্তু হাজরাতলার দিকেই গেল না। দায় পড়িয়াছে পণ্ডিতের প্রাপ্য মুণ্ডের ধান্দায় ঐখানে ধর্না দিয়া থাকিতে! তিনুকে তাড়াতাড়ি খাইয়া আসিতে বলিল। সে-ও বাড়ি গিয়া নাককাটির খালে একটা ডুব দিয়া যা হোক দু'টা নাকে-মুখে গুঁজিল। আবার কি নূতন জিনিস খাইতে দিবে তাম্বুচাঁদের বাড়ি গেলে, পেটে জায়গা রাখিতে হইবে তো!

তিনু ছাড়া আরও দু'টি ছেলে জুটিল পথে। চার জনে ঢালিপাড়ায় চলিল। তাম্বুচাঁদের বুড়ি মা তাড়াতাড়ি মাদুর পাতিয়া দিল দাওয়ার উপর। সংসারের সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল। তাম্বুচাঁদ জন্মিয়াছিল সেই যেবার বড় বন্যা হয়। গাঙের জল জামগঞ্জের সদর-বাড়ি অবধি উঠিবার জো করিয়াছিল। সে কি কাণ্ড! ঘরের পাশে কল-কল শব্দ। সর্দার তখন বাঁচিয়া। বউয়ের গা ঠেলিয়া বলে, ওঠো শিগ্‌গির, রক্ষে নেই—বান এয়েছে।

বৃষ্টিটা তখন বন্ধ হইয়াছে। ফুটফুট করিতেছে জ্যোৎস্না। চাহিয়া দেখে, মাঠঘাট একাকার। জল ক্রমে উঠানে আসিল। ঐ অবস্থায় সর্দার তাকে ঘরের আড়ার উপর তুলিয়া দিল। তালের আড়া, ভাল করিয়া চাঁচা নয়, হাত-পা ছড়িয়া গেল। সে আর সর্দার আড়ার উপর পাশাপাশি বসিয়া রাত্রি কাটাইল। সেই যে বড় বান আসিয়াছিল—ক-বছর হইল বল তো?

আঙুলের কর গণিয়া বুড়ি হিসাব করে। কুড়ি পুরিতে দুই কম। ছেলের তবে কত বয়স হইয়াছে, দেখ। এখন বিয়ে দিলে হয়, মেয়েও ঠিক হইয়া আছে—নরম-সরম গড়ন, এপারে—হ্যাঁ, এই পাড়ার মধ্যেই তাদের বাড়ি। ছুতোয়, বলিয়া ফেলাই যাক—রঘুনাথ সর্দারের মেয়ে যমুনা। বছর ছয়-

সাতের একটি মেয়ে এক শিশুকে জাপটাইয়া উঠানে বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া উহাদের দেখিতেছিল। মেয়েটিকে দেখাইয়া বুড়ি বলিল, ঐ বয়সি হবে আর কি! দেখতে অমন নয়—ওর চেয়ে অনেক সুন্দর।

আবার ঘরে গিয়া পানের বাটা লইয়া আসিল। পা ছড়াইয়া বসিয়া বুড়ি সুপারি কাটে। এত বয়স হইয়াছে, চোখেও নাকি ভাল দেখিতে পায় না। কিন্তু সুপারি কাটিতেছে কত মিহি ও চমৎকার।

ভানুচাঁদ তামাক সাজিয়া আনিল। কড়া দা-কাটা তামাক—গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। কলাপাতার ঠোঙায় কলিকা বসাইয়া একের পর এক টানিতে লাগিল। হাতে হাতে ঘুরিয়া কলিকা আসিল কীর্তিনারায়ণ অবধি। সে ঘাড় নাড়ে। না, ইহা চলিবে না। এই জন্যই এত করিয়া বলিয়াছিল ভানুচাঁদ? তামাক খাওয়ার জো তার নাই। ঘোষদের কোন এক পূর্বপুরুষ মরিবার আগে মানা করিয়া গিয়াছেন। সৌদামিনীর কাছে কীর্তিনারায়ণ গল্প শুনিয়াছে, এক শীতের রাত্রে লেপের নিচে শুইয়া ঘোষ-বংশের একজন মৌজ করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। কখন ঘুমের আবিল আসিয়াছে, কলিকার আগুন বিছানায় পড়িয়াছে। দাউ-দাউ করিয়া মশারি জ্বলিয়া উঠিল। এক লাফে উঠিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া মশারিটা তিনি একদিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। বউয়ের তখন কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে। সুন্দরী বউ, ঐ তল্লাটের অসংখ্য মেয়ে দেখিয়া তার মধ্য হইতে পছন্দ করিয়া আনা বউ। মুখ পুড়িয়া তার এমন চেহারা হইল যে দেখিলে আঁৎকাইয়া উঠিতে হয়। সারা জীবন এই বউ লইয়া ঘর করিতে হইয়াছিল। তামাক খাইতে গিয়া এই দশা করিয়াছেন, অহরহ খচ-খচ করিয়া তাঁর মনে বিঁধিত। নিজে তো কোনদিন আর তামাক খান নাই—মরিবার সময় ছেলেপুলেদের মানা করিয়া গেলেন। ঘোষ-বংশে সেই হইতে তামাক চলে না।

এই ছেলেগুলি লুকাইয়া চুরাইয়া কালে-ভদ্রে দু-একটান টানিয়াছে। প্রকাণ্ড দাওয়ায় এ রকম আড্ডা জমাইয়া তামাক খাওয়া—এ এক নূতন

অভিজ্ঞতা। একেবারে বর্তাইয়া গিয়াছে তারা। একটা ছিলিম শেষ হইলে ভানুচাঁদ দ্রুত করিয়া আবার সাজিতে বসিল।

ভিনু বলে, দেখই না পরখ করে কীর্তি। কি হবে?

উঁহু—

খেলে মরে যাবে না। আমরা তো মরি নি।

তোরা আর আমরা কি এক?

ছুটো করে মাথা বুঝি তোমাদের? দো-মহলায় থাক বলে নাকি?

যা-যা-যা—

তাড়া দিয়া কীর্তিনারায়ণ চুপ করিয়া থাকে। তামাক খাওয়া শেষ করিয়া উহারা কলিকা রাখিয়া দিয়াছে, গল্পগুজব হইতেছে—হঠাৎ দু-হাতের চেটোয় সেই পোড়া-কলিকা তুলিয়া শোঁ-শোঁ শব্দে সে কি টান! কীর্তিনারায়ণ মরীয়া হইয়া টানিতেছে।

ভানুচাঁদ হাসিয়া বলে, কলকে ফেটে যাবে ঘোষ মশায়। বড়-তামাকও মানুষে এ রকম টানে না।

তিন পুরুষের নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিল কীর্তিনারায়ণ। ক্রমে তামাকের নেশা ধরিয়া গেল। ফাঁক পাইলেই সে ঢালিপাড়ায় আসে। একা নয়—দলের দু-পাঁচ জন সঙ্গে জুটিয়া যায়। বাড়ির ধারে চাঁদ কাঁটার জঙ্গল মারিয়া কাঠা দশেক জমিতে ভানুচাঁদ বেগুন ও ভুঁই-কুমড়া ফলাইবার চেষ্টায় আছে। বড় কঠিন ব্যবস্থা—তামাক খাইতে হইলে সেই জমি কোপাইয়া দিতে হইবে। রোদের তেজ হইয়াছে, দুপুরবেলা বাহিরে তিষ্ঠানো দায়, পা জ্বলিয়া ওঠে, মাটি কোপাইতে কোপাইতে সর্বাঙ্গে ঘামের ধারা বহিয়া যায়। কিন্তু উপায় তো নাই। কাজে লাগাইয়া দিয়া ভানুচাঁদ তামাক সাজিতে চলিয়া যায়। ইহারা তাগিদ দেয়, কই ভাই, হল? রান্নাঘর হইতে ভানুচাঁদের জবাব আসে, বাঁশের চেলার আগুন কিনা—কিছুতে ধরছে না। পই ধরে সীমানার আ'ল অবধি চলে যাও তোমরা। আমি ধরিয়ে নিয়ে আসছি।

সীমানা অবধি কোপানো শেষ না হইয়া গেলে কোনদিনই তামাক ধরে না।

কীর্তিনারায়ণকে ভাণুচাঁদ অবশ্য মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না। কিন্তু দলের মধ্যে নিকর্মা থাকিয়া সকলের শ্রমের তামাক খাইবে সে কোন্ বিবেচনায়? কোদালি হাতে সে-ও নামিয়া পড়ে। তামাক খাইবার পর আরও মুশকিল। তুলসীর পাতা চিবাইতে হয়, মুখে গন্ধ পাইলে মুরারি পণ্ডিত পিটাইয়া আধ-মরা করিবেন। কীর্তিনারায়ণের আবার গুরুমহাশয়ের উপরও আর দু-জন আছেন—মা ও বাবা।

(৮)

একদিন ভাণুচাঁদ খবর দিল, আজকে যাত্রা আছে। অঘোর অধিকারীর দল। নূতন পালা, কলঙ্ক-ভঞ্জন—

কীর্তিনারায়ণ লাফাইয়া উঠে, কোথায় রে? কদ্দূর?

বরণডাঙায়—মাধব দাস বাবাজির আখড়ায়। দূর আর কি, খাল পার হয়ে পোয়াটাক যদি হয় বড় জোর। ওরা পারাপারের নৌকোর ব্যবস্থা করেছে, অসুবিধা কিছু নেই। কলকে-তামাকও সঙ্গে নিয়ে যাব।

প্রলুব্ধ স্বরে কীর্তিনারায়ণ বলে, আমি যাব—নিয়ে যাবি?

কিন্তু উপায় কি বিশাল প্রাসাদ হইতে অত রাত্রে বাহির হইয়া যাইবার?

যাইতেই হইবে, কলঙ্ক-ভঞ্জন পালা সে শুনিবেই। নাককাটির খালে জোয়ার লাগিবে দেড় প্রহর রাত্রে। জেলেরা ভেসাল জাল তুলিয়া বাড়ি ফিরিবে। জেলেদের কথাবার্তা, বৈঠা বাহিবার সময় ডিঙির গায়ে আওয়াজ—এই সব হইবে সঙ্কেত। সেই সময় কীর্তিনারায়ণ খিড়কির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিবে। দরজা খোলা থাকিবে, তা আর করা যাইবে কি? বরঞ্চ ফিরিবার সময় ইহাতে সুবিধাই হইবে।

ভাত খাইয়া কীর্তিনারায়ণ যথারীতি শুইতে গেল। এক বড় খাটে তার আর শ্যামকান্তর বিছানা। একটু পরেই শ্যামকান্ত ঘুমাইয়া পড়িল। কীর্তি-নারায়ণ উস-খুস করিতেছে। সৌদামিনী শুইবার পূর্বে আবার মশারি গুঁজিয়া দিয়া যান। ভাবিয়া ভাবিয়া সে এক বুদ্ধি বাহির করিল; পাশবালিশটা শিয়রের

বালিশের উপর শোয়াইয়া আগাগোড়া কাঁথা দিয়া ঢাকা দিল—যেন কীর্তি-নারায়ণই মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। জোয়ার আসিল কিনা, ঘরের ভিতর হইতে বুঝিবার উপায় নাই। এদিক-ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া এক সময় সে বাহির হইয়া গেল। পাঁচিলের ধারে গাবতলায় ক্ষণকাল উৎকর্ণ হইয়া সে জোয়ারের সাড়াশব্দ লইতে লাগিল। আবার বাড়ির দিকেও তাকাইয়া দেখিতেছে কেউ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা।

ভাদুচাঁদ ঠিক সময়ে আসিল।

অন্ধকার রাত। কিন্তু বাঁধের শুকনা রাস্তা—চলিতে কষ্ট হইতেছে না। তামাক সাজিয়া লইয়াছে, দু-জনে পালা করিয়া টানিতেছে। এক ছিলিম শেষ হইয়া গেলে পথের ধারে বসিয়া আবার সাজিয়া লয়। খোলা মাঠের হাওয়ায় মনের আনন্দে অবাধ স্বাধীনতায় তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। কাহাকেও সমীহ করিবার আবশ্যক নাই এখন। চিতলমারির খাল পার হইয়াও পথ ক্রোশ খানেকের কম হইবে না, কিন্তু নব-আস্বাদিত আনন্দে তারা যেন উড়িয়া চলিল।

কী তাজ্জব যে গাহিল অঘোরের দল! জুড়ির গানের ধরতা দেয় অঘোর নিজে। গেরুয়া রঙের আপাদ-লম্বিত একটা জামা পরিয়া সে আসরে নামে। আটখানা মেডেল পাইয়াছে; গলায় ঝুলানো সেই মেডেলের মালা লণ্ঠনের আলোয় ঝিকমিক করে। বুড়ো হইয়াছে, কিন্তু গলা কি মিঠা! মেডেল লোকে তাহাকে অমনি দেয় নাই।

পালা ভাঙিতে সকাল হইয়া যাইবে, আগেই তারা ফিরিল। খিড়কির দরজা খোলাই আছে, কীর্তিনারায়ণ টিপিটিপি উপরে উঠিয়া আসিল। হাত-পা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, ধরা পড়িলে রক্ষা নাই। নিঃশব্দে সে শুইয়া পড়িল।

দু-এক বাড়ি গাহিবার পর অঘোরের দলের নাম পড়িয়া গেল। মূল-পালা শেষ হইবার পর প্রহসন হয় দু-একখানা। অঘোরের সে সময়টা আসরে কাজ নাই, সাজঘরে আসিয়া সাজ-পোশাক ও চুল-দাড়ি গণিয়া মিলাইয়া বাক্সবন্দি করে। প্রায়ই ডাক আসে সেই সময়।

শুনবেন একটু, অধিকারী মশায়। শনিবারের দিনটা আমাদের ওখানে। বায়না নিয়ে নেন, কাল থেকে নেমন্তন্নে লোক বেরুবে।

অঘোর বলে, শনিবারের দিন মালাধর গোমস্তা মশায়ের বাড়ি। শনিবার নয় আজ্ঞে। রবিবারেও না—সোমবার। পহর খানেকের মধ্যে পৌছব গিয়ে। রান্নাবান্না ওখানে—আটত্রিশ জন লোক আমার দলে।

হাসিয়া বলে, পোনামাছ খাওয়াতে হবে, মশায়। তা হলে গান কি রকম জমিয়ে দেব দেখতে পাবেন। পেটে খেলে পিঠে সয়। মূলোর শুক্তো খেয়ে কি এ্যাকটো করা যায়—বলুন।

এ-গ্রামে সে-গ্রামে প্রত্যহ গাওনা লাগিয়া আছে। কীর্তিনারায়ণকেও নেশায় পাইয়াছে, ইতিমধ্যে দিন তিনেক চুরি করিয়া শুনিয়া গিয়াছে। একই পালা দু-তিনবার দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না। জাদুচাঁদ সব দিন যাইতে চায় না, তখন একাই চলিয়া যায়। কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া চাষাভূষা জন-মজুর ঢালি-লাঠিয়ালদের মধ্যে ঘাড় গুঁজিয়া বসে, কেউ যাহাতে চিনিতে না পারে। অঘোরের সঙ্গে আলাপও হইয়াছে। ভাল লোক অঘোর—কীর্তিনারায়ণের চেহারা দেখিয়া বলিয়াছে, সে যদি দলে আসে শিখাইয়া পড়াইয়া তাকে এমন কি বিশাখার পার্টও দিতে রাজী আছে।

একদিন এক কাণ্ড হইল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে, শ্যামকান্ত সহসা কীর্তিনারায়ণের হাত আঁটিয়া ধরিল।

কোথায় যাও ?

আমতা-আমতা করিয়া কীর্তিনারায়ণ বলে, এই—বাইরে একটুখানি। আবার এখুনি আসব।

হাত ছাড়িয়া শ্যামকান্ত তার কোঁচার খুঁট ধরিল।

রোজই তুমি চলে যাও, আমি জানি।

মিথ্যে কথা।

কাল গিয়েছিলে। পরশুও। কাউকে কিছু বলি নি, দেখছি তোমার দৌড়—

কীর্তিনারায়ণ তথাপি সামলাইবার চেষ্টা করে। যাব আর কোথায়? গরম লাগে, বারাণ্ডায় ঘোরাফেরা করি একটু।

ঘরের দরজা খোলা রেখে তুমি চলে যাও—

কীর্তিনারায়ণ চটিয়া গিয়া বলে, থাকলই বা দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে কিসের ভয়? কাপুরুষ!

পরক্ষণেই আবার খোশামোদের ভাবে বলে, বলে দাও নি যে—ভাল করেছ, চমৎকার করেছ। নিজেদের কথা বাইরে বলা কি ভাল? কাল পদ্মের চাক তুলে এনে খাওয়াব তোমায়। ঘাড় নাড়ছ—আচ্ছা, কি চাও তবে?

শ্যামকান্ত যা চাহিল, কীর্তিনারায়ণ শুনিয়া অবাক। এই সব আদর্শ-ছেলেদের মনেও এমন শখ জাগে তাহা হইলে! শ্যামকান্ত বলিল, আমি যাব তোমার সঙ্গে। যাত্রা শুনব।

না, লক্ষ্মী। ননীর পুতুল তুমি—শেষকালে বিপদ ঘটিয়ে বোসো! বৃষ্টি হয়ে গেছে—পথে নেমেই তো পিছলে আছাড় খেতে শুরু করবে। সকালবেলা শুনব, সান্নিপাতিক জ্বরবিকারে ধরেছে।

শ্যামকান্ত রুষ্টচোখে চাহিয়া আছে। কিন্তু সাহসে কুলায় না কীর্তিনারায়ণের। এখন একটা ঝোঁক হইয়াছে, গান শুনিয়া ফিরিবার সময়ের অবস্থাটা আন্দাজ করিতে পারিতেছে না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, আমি যাচ্ছি না। ক্ষমা দেও, এই শুয়ে পড়লাম। হল?

কিন্তু মনে মনে সে অধীর হইয়া উঠিতেছে। গান মালাধর সেনের বাড়ি। বউভাসির চকের সে তহ্‌শিলদার, স্থানীয় লোক—শ্যামগঞ্জের পূর্বপ্রান্তে তার বাড়ি। খুব হুঁশিয়ার লোকটি। ধানের সময়টা এই সর্বসমেত মাস তিন-চার মাত্র বরিশাল সদর-কাছারি হইতে একজন নায়েব পাইক-বরকন্দাজ লইয়া আদায়পত্র তদারক করিতে আসেন। সেই কয়মাস মালাধরের চণ্ডীমণ্ডপে খুব জাঁকাইয়া কাছারি বসে। বাকি সময়টা একাই সে সর্বেসর্বা, তার উপর কথা বলিবার কেউ নাই। সেই চণ্ডীমণ্ডপের সামনে আসর। দু-ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ ভাঙিয়া কতবার কীর্তিনারায়ণ গিয়া পালা শুনিয়া আসিয়াছে,

আর এক রকম স্বরের দুয়ারে বলিলে হয়—এখানে যাওয়া ঘটিবে না? অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্যামকান্তর সঙ্গে আজে-বাজে বকিয়া তার গা টিপিয়া কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া অনেক কষ্টে তাকে ঘুম পাড়াইল।

একা যাইতেছে। মেঘ সরিয়া ম্লান জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে এতক্ষণে। বাঁচোয়া—বৃষ্টির জন্য যাত্রা ভাঙিবার সম্ভাবনা আর রহিল না। বাঁশবন। এই জায়গাটায় আসিলে ভয় করে, কীর্তিনারায়ণের গান ধরিতে ইচ্ছা করে। কৈলাস কর্মকার গল্প করে, ঝিকরগাছার হাটে গরু কিনিয়া একবার অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিতেছিল। এইখানে আসিয়া দেখিল, অতিকায় একটা মানুষের মতো, মুণ্ড নাই, নুইয়া-পড়া একটা বাঁশ দু-হাতে ধরিয়া দোল খাইতেছে। নিজের চোখে স্পষ্ট দেখিয়াছে কৈলাস; কেহ অবিশ্বাস করিলে সে গা ছুঁইয়া বলিতে যায়।

ক্যাঁচকোঁচ বাঁশবনে শব্দ উঠিতেছে। যেন একটা ষড়যন্ত্র—অপদেবতাদের কারসাজি। কীর্তিনারায়ণকে একলা পথে দেখিয়া ভয় দিতেছে। বাঁশের আগা হইতে ঝুল খাইয়া হঠাৎ কন্ধ-কাটা কেহ যদি লাফাইয়া পড়ে! দম ভরে 'রাম' 'রাম' বলিতে বলিতে সে দৌড় দিল। রাম-নাম মুখে থাকিলে ভূতপ্রেতের কিছু করিবার জো নাই।

এক দৌড়ে অন্ধকার অংশটা পার হইয়া কীর্তিনারায়ণ মাঠে আসিয়া পড়িল। মানুষ-জনের শব্দ-সাড়া আসিতেছে, আর ভয় নাই। এ্যাকটো হইতেছে, ক্রমশ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। পিছনের একটা জায়গায় কীর্তিনারায়ণ বসিয়া পড়িল। কিন্তু ভিন্ন গ্রামে দূরের জায়গায় যাহা চলে, গ্রামের ভিতর তাহা চলিল না। কে-একজন চিনিতে পারিয়া চুপি-চুপি মালাধরকে গিয়া বলিল। মালাধর ছুটিয়া আসিল।

এখানে কেন ঘোষ মশায়? সামিয়ানার নিচে চৌকি পেতে রেখেছি তা হলে কাদের জন্যে? আসতে আজ্ঞা হোক, হুজুর। কত ভাগ্যি, অধম জনার উঠোনে হুজুরের পায়ের ধুলো পড়ল।

মালাধর নিচু হইয়া অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে পিছু হাঁটিতেছে। শিবনারায়ণের

ছেলে বিনা আহ্বানে যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে, সকলে অবাক হইয়াছে, সরিয়া পথ করিয়া দিতেছে।

মজা লাগিতেছে কীর্তিনারায়ণের, হাসিও পাইতেছে। কতটুকু সে—মালাধর তবু তাকে 'হুজুর' 'ঘোষ মশায়' বলিয়া আহ্বান করিতেছে, আর এই রকম অতি-রিক্ত বিনয় দেখাইতেছে। ধীর ভাবে গিয়া সে আসরের চৌকির উপরে বসিল, যেন এমনি ব্যাপারে সে প্রতিনিয়ত অভ্যস্ত। একটা থালা পাতিয়া রাখা হইয়াছে, লোকে পেলা দিতেছে, ঝনঝন সিকি-দুয়ানি পড়িতেছে। বউভাসির চকের একজন চাষী প্রজা সেই থালার সামনে বসিয়া। পয়সা-কড়ি গণিয়া গাঁথিয়া রাখার ভার তার উপর। লোকটা বুড়ামানুষ হইলেও গড় হইয়া কীর্তিনারায়ণকে প্রণাম করিল। দেখাদেখি আরো অনেকে প্রণাম করিল। ঢালিপাড়ায় মাঝে মাঝে সে গিয়া থাকে, কিন্তু সেখানকার লোক এমনধারা প্রণাম করে না। মালাধর ইতিমধ্যে তিবায় করিয়া পান আনিয়াছে; রূপা-বাঁধানো হুঁকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া আনিয়াছে। গোলমালে গান একটু বন্ধ হইয়াছিল—কীর্তিনারায়ণ হুঁকায় একটা-দু'টা টান দিতে শুরু করিলেই আবার আরম্ভ হইল।

সঙ্কোচ তবু কাটিতে চায় না। বয়স নিতান্ত কম বলিয়াই হয়তো। তবু মোটের উপর খাসা লাগিতেছে কীর্তিনারায়ণের। ভুড়ুৎ করিয়া তামাকে এক একটি টান দিতেছে, খিলির পর খিলি মুখের মধ্যে ফেলিতেছে। তাল-লয় বোঝে ছাই—তবু নরহরির অনুকরণে চৌকির উপর মৃদু আঘাত দিতেছে এক একবার। পিছন হইতে কাঁধের উপর হঠাৎ একখানা হাত আসিয়া পড়িল। আসরের লোকজন যেন জমিয়া গিয়াছে। সকলের চক্ষু গানের দিকে নয়—এই দিকে। শিবনারায়ণ আর নরহরি এই রাত্রে চলিয়া আসিয়াছেন, নরহরি হাত রাখিয়াছেন কীর্তিনারায়ণের কাঁধের উপর।

মুহূর্তে শোরগোল পড়িয়া গেল। আজ কি হইতেছে বল তো—এ সমস্ত যে স্বপ্নের অগোচর! অভ্যর্থনার জন্য অনেকে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, দস্তুর-মতো ভিড় জমিয়া গেল ইহাদের ঘিরিয়া। পরে একটু ঠাণ্ডা হইয়া

আসিলে খেয়াল হইল, কীর্তিনারায়ণ ইতিমধ্যে ফাঁক বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

গায়েনদের উদ্দেশ্যে নরহরি বলিলেন, তোমরা থেমে গেলে কেন? গান মাটি কোরো না, চালাও—

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও চৌকির উপর তাঁরা বসিলেন না। নরহরির আপত্তি ছিল না—কিন্তু শিবনারায়ণের দিকে চাহিয়া ইচ্ছাটা আপাতত সংযত করিতে হইল। যে গানটা চলিতেছিল, দাঁড়াইয়া তার শেষ অবধি শুনিলেন। তারপর নরহরি প্রশ্ন করিলেন, অধিকারী কোথায়?

অঘোর আসিয়া নত মস্তকে পায়ের ধূলা লইল। নরহরি বলিলেন, সকাল বেলা দেখা করবে। দরকার আছে।

তারপর অলক্ষ্য অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কীর্তি এই যে এখানে ছিল, কোথায় পালাল—ডেকে দাও দিকি—

না, না, কাজ নেই—আপনি যাবে, কারো তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। শিবনারায়ণ নরহরির হাত ধরিয়া টানিলেন। চলো—এখানে একটা হাঙ্গামা করে এদের আসর মাটি করব না।

দোতলার অলিন্দে সৌদামিনী ইহাদের জন্য বসিয়াছিলেন। ফিরিয়াছেন দেখিয়া নামিয়া আসিলেন। শ্যামকান্তও দরজা খুলিয়া আসিল।

পাওয়া গেল না?

শিবনারায়ণ একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

শ্যামকান্ত বলিল, আমি কথা বের করে নিয়েছিলাম বাবা। একটু ভয়ের ভাব এসেছিল, অমনি পালিয়েছে। ঠিক ঐখানে আছে। কোথায় ঘাড় গুঁজে বসে আছে, তোমরা খুঁজে পেলে না।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, পেয়েছিলাম বই কি, পিছনে সরে গেল। দেখুন দিকি বউঠান, এসে আবার ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়েছে কিনা?

সৌদামিনী বলিলেন, যাই বলুন চৌধুরি মশায়, বড্ড রাগ কিন্তু আপনাদের। রাত্তিরবেলা নিজেদের যাবার গরজটা কি ছিল? কাউকে পাঠিয়ে দিলেই হত।

নরহরি বলিলেন, ভায়ার কথা বলতে পারি নে—আমি গিয়েছিলাম কিন্তু রাগ করে নয়। শুনবার লোভ ছিল, কি এমন গান—যার জন্ম কীর্তি রোজ রোজ পাগল হয়ে বেরিয়ে যায়! এখন রাগ হচ্ছে। এই শুনবার জন্ম এত?

কীর্তিনারায়ণ আর আসরের মধ্যে আসে নাই। অন্ধকারে বসিয়াছিল, গান ভাঙিলে লোকজন চলিয়া গেলে আসিল। বয়সের বিস্তর তফাৎ সত্ত্বেও অঘোর ইতিমধ্যে অভিন্নহৃদয় বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে; তার সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন। অঘোরও বিশেষ ভাবনায় পড়িয়াছে, নরহরি তাকে ডাকিয়া গেলেন কেন? কীর্তিনারায়ণ নিজে চলিয়া আসে, সে তো কখনো বাড়ি হইতে ডাকিতে যায় না। তার উপর আক্রোশ কেন তবে? নরহরি চৌধুরি নিজে আসিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন, না গিয়া কোনক্রমে উপায় নাই। সাব্যস্ত হইল কাল সকালে দু-জনে কিছু আগ-পাছ হইয়া যাইবে। যদি কীর্তিনারায়ণকে বাড়ি থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন, অঘোরের সঙ্গেই সে চলিয়া যাইবে; দেশ-বিদেশে যাত্রা গাহিয়া বেড়াইবে। জায়গার অভাব কি পৃথিবীতে?

যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে ডাল-ভাত খাইয়া উহাদের সতরঞ্চির একপাশে শুইয়া কীর্তিনারায়ণ রাত কাটাইল। রোজ সৌদামিনী বারম্বার উঠিয়া তাদের মশারি গুঁজিয়া দিয়া যান, যাহাতে মশা ঢুকিয়া গায়ে বসিতে না পারে। আজ একা শ্যামকান্ত ঘুমাইতেছে। অভ্যাসমতো সেই ঘরে আসিয়া সৌদামিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, তারপর ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। দশমীর চাঁদ ডুবিয়া চারিদিক অন্ধকার হইল। নিঃশব্দে তিনি বসিয়া রহিলেন।

অনেক রকম যুক্তি আঁটিয়া অঘোরকে লইয়া কীর্তিনারায়ণ বাড়ি ঢুকিল। নিজে দরজার কাছে দাঁড়াইল, অঘোর আগাইয়া গেল। নরহরি মুখ তুলিয়া অঘোরের দিকে চাহিলেন।

তোমার সঙ্গে আগে মিটিয়ে নিই। বোলো—

শিবনারায়ণ সদর-উঠান দিয়া যাইতেছিলেন। কীর্তিনারায়ণকে দেখিয়া দ্রুত পায়ে আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

এসো—

নরহরি অনুনয়ের সুরে বলিলেন, একদিন একটা অন্যায় করে ফেলেছে—মার-ধোর কোরো না ওকে।

শিবনারায়ণ হাসিয়া ফেলিলেন।

মেরে মনের মোড় ফেরানো যায় না—আমি জানি, নরহরি। পালিয়ে যাব ভাবছি একে নিয়ে।

ছেলেকে এক রকম টানিয়া লইয়া শিবনারায়ণ অন্দর-বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন।

নরহরি ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁরও দু-একটা কথা ছিল কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে। এই গান শুনিতে সে কষ্ট করিয়া যায়—রুচির জঘন্যতা লইয়া গালিগালাজ করিবেন, ভাবিয়াছিলেন। আপাতত তাহা হইল না।

মুখ ফিরাইয়া তারপর বলিলেন, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বোসো অধিকারী—

বসিবে কি, কথাবার্তার ধরনে অঘোর অবাক হইয়া গিয়াছে। কি মিটাইয়া লইবেন, মিটাইবার মতো ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে চৌধুরি মশায়ের সঙ্গে?

নরহরি বলিলেন, তোমাকে খুন করা উচিত।

অঘোর ঘামিয়া উঠিয়াছে। বলে, আজ্ঞে—

ও-রকম পালা গাও কেন?

বেকুবের মতো অঘোর চাহিয়া আছে। নরহরি বলিলেন, গান গাওয়া নয়, ও হল সরস্বতীর মাথায় মুগুর মারা। তোমার দলের নাম শুনে গিয়েছিলাম, টিকতে পারলাম না।

অঘোর বলিল, বাঁধনদার যেমন বেঁধে দিয়েছে, হুজুর।

পালা না বেঁধে ভুঁয়ে কোদাল মারতে বোলো তাকে।

এত নামডাক অঘোর অধিকারীর, তার সম্বন্ধে এই মন্তব্য! নরহরি বলিতে

লাগিলেন, পালার বিষয়টা হল কি—নাক-কাঁদুনি আর বেয়াড়া ভালবাসাবাসি। মানুষের মাথা খারাপ করে-দিচ্ছে, এমন গাওনা বন্ধ করে দাও।

একটু অভিমানের সঙ্গে অঘোর বলে, একটা ভাল পালা আপনি যদি বেঁধে দেন চৌধুরী মশায়—

তাই ভেবেছি আমি কাল সমস্ত রাত। ছড়া নয়—পালা বাঁধব এবার থেকে।

একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন, আগামী অমাবস্যায় মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে করছি। নির্বিঘ্নে যদি সমাধা হয়ে যায়, তারপর কাজকর্ম কিছু নেই—শিব-নারায়ণের দাপে অঢেল ছুটি। পালা-ই বাঁধব, ঠিক করলাম, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ—ভয়ঙ্করা নৃত্যপরা দিগম্বরী মা-জননী, এক হাতে রক্তমাখা খাঁড়া আর এক হাতে ছিন্নমুণ্ড অসুর। গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, কি বল অধিকারী?

ভাবাবেগে উঠিয়া আসিয়া নরহরি অঘোরের হাত জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, আমি বলি কি, কৃষ্ণ-যাত্রা ছেড়ে দিয়ে তুমি বরঞ্চ কালী-কীর্তন শুরু করে দাও। ও গানের তুলনা নেই।

শিবনারায়ণ সৌদামিনীকে বলিতেছিলেন, পালাতে হবে বড় বউ। এরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া, এ জায়গা আমাদের নয়। ছেলের কচি বয়স, নমনীয় মন—এদের সঙ্গে পড়ে বিষম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে।

সৌদামিনী বলিলেন, কিন্তু শ্যামকান্তকে দেখ—কেমন শান্ত-শিষ্ট। অথচ খোদ চৌধুরি মশায়েরই তো ছেলে!

শিবনারায়ণ চুপ হইয়া গেলেন, চোখের উপর এত বড় দৃষ্টান্ত থাকিতে সত্যই বলিবার কিছু নাই।

সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন, তোমার সেই সব দিনের কথা মনে কর। ছেলের রক্তের মধ্যে আগুন রয়েছে, অন্যের নামে দোষ দিলে হবে কেন?

শিবনারায়ণ বলিলেন, তা-ই যদি হয়—নেভাতে হবে সে আগুন। নয় তো যে দিনকাল আসছে, নিজেই পুড়ে মারা যাবে। আর নরহরি যে রকম বাতাস দিচ্ছে, এখানে থেকে তা সম্ভব হবে না। মালতীকে পাত্রস্থ না করা

পর্যন্ত টিকে থাকব ভেবেছিলাম, কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করা আর সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না।

স্মিতহাস্যে সৌদামিনী বলিলেন, মালতীর ভাবনা ভাবতে হবে না আর তোমার।

কেন? একথা বলছ কেন বড় বউ? বিয়ের কথাবার্তা তুমি কি বলেছ কারো সঙ্গে?

রহস্যপূর্ণ ভাবে চাহিয়া সৌদামিনী বলিলেন, শ্যামঠাকুরই জুড়ে গেঁথে দিচ্ছেন। জানেন, তাঁকে ছাড়া আর কোন দিকে তোমার মন দেবার ফুরসৎ নেই—তাই কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছেন আমাদের।

শিবনারায়ণের মনে সহসা একটি মনোরম সম্ভাবনার উদয় হইল। একদিন মালতী আর শ্যামকান্তকে একত্র দেখিয়া মুহূর্তের জন্য কথাটি ভাবিয়াছিলেন। তারপর আর মনে ছিল না। সংসারের কোন বিষয়েই স্থিরলক্ষ্য হইয়া তিনি ইদানীং কিছু করিতে পারেন না। যে কাজগুলো কাঁধে আসিয়া পড়ে, যন্ত্র-চালিতের মতো নিতান্ত দায়সারা ভাবে তাহা সমাধা করিয়া যান—এই পর্যন্ত। আর এমনি বাজে কাজ করিতে হয় বলিয়া এক মুহূর্তও মনে শান্তি বোধ করেন না।

আজ তাঁর সত্যই আনন্দ হইল। অজ্ঞাতে কাঁধের বোঝা এত লঘু হইয়া গিয়াছে, জানিতে পারিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্বাস ফেলিলেন। শ্যামকান্ত ছেলেটিকে তাঁর বড় পছন্দ।

নরহরি আসিয়া বলিলেন, মন্দির আর দীঘি তো শেষ হয়ে গেল। আগামী অমাবস্যায় প্রতিষ্ঠা করব, মনস্থ করেছি।

বলিতেছেন আর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিবনারায়ণের মুখ-ভাব নিরীক্ষণ করিতেছেন। বলিলেন, কিন্তু তোমার আপত্তি থাকে তো বল, উৎসব আমি বন্ধ করে দেব।

শিবনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, ধুমধাম করে তুমি তোমার ইষ্টদেবীর পূজা করবে, আমি কেন আপত্তি করতে যাব ভাই?

কথা লুফিয়া লইয়া নরহরি বলিলেন, ঠিক কথা! যে কালী, সেই তো কৃষ্ণ। তবু তুমি চলে যেতে চাচ্ছ!

এ জন্য নয় হরি-ভাই। ছেলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অহরহ মনে হয়, আমার পিতৃকৃত্যে অপরাধ ঘটছে। আর তোমাদেরও অসুবিধার কারণ হয়ে উঠছি দিন দিন।

নরহরি রাগ করিয়া বলিলেন, তোমার কানে কে এই সব মিথ্যেকথা ঢোকায় বল তো? সৌভাগ্য উছলে পড়ছে, শ্যামশরণের আমল ফিরে আসছে শ্যামগঞ্জে—আর অসুবিধার কারণ হলে তোমরা?

মিথ্যে আশা—শ্যামশরণের দিন আর ফিরবে না, অতীত কখনো ফিরে আসে না, হরি-ভাই!

কিন্তু যেটা আসল আপত্তি বলিয়া নরহরির বিশ্বাস, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই প্রসঙ্গে তিনি আসিলেন। তোমার শ্যামঠাকুরের জন্যও নূতন মন্দির গড়া এর পর। হাসছ কেন ভাই, আমি সেখানেও অঞ্জলি দেব, দেখো।

শিবনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, খবরদার, ঐটি কোরো না। শ্যামঠাকুরের অঞ্জলির মন্ত্র পড়বার সময় তোমার মনে আর মুখে অমিল হবে। ভাবের ঘরে চুরি করতে যেও না।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ঐ যদি সত্যি সত্যি মনের ইচ্ছে, আপাতত তবে সড়কিওয়ালাগুলোকে বিদেয় কর দিকি। ওদের আর রেখেছ কেন?

আজকে দরকার হচ্ছে না—কিন্তু কোনদিন দরকার হবে না, তাই কি কেউ বলতে পারে?

শিবনারায়ণ বলিলেন, শ্যামঠাকুরের মন্দির গড়াতে চাচ্ছ, কিন্তু চকচকে ফলা দেখে প্রেমের ঠাকুর এ বাড়ির দেউড়ি দিয়ে ঢুকতে ভরসা পাবেন না যে!

নরহরি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সেই প্রথম পরিচয়-দিনের লাঞ্ছনা এখনো তিনি ভুলিতে পারেন নাই। বলিলেন, আর তোমার লাঠি? সে যে বিশটা সড়কির মহড়া নেয়, ভাই। তুমি যখন লাঠি চালাও, ঠাকুর ভাবেন বুঝি ফুল ছড়ানো হচ্ছে?

মধুর হাসিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, কোথায় লাঠি? লাঠি তারপর আমি গলায় ভাসিয়ে দিয়েছি। কুড়িয়ে নিয়ে ঠাকুর বাঁশী করেছেন। সেই বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে তিনি ডাকেন।

নরহরি বিস্মিত চোখে শিবনারায়ণের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। দূরের মানুষ অনেক করিয়া কাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আবার তিনি দূরবর্তী হইতেছেন—ঐ দৃষ্টিতে আর কথার সুরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কাতর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, তোমার কোথাও যাওয়া হবে না বন্ধু, যেতে আমি দেব না। তোমার যখন ইচ্ছে নয়, কীর্তির সঙ্গে কথাই বলব না আর আমি। তোমার ছলে—যা-ই আমার ইচ্ছে হোক, আমার পথে আমি তাকে নিতে যাব কেন?

ইহার পর নরহরি একটিমাত্র কথা বলিয়াছিলেন কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে। কাকা আমাদের ছেড়ে যাবে যাবে করছে। তুমি বাপু মন দিয়ে পড়াশুনো কর। আর কখনো আমার কাছে এসো না।

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল। চোখে কখনো জল আসে না নরহরি চৌধুরির। আর এক দিকে চাহিয়া সহসা তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

(৯)

ইহার পর দিন কতক কীর্তিনারায়ণ পড়াশুনায় খুব মনোযোগ দিল। নিয়মিত পাঠশালায় যাইতেছে, সন্ধ্যার পর রেড়ির তেলের দীপের সামনে ধারাপাত পাঠ অভ্যাস করে। অঘরের দলও অঞ্চল ছাড়িয়া বিদায় হইয়াছে, রাতে বাহির হইবার আপাতত কোন উপলক্ষ নাই।

মুরারি পণ্ডিতের তামাক সাজার ভারটা সম্পূর্ণ বর্তাইয়াছে কীর্তিনারায়ণের উপর। তিনু প্রভৃতি আরও দু-একজন প্রত্যাশী আছে, কিন্তু কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে পারিয়া উঠে না। পণ্ডিতের মুখের আদেশের সবুর সয় না, ইসারা করিলেই—অনেক সময় ইসারা না করিতেই, কলিকা লইয়া সে ছুটিয়া বাহির হয়।

একদিন দু-টান দিয়া বড় রাগে পণ্ডিত কলিকাটা উপুড় করিয়া ঢালিলেন। গালি দিতে শুরু করিলেন, শেষটা বকুনি প্রায় কান্না হইয়া দাঁড়াইল।

দেখ্ তো বাবা, চেয়ে দেখ্—একটু তামাক আছে নাকি? পুড়িয়ে কয়লা করে আনলি?

কীর্তিনারায়ণ বড় অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে। বলে, তামাক নিতে মনে ছিল না পণ্ডিত মশাই। খাওয়া-কলকের আগুন তুলে এনেছি।

তা বই কি! কতকটা স্বগতভাবে পণ্ডিত গজ-গজ করেন। উচ্ছিষ্ট খাওয়াচ্ছিস—নরকে জায়গা হবে না, বুঝলি? তা-ও যদি একটু কিছু থাকতে এনে দিস। বাপরে বাপ—টানের চোটে কলকে ফাটে নি, সেই রক্ষে।

এদিকে যা হোক এক রকম চলিতেছে, কিন্তু বড় দায় ঠেকিয়াছে শুভঙ্করী লইয়া। কিছুতে রপ্ত হয় না। মণকষা কষিতে গিয়া কাঠাকালির আর্যা আওড়াইতে থাকে। শুভঙ্করীর সে নাম দিয়াছে ভয়ঙ্করী। এ ভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া আর চলে না। বাপ রাগ করুন আর যা-ই করুন, নরহরি যতই বোঝান, অতঃপর ইস্তফা না দিয়া আর উপায় নাই।

কিন্তু ভূগোলশাস্ত্রটা শুনিতে বড় কৌতুক লাগে। কীর্তিনারায়ণ নিজে পড়ে না—এখনো তার সময় হয় নাই। কোনদিন যে আসিবে, সে বিষয়ে দস্তুরমতো সন্দেহ—অন্তত পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তো সজোরে ঘাড় নাড়িবেন। কিন্তু বৃত্তি-পরীক্ষা দিবে, এমন ভাল ছাত্রও দু-পাঁচ জন আছে। তাদের কাছে মুরারি যখন ভূগোল বুঝাইতে শুরু করেন, প্রতি কথা কীর্তিনারায়ণ যেন হাঁ করিয়া গিলে। গ্রামের সামান্য পাঠশালা—সাকুল্যে দু-খানা মানচিত্র, পৃথিবী ও ভারতবর্ষ—তাহাতেই কাজ চলিয়া যায়। পণ্ডিত ভারতবর্ষের কথা বলেন, এক একদিন এক এক রকম পরিচয় দেন, ইতিহাসের প্রসঙ্গ ওঠে কখনো কখনো। রাজরাজড়ার উত্থান-পতনের কাহিনী নিতান্ত নিরাসক্ত ভাবে কীর্তিনারায়ণ শুনিয়া যায়। এই গ্রামগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে কসবা যাইতে পুরা একটা দিন লাগিয়া যায়। রেলগাড়ির নাম শুনিয়াছে—কিন্তু চোখে দেখার ভাগ্য অদ্যাপি হইয়া উঠে নাই। অনেক দূরের দিল্লী নগরীর ঐ

নব রাজকীয় জয়-পরাজয়ের সহিত এই শ্যামগঞ্জ এই পাঠশালা ঢালিপাড়া তার নিজের বাড়ি অঘোরের দলের গায়েনরা—ইহাদের কোন প্রকার যোগাযোগ আছে, বালকের তাহা ধারণায় আসে না। কিন্তু সে চেষ্টা করে ইতিহাসের কাহিনী আর ভূগোলের নিসর্গ-বৈচিত্র্য জুড়িয়া গাঁথিয়া ভারতবর্ষের সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে। পণ্ডিত বলেন, সোনার দেশ নাকি এই ভারতবর্ষ, আমাদের জন্মভূমি! কত পাহাড়-পর্বত নদ-নদী সমুদ্র-মরুভূমি হ্রদ-প্রান্তর শহর-গ্রাম এখানে! কত বিচিত্র ধরনের মানুষ!

ভাটির দেশের ছেলে, নদ-নদী তার অজানা নয়। পাহাড়-পর্বত? দীঘির পাড় উঁচু; আরও অনেক—অনেক উঁচু ও বহুদূরব্যাপী হইলেই পাহাড় হইয়া দাঁড়াইত। আর দীঘিটা এমনই তো প্রায় একটা হ্রদ। ধান কাটিয়া লইয়া যাইবার পর শীতের শেষাশেষি চিতলমারি ও নাককাটির খালের মাঝামাঝি চকগুলা একেবারে শুকাইয়া যায়, নিঃসীম মাঠ খাঁ-খাঁ করে, ইহাই তো মরুভূমি। আবার ভরা বর্ষায় চেহারা দেখ গিয়া ঐ সব চকের—মরুভূমি তখন সাগর হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষকে কীর্তিনারায়ণ তাদের ছোট শ্যামগঞ্জ বরণডাঙা ও আশপাশের দু-চারটা গ্রামের মধ্যে কল্পনা করিতে চায়। ভারতবর্ষকে সে চেনে না, জানে না। ম্যাপের উপর নানা রং ও রেখা দেখিয়া বিশেষ কিছু ধারণায় আসে না তার।

একদিন পণ্ডিতকে ধরিয়া বসিল, ভারতবর্ষের কোথায় তাদের এই শ্যামগঞ্জ—মানচিত্রে দেখাইয়া দিতে হইবে। মুরারি জানেন, একেবারে পণ্ডশ্রম। তা ছাড়া কীর্তিনারায়ণ হেন ছাত্রের এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়া তিনি কিছু অবাক হইলেন। একেবারে নাছোড়বান্দা—তার হাত কিছুতে এড়ানো গেল না। পণ্ডিত মানচিত্র খুলিলেন। গ্রাম তো পাওয়াই যাইবে না, থানা খুঁজিতে লাগিলেন। নাই। মহকুমা? তাহাও নাই। অনেক কষ্টে অবশেষে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে পাওয়া গেল জেলার নামটি—স্পষ্ট নয়, প্রায় আন্দাজে পড়িতে হয়।

সহস্র যোজনব্যাপ্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এত ছোট এবং সামান্য তাদের অঞ্চলটা!

মন্দির-প্রতিষ্ঠায় বাধা পড়িয়া গেল। শ্যামকান্তর জন্মের সুদীর্ঘকাল পরে নরহরির স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হইয়াছিলেন। একটি মেয়ে প্রসব করিয়া আঁতুড়ঘরে তিনি মারা গেলেন। মেয়েটি বাঁচিয়া রহিল—ফুটফুটে চমৎকার মেয়ে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিল। আরও কিছুকাল পরে সৌদামিনী একদিন শিবনারায়ণকে বলিলেন, পালাব-পালাব কর—পায়ে কেমন কড়া-বেড়ি পড়ে গেল দেখ। মেয়ে কার উপর ফেলে চলে যাই এখন? কে আছে ওদের?

শিবনারায়ণ নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, বুঝি না ঠাকুরের কি অভিপ্রায়!

নরহরিকে আবার বিয়ে করার জন্য সৌদামিনী ধরিয়া পড়িলেন।

নরহরি বলেন, কেন বউঠান পরের মেয়ের শাপমন্যি কুড়োব আবার? একবার বিয়ে করাই কি উচিত হয়েছিল আমার পক্ষে? একজনকে কি সুখী করতে পেরেছিলাম? ঘর-সংসার করা ধাতে আমার সয়? বলুন, আপনি বলুন।

ইহার সত্যতা এক বাড়ির মধ্যে থাকিয়া সৌদামিনীর চেয়ে কে বেশি জানে? তিনি আর কিছু বলিলেন না। ইহাই হয়তো নিয়ম। বাহিরে যে প্রতিভা দশের মধ্যে প্রতিপত্তির আসন করিয়া লইতেছে, ঘরের ভিতর সন্ধান লইয়া দেখ—অশ্রুর প্রবাহ বহাইতেছে তাহাই। মালঞ্চের মতো—যখন এক কূল গড়িয়া উঠিতেছে, নিশ্চিত জানিবে অপর কূলে ভয়াবহ ভাঙন লাগিয়াছে। চৌধুরি-বাড়ির অতিকায় থাম-থিলান, বড় বড় কক্ষ, জনবহুল সুবৃহৎ সংসারের ভিতর ক্ষীণদেহ শান্তমুখ একটি বধূ নিঃশব্দে ঘুরিয়া বেড়াইত, কারও ভাল করিয়া নজরেই পড়িত না—নরহরিরও না। সে যখন মরিয়া গেল, এতটুকু ফাঁক হইয়া যায় নাই কোন খানে—দু-দিনের মধ্যে সকলের মন হইতে সে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গেছে।

নরহরি আবার বলিলেন, তা ছাড়া চুলে পাক ধরে এসেছে যে বউঠান। স্বার্থ রয়েছে বলে সে দিকটায় একেবারে চোখ বুজে থাকবেন না।

সৌদামিনী বলিলেন, কিন্তু একলা আমি এত বড় সংসার কেমন করে আগলে বেড়াই বলুন?

শ্যামকান্তর বিয়ে দিয়ে দিন। বয়স কম—কিন্তু উপায় কি? আপনার নয়—প্রয়োজন আমারও। একটা কিছু না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি পাচ্ছি নে। দেবী-প্রতিষ্ঠা করে তারপর সংসারেও ছোট্ট মা'র প্রতিষ্ঠা করব, মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।

অবশেষে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল, নরহরির অনেকদিনের সাধ মিটিল। সমস্ত দিন নরহরি নির্জ্জলা উপবাস করিয়া আছেন। কাজকর্ম চুকিয়া গেছে, শ্রান্ত সকলে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

রাত্রির শেষ-যামে শিবনারায়ণের হাত ধরিয়া নরহরি মহাকালী বিগ্রহের সামনে দাঁড়াইলেন। উজ্জ্বল ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছিল।

গম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, বন্ধু, তোমায় আমায় নিত্যসম্বন্ধ—স্বীকার করবে কি না? মা সব দেখছেন, ওঁর সামনে বুকে হাত দিয়ে বল।

শিবনারায়ণ হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

সৌদামিনী একপাশে ছায়ার মতো বসিয়া তুলার সলিতা পাকাইয়া পাকাইয়া দীপের পাশে রাখিতেছিলেন। মালতী চোখ বুঁজিয়া মায়ের গায়ে ঠেশ দিয়া বসিয়াছিল। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া নরহরি সস্নেহে বলিলেন, কত কষ্ট হচ্ছে আমার মা-জননীর! শুতে দিই নি, বসিয়ে রেখেছি এমনি করে। শ্যাম-কান্তটাকেও ডাকতে পাঠিয়েছি, আজ একটা হেস্তনেস্ত হবে। শ্যামঠাকুর কেমন করে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান, না দেখে আমি কিছুতে ছাড়ছি নে।

শ্যামকান্তকে খবর দিয়ে পাঠান হইয়াছে, এখনো আসিতেছে না। শেষে সৌদামিনী নিজে চলিলেন তাকে আনিবার জন্য। চোখ মুছিতে মুছিতে শ্যামকান্ত আসিল। বিশেষ-কিছু সে বেচারি বুঝিতে পারে নাই, বাপের দিকে ক্যাল-ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। কোনরকমে কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় ছিলি রে?

ঘুমুচ্ছিলাম।

হুঁ, ঘুমোবার আর দিন পেলি না? বাড়িতে আজ এত উদ্যোগ-আয়োজন

এত লোকজন, খাওয়া-দাওয়া! নরহরি ভ্রূকুটি করিলেন। আমি এদিকে ছটফট করে মরছি—তা কোন দিকে কিছু তোমার খেয়াল নেই।

শিবনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার পাগল ভাইটি আজ ক্ষেপে গিয়েছে রে! আমাদের নিত্যসম্বন্ধ—সেইটের পাকা বন্দোবস্ত না করে ছাড়বে না। যা বলে সেই রকম করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়োগে, বাবা।

নরহরি হুঙ্কার দিয়ে উঠিলেন। শুধু মুখে বললেই শুনব নাকি? দেবীর পা ছুঁয়ে বল্। ঐ মা-লক্ষ্মীটিকে আমি তোর জেঠার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। মা যা হুকুম চালাবেন—বল্, ঘাড় হেঁট করে সারাজীবন তাই মেনে চলবি—

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শিবনারায়ণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেমন বন্ধু, শ্যামঠাকুর তোমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম। এবার কেমন বাঁধনে বেঁধে ফেললাম, বল!

শ্যামকান্ত ঘুমে আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কি-ই বা বয়স! বাবা যা বলেন, তাড়াতাড়ি কোন রকমে আবৃত্তি করিয়া সে পলাইয়া বাঁচিল।

নরহরি বাকি রাতটুকু মনের আনন্দে মন্দিরের চাতালে শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া কাটাইয়া দিলেন।

(১০)

আরও মাসকয়েক কাটিল। প্রতি অমাবস্যায় মহাকালীর পূজা হয়। শ্যামঠাকুরের মন্দির তৈয়ারির প্রসঙ্গ আপাতত চাপা পড়িয়া গিয়াছে। নরহরি মন-রাখা কথা মাত্র বলিয়াছিলেন, শিবনারায়ণ তাহা জানেন। ইহা লইয়া তাই উচ্চবাচ্য করেন না।

নরহরি লক্ষ্য করিয়াছেন, দেবীর পূজার সময় শিবনারায়ণ উপস্থিত থাকেন না। খুঁজিয়া-পাতিয়া যদিই বা ডাকিয়া আনেন, বলির সময় তিনি চোখ বোজেন, দু-হাতে কান চাপিয়া ধরেন।

নরহরি বলেন, ছি—ছি!

শিবনারায়ণ বলেন, কি করব ভাই, ঢাকের বাজনা সহ্য করতে পারি না—মাথার ভিতর কেমন করে ওঠে।

নরহরি ব্যথিত কণ্ঠে বলেন, শ্যামের বাঁশী তোমার মাথা খেয়ে দিয়েছে।

এক রাত্রে পূজার সময় সমস্ত বাড়ি পাতি-পাতি করিয়া খোঁজা হইল। শিবনারায়ণ নাই। অনেক কথা নরহরির কানে আসিয়াছে। তিনি আর অঞ্জলির মন্ত্র পড়িয়া উঠিতে পারেন না, চোখে জল আসিবার মতো হয়, গলা আটকাইয়া যায়। পূজা-শেষে তখনো অল্প রাত্রি আছে। কাহাকেও কিছু বলিলেন না, নিঃশব্দে তিনি চিতলমারির খালের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। হাঁ—মৃদঙ্গের আওয়াজ আসিতেছে বটে! কিছুদিন ধরিয়া যাহা শুনিতেছেন, তাহাতে আজ নিঃসন্দেহ হইলেন।

জলের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া কেওড়া-ডালের সঙ্গে খেয়া-নৌকা বাঁধা আছে। তাহাতে চড়িয়া বৈঠার অভাবে দু-হাতে জল কাটিয়া অনেক কষ্টে বরণডাঙার পারে নামিলেন। হনহন করিয়া মাধবদাস বাবাজির আখড়ার দিকে চলিলেন।

গিয়া দেখিলেন—এতখানি তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। অঙ্গনে সংকীর্তন হইতেছে—শ্যাম-রাধিকার নৌকাবিলাস। শিবনারায়ণের চোখে দরদর ধারা, সম্বিৎ নাই, আকুল হইয়া গায়ককেই এক-একবার আলিঙ্গন করিতেছেন। নরহরির চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বজ্রকণ্ঠে ডাকিলেন, বন্ধু!

সে ডাক শিবনারায়ণের কানে গেল না। মাধবদাস বাবাজি তাকাইলেন। তটস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি তিনি অভ্যর্থনা করিলেন, বসতে আজ্ঞা হোক চৌধুরি মশায়—

না।

সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তখনই অন্ধকার পথে নরহরি ফিরিলেন।

পরদিন সমস্তটা দিন কাটিয়া গেল, দুই বন্ধুতে কথাবার্তা নাই। দেখা হইলে নরহরি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান। বিকালবেলা কাঁধে চাদর ফেলিয়া শিবনারায়ণ বাহির হইয়া গেলেন। নরহরি চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

আগে সঙ্কোচ যদিই বা কিছু ছিল, ক্রমশ তাহা দূর হইয়া গেল। এখন শিবনারায়ণ শুধু রাত্রিটা নয়—সকালে অনেক বেলা অবধি আখড়ায় পড়িয়া থাকেন। প্রজাপাটক দেখা পায় না, কাছারি-বাড়িতে ক্রমশ তিনি দুর্লভ হইয়া উঠিতেছেন।

এক সন্ধ্যায় রওনা হইতেছেন, দেখিলেন বাহির হইতে দরজা বন্ধ। সবিস্ময়ে শিবনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন, কে আছ ?

দশ-পনের জন ঢালি জানলার কাছে মাথা নিচু করিয়া আসিল। ঢাল-সড়কি হাতে বাহিরে বসিয়া তারা পাহারা দিতেছে। শিবনারায়ণ খুব হাসিতে লাগিলেন, যেন কত বড় একটা মজার ব্যাপার! বলিলেন, আমাকে তোমরা কয়েদ করে রাখলে নাকি ?

রঘুনাথ জিভ কাটিয়া সরিয়া গেল; চিন্তামণি উদ্দেশে বাহির হইতে গড় হইয়া প্রণাম করিল; বলিল, আমরা কিছু জানি নে কর্তা। চৌধুরি মশায় বলে দিলেন এখানে বসে থাকতে, তাই—

শিবনারায়ণ তেমনি হাসিতে লাগিলেন। মধুর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, চৌধুরি মশায় তো তোমাদের একলা মনিব নন, ওস্তাদ।

চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিল, খুলব দরজা ?

শিবনারায়ণ গম্ভীর হইলেন। মুহূর্তকাল ভাবিয়া বলিলেন, না—সে হয় না। হুকুম আমাদের মধ্যে যে দেবে, রদ করতে পারে সে-ই। নরহরির হুকুম আমি ভাঙতে বলি কি করে ? তোমরা সব বসে থাক, যেমন আছ।

রাত্রি নিষুপ্ত হইল। খালকে জোয়ার আসিয়াছে, তার মৃদু কল্লোল শোনা যাইতেছে। উহার চেয়েও মৃদুতর হইয়া বাতাসের সঙ্গে এক-একবার বরণডাঙার পার হইতে মৃদঙ্গ ও রামশিঙার আওয়াজ আসিতেছে। উজান বাহিয়া-যাওয়া যমুনার তটভূমিতে কেলিকদম্বের তলে শ্যামসুন্দর বুঝি নিশিরাত্রে বাঁশী বাজাইতেছেন। দরজা বন্ধ—সেখানে ছুটিয়া যাইবার উপায় নাই। শিবনারায়ণ বৃথাই বড় বড় পেরেক-আঁটা জানালায় হাত চাপড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সকালবেলা শিবনারায়ণ নরহরিকে আর পাশ কাটাইতে দিলেন না। বলিলেন, নরহরি ভাই, পাঁচখানা চকের সমস্ত প্রজা শাসিত হয়ে গেছে—এবার কি আমার পালা ?

গম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, না, মাধবদাসের।

শিবনারায়ণ শিহরিয়া তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িলেন।

না—না, স্বপ্নেও অমন কল্পনা কোরো না। মহাপুরুষ!

নরহরির গর্বদৃপ্ত মুখে এক মুহূর্তে কাতর অসহায় ছবি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, মহাপুরুষ বই কি! জোলো-ডাকাত—ঘরদোর সাজিয়ে দশজনের একজন হতে যাচ্ছি, মহাপুরুষ আমার সোনার ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছেন, আমার সাধ-বাসনা ডুবিয়ে দিচ্ছেন—

ইদানীং নরহরির মনের জোর যেন কমিয়া যাইতেছে। যৌবন গিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছেন, সেই কথা প্রায়ই মনে আসে। গলা ধরিয়া আসিল। চোখে পাছে জল আসিয়া যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

সে রাত্রিতেও শিবনারায়ণ তেমনি দোতলার ঘরে জানালার গরাদে ধরিয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিলেন। নিশীথে চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেলে তিনি কান পাতিয়া রহিলেন। কিন্তু মৃদঙ্গের আওয়াজ আসে না। কতক্ষণ তিনি জানালা ধরিয়া রহিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন, ওপারের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাত্রির গাঢ় অন্ধকার বিমথিত করিয়া আগুনের শিখা লকলক করিয়া তুলিতেছে। লোহার গরাদে আর তাঁকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, উন্মাদের মতো দরজায় লাথি মারিয়া ঘর ফাটাইয়া তিনি বারম্বার চিৎকার করিতে লাগিলেন, কে আছ—দুয়োর খোল। খোল—খোল—খুলে দাও শিগগির। নইলে ভেঙে ফেললাম।

খট করিয়া শিকল খুলিয়া গেল। কবাট খুলিয়া দিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া—আর কেহ নয়, স্বয়ং নরহরি। শিবনারায়ণের তিনি হাত ধরিয়া ফেলিলেন। হাত ছাড়াইয়া শুধু একটা কঠোর দৃষ্টি হানিয়া শিবনারায়ণ দ্রুত পায়ে নামিয়া গেলেন।

ভাব দেখিয়া নরহরির আতঙ্কের সীমা রহিল না। তিনি পিছু-পিছু ছুটিলেন। কোথায় যাও?

শিবনারায়ণ অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছেন। বারম্বার নরহরি ডাকিতে লাগিলেন, ফেরো বন্ধু, যেও না—

ঘাটে যে নৌকা সামনে পাইলেন, শিবনারায়ণ উঠিয়া বসিলেন। নজর শুধু ওপারের অগ্নিশিখার দিকে। কেমন করিয়া খাল পার হইলেন, কেমন করিয়া মাঠ ভাঙিয়া ছুটিয়া আখড়ায় পৌছিলেন, বলিতে পারেন না। গিয়া দেখিলেন, মাধবদাস বাবাজি অভিভূতের মতো দাঁড়াইয়া ধ্বংসলীলা দেখিতেছেন। আগুন লক্ষ নাগিনীর মতো ফুঁসিয়া বেড়াইতেছে। মাধবীকুঞ্জ গিয়াছে, মণ্ডপের চিহ্নমাত্র নাই, মন্দিরের খোড়ো-চাল চাঁচের বেড়া দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তারই আলোয় অনতিস্ফুট দেখা যায়, অলঙ্কার ও পট্টবাস-সজ্জিত হাস্যোদ্ভাসিত-শ্রীমুখ শ্যামসুন্দর-রাধারাণীর যুগল বিগ্রহ। হুড়মুড় করিয়া আড়া ভাঙিয়া পড়িল, বিগ্রহের কাপড়-চোপড় জ্বলিয়া উঠিল। মাধবদাস বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, পুড়ে মরল, ঐ কাঁদছে ওরা—কাঁদছে, কাঁদছে—তোমরা এসো, বাঁচাও—

লেলিহান আগুনের মধ্যে অশীতিপর বাবাজি ঝাঁপ দিলেন, শিবনারায়ণ ঝাঁপ দিলেন, আরও অনেকে দিল। শ্যামঠাকুরের বিগ্রহ কোলে লইয়া শিবনারায়ণ দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মন্দিরের চাল ভাঙিয়া-চুরিয়া করাল অগ্নিগর্তে গড়াইয়া পড়িল। শিবনারায়ণ এক লাফে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইতে পারিলেন না ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। অগ্নিদগ্ধ সর্বাঙ্গে বিষম জ্বালা করিতেছে, এতক্ষণে শিবনারায়ণের অনুভব হইল।

কলসি কলসি জল ঢালিয়া অনেক কষ্টে আগুন নেভানো হইল। তখন সকাল হইয়া গেছে। ছাই ঠেলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে পাওয়া গেল দগ্ধাবশেষ মাধবদাসের গলিত মাংসপিণ্ড। রাধারাণীর প্রতিমা শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে। বাবাজি মরিয়া গিয়াও তার একটি টুকরা ফেলেন নাই, প্রাণপণে আঁকড়াইয়া আছেন।

সেদিন শিবনারায়ণ আর শ্যামগঞ্জে ফিরিলেন না। পর দিন না, তার পরের

ছিলও না। নক্ষত্র-খচিত আকাশের নিচে অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে পাশাপাশি শুইয়া রাত কাটাইলেন।

ক্রমে নরহরির রাগ পড়িয়া আসিল। তিনি লোক পাঠাইলেন, লোক ফিরিয়া গেল। তারপর নিজে চলিয়া আসিলেন। ছলছল চোখে কাতর হইয়া ডাকিলেন, বন্ধু, বাড়ি এসো—

চলো—

খাল পার হইয়া নরহরির পিছু-পিছু শিবনারায়ণ নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকিলেন। দু'টা দিন কাটিয়াছে, ইহারই মধ্যে আগেকার সে শিবনারায়ণ নাই—অনেক দূরের লোক হইয়া গিয়াছেন। বাপের দশা দেখিয়া মালতী অবধি ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নরহরিও যেন তাঁর মুখের দিকে চাহিবার ভরসা পান না।

শিবনারায়ণ বলিলেন, নরহরি ভাই, আমার শ্যামঠাকুর গৃহহীন। রাধারাণী ভয় পেয়ে বাবাজির সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। লোকে বলে, তোমার কাজ।

নরহরি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। মুহূর্ত পরে বলিলেন, মহাকালীর অভিসম্পাত, বন্ধু। রক্তজবা পেলে মা খুশী হন, তোমার ঐ বোষ্টমেরা ঠাট্টা করে সেই জবার নাম দিয়েছে ওড়ফুল। আর মাকে ওরা কি বলে শুনেছ তো?

চোখাচোখি হইল। ইষ্টদেবীর অপমানের কথা উল্লেখ করিতে নরহরির মুখে-চোখে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। বলিতে লাগিলেন, ঘৃণায় ওরা মায়ের নামটাও উচ্চারণ করে না। মহাকালীর নাম দিয়েছে মহাভূবা—

শিবনারায়ণ বলিলেন, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ কেন? নিজের ঘর পুড়িয়ে আর একদিন বেরিয়ে এসেছিলে। ঘর পোড়ান তোমার স্বভাব।

তারপর দৃঢ় অথচ উত্তেজনাবিহীন কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, রাধারাণীর আমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব, আর শ্যামঠাকুরের মঠ-বাড়ি তৈরি করে দেব ঠিক ঐ রকম—

মহাকালীর বিশাল মন্দিরের দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া শিবনারায়ণ চুপ করিলেন।

মায়ের মন্দিরের মতো হবে স্যাড়ানেড়ির মঠ ?

অসহ্য উত্তেজনায় নরহরির মুখে কথা ফোটে না। ক্ষণপরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আর তুমি বোধ হয় কণ্ঠি পরে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে 'জয় রাধেকৃষ্ণ' বলে বেরিয়ে পড়বে! এই স্থির করেছ, বন্ধু ?

দুই অঞ্চলের দু'টি মানুষ এক রাত্রে মালঞ্চের উপর কোলাকুলি করিয়াছিলেন। তারপর শ্যামগঞ্জের প্রাচীন পাষাণ-অলিন্দে পাশাপাশি তাঁদের কত দিন-রাত্রি কাটিয়াছে! চক বন্দোবস্তের সময়, চক হাসিলের মুখে, মাঠে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে নরহরি কত সাধ-বাসনার গল্প করিয়াছেন শিবনারায়ণের সঙ্গে, দু'টি আত্মার নিত্যসম্বন্ধের গর্ব করিয়াছেন। মাধবদাসের আখড়া পুড়িবার মাস ছয়-সাতের মধ্যে সব-কিছুরই মীমাংসা হইয়া গেল। পাঁচখানা চকের মধ্যে দু'খানা আর নগদ কিছু অর্থ শিবনারায়ণের ভাগে পড়িল। তাই লইয়া একদিন খুব সকালে তিনি চিত্তলমারি খাল-ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরবর্তী কালে শিবনারায়ণের পৌত্র দেবনারায়ণ তার বন্ধুবান্ধব মহলে এই ঘটনা লইয়া অনেক হাসাহাসি করিয়াছে। কালী ভজিব কি কৃষ্ণ ভজিব—এই লইয়া মানুষ মারাত্মক বিরোধ করিয়াছে, পাথরের দেবতারা এমন জীবন্ত ছিলেন সেই সাবেক আমলে!

শিবনারায়ণ খেয়াঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নরহরি পিছন হইতে ডাক দিলেন, আর তোমার মেয়ে মালতী যে ঘুমুচ্ছে—তাকে ডেকে তুললে না ?

শিবনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, তুমি তাকে চেয়ে নিয়েছ, তোমার কাছেই থাকুক। আমার ঘর-বাড়ি নেই, চৌধুরি-বাড়ির বউকে কোথায় নিয়ে তুলব ? শ্যামকান্তর বিয়ের দিন নেমন্তন্ন কোরো—এই একটা কেবল অনুরোধ রইল হরি-ভাই।

কালীর কিঙ্কর নরহরি চৌধুরি! সহসা কি বুঝি চোখে আসিয়া পড়িল, কোঁচার খুঁট খুঁজিয়া নরহরি চোখ মুছিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, স্যাড়ানেড়ির মেয়ে চৌধুরি-বাড়ির বউ হবে—ক্ষেপেছ তুমি ?

খেয়াল ছিল না, শিবনারায়ণ একা নন—সঙ্গে সৌদামিনী আর কীর্তিনারায়ণ। ভাঁটা সরিয়া গিয়া তখন বালুচরের অনেকখানি অনাবৃত হইয়া গিয়াছে—খেয়াল হয় নাই, সেই বালুচর ভাঙিয়া পিছন দিকটায় সন্ত-নিদ্রোখিত মালতী ও শ্যামকান্ত চলিয়া আসিয়াছে। ফিসফিস করিয়া মালতী কি বলিতেছিল শ্যামকান্তকে। নরহরি গলা খাটো করিয়া আস্তে বলেন না তো কোন কথা—

হ্যাড়ানেড়ির মেয়ে হবে চৌধুরি-বাড়ির বউ ?

মালতী মুখ ঘুরাইয়া শ্যামকান্তকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে অকস্মাৎ ঘোমটা খসিয়া পড়িল সৌদামিনীর। মুখের উপর যেন আগুন জ্বলিতেছে। নিজের ঘরে আগুন ধরাইয়া যে রকম অগ্নিশিখা নরহরি একদিন মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন, খালের এপারে দাঁড়াইয়া মাধবদাস বাবাজির আখড়া পুড়িবার সময় যে রকম আলো দেখিয়াছিলেন।

দৃঢ় পায়ে আগাইয়া আসিলেন সৌদামিনী ; মালতীর হাত ধরিয়া তাকে নৌকার উপর তুলিলেন। খেয়ানৌকা ধীরে ধীরে খালের উপর দিয়া তাঁহাদিগকে বরণডাঙার পারে তুলিয়া দিল।

বুড়া চিন্তামণি কোথায় যেন গিয়াছিল আগের দিন। সে এসব কিছুই জানে না। দিন তিনেক পরে শ্যামগঞ্জে ফিরিয়া সেখান হইতে ধূলি-পায়ে একেবারে বরণডাঙায় চলিয়া আসিল।

শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি ওস্তাদ ?

ফাঁকি দিয়ে এলে ছাড়ছি না হুজুর। এখনো অনেক বাকি—

লাঠি আর শেখাব না ; সবাইকে ভুলে যেতে বলি। যা জানো সে-সমস্ত ভুলে যাবে কিন্তু আমার এখানে এসে থাকলে।

অনেক বারই একথা হইয়াছে, কিন্তু চিন্তামণি একবর্ণ বিশ্বাস করে না। ধনীন লোক সহজে কিছু দিতে চায় না, ইহা সে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছে। অনেক মিথ্যাভাষণ শুনিতে হয়, লাঞ্ছনা সহিতে হয় খাঁটি-বস্তু কিছু আদায় করিতে গেলে। চিন্তামণি বলিল, একলব্য আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন।

আপনার যদি ইচ্ছে হয়—গোটা হাতখানা কেটেই আমি না হয় দক্ষিণা দেব। লাঠি তো হাত আমাদের—লাঠি ছেড়ে দেওয়া মানে ডান-হাত কেটে ফেলে দেওয়া। হুকুম করেন তো তা-ও করব।

ষাট বছরের বুড়ো ওস্তাদ নূতন পাঠ লইবার জন্য শিবনারায়ণকে গুরুমান্য দিয়া ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। এত কাল সাগরেদি করিয়া কি পাইয়াছে, সে-ই বলিতে পারে। কিন্তু ভরসা তিলমাত্র শিথিল হয় নাই। অমূল্য বিদ্যার ভাণ্ডারী শিবনারায়ণ সদয় একদিন হইবেনই, দেশ-বিদেশে কেউ যাহা জানে না—লাঠির সেই কৌশল তিনি শিখাইয়া দিবেন, চিন্তামণি ধন্য হইয়া যাইবে।

(১১)

পরবর্তী বছর কয়েকের ভিতর পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া শ্যামগঞ্জ-বরণডাঙার দুই পরিবারের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া গেল।

হঠাৎ একদিন নরহরি খবর পাইলেন, শিবনারায়ণ মারা গিয়াছেন। শ্যাম-ঠাকুরের বিগ্রহ উদ্ধার করিতে গিয়া অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিলেন, সর্বাঙ্গ জুড়িয়া ঘা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষাশেষি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রবল জ্বরে অবিরাম আর্তনাদ করিতেন,—এত কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন যে অতি-বড়-শত্রুর জন্যও মানুষ যেন সে কামনা না করে। প্রলাপের ঘোরে মালতীর বিয়ের কথা তুলিতেন, কাহাকে যেন সান্ত্বনা দিতেন—দুঃখ কোরো না, জোলো-ডাকাতের ঘরে না গিয়ে রাজঘরণী হবে ও-মেয়ে, আলো জেলে বাজনা বাজিয়ে চতুর্দোলায় চড়ে রাজার ছেলে আসবে। কখনো কখনো নূতন মঠ গড়িবার কথা বলিতেন, বলিতে বলিতে মুমূর্ষুর চোখের সামনে যেন নবসমাপ্ত অপরূপ এক মঠবাড়ির ছবি ভাসিয়া উঠিত। গৃহহারা শ্যামঠাকুর নূতন বেদিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, বিচূর্ণিত রাধারাণীর বিগ্রহ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া পাশে সমাসীন। মুখ উদ্ভাসিত

হইত, চোখের তারা জলজল করিত, সকল রোগযন্ত্রণা শিবনারায়ণ যেন এক মুহূর্তে বিস্মৃত হইয়া বিপুল আনন্দে মাতিয়া উঠিতেন।

এ সমস্ত নরহরির লোক-মুখে শোনা। শিবনারায়ণ সেই যে চলিয়া গিয়াছিলেন, আর দেখা হয় নাই। অসুখ ইতিমধ্যে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এত কষ্ট পাইয়া গেছেন—কিন্তু ঘোষ-গিন্নির এমন পরিপাটি বন্দোবস্ত যে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাকপক্ষীর মুখেও এতটুকু খবর শ্যামগঞ্জের এ-পারে পৌছে নাই। মৃত্যুর পরেও নয়। মালঞ্চের কূলে চিতায় যখন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, সেই সময় নরহরি কাহার মুখে যেন কথাটি শুনিলেন—ঘোষ-গিন্নি খবর দেন নাই। এমন সময়ে খবর পাইলেন যে একবার চোখের দেখা দেখিবারও উপায় নাই। বৈষ্ণবের স্ত্রী হইয়াও ঘোষ-গিন্নির চালচলন কঠিনতম শাক্তের মতো। নরহরিও কান পাতিয়া খবরটা লইলেন মাত্র, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দুটো অতিরিক্ত কথা জানিয়া লইবার আর তাঁর প্রবৃত্তি হইল না।

আবার একদিন নৌকাপথে যাইতে নজর পড়িল, মালঞ্চের কিনারায় বালুচরের উপর যেখানে মাধবদাস বাবাজির সমাধি, তারই চারিপাশে নানা আয়তনের অসংখ্য ঘর উঠিয়াছে। নরহরির চালিশাড়ার ঠিক উল্টা পারে। চিন্তামণি ইতিমধ্যে ছোটখাটো একটি দল জুটাইয়াছে, তাদের বসতি হইবে নাকি এই জায়গায়। কেন্দ্র-স্থলে নূতন মঠবাড়ি হইবে, শ্যামঠাকুর আর রাধারাণীর প্রতিষ্ঠা হইবে। শিবনারায়ণ মনের যে সাধ পূরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, সাধ্বী স্ত্রী তাহা সমাধা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ভাল কথা—কিন্তু আখড়া আগে যে জায়গায় ছিল, সেইখানে হওয়াই তো স্বাভাবিক—এত দূরে নদীর ধারে সরিয়া নূতন করিয়া পত্তন করিবার অর্থ কি? এক হইতে পারে, চিন্তামণি দলবল লইয়া পাহারা দিবে—বাহির হইতে আসিয়া পড়িয়া কেহ যাহাতে আর কখনো অনিষ্ট করিতে না পারে। সৌদামিনী লাঠির জোরে ঠাকুর ও ভক্তদের ঠেকাইবেন—এইখানে তাঁর তফাৎ দেখা যাইতেছে শিবনারায়ণের সঙ্গে।

আর একটা সন্দেহ নরহরির মনে উঠিল। ঐখানে সমারোহে সঙ্কীর্তন

চালাইয়া তাঁকে জ্বালাতন করিবার মতলব নাই তো? সঙ্কীর্তন ভাল রকম তোড়জোড় করিয়া শুরু করিলে নরহরির এবার বাড়ি বসিয়াই কানে আসিবে, আন্দাজ হইতেছে। শুনিতে শুনিতে তিনি হয়তো একদিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন, ঢালিরা হয়তো খাল ঝাঁপাইয়া ঢাল-সড়কি লইয়া পড়িবে তাঁর ইঙ্গিত পাইয়া। ঘোষ-গিন্নি সত্য সত্যই একটা হাঙ্গামা বাধাইতে চান নাকি? নরহরি চান না। শিবনারায়ণ নাই, কীর্তিনারায়ণ নাবালক, আর সৌদামিনী যতই দেমাক করিয়া বেড়ান—অবলা নারী ছাড়া কিছু নন। উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বরণডাঙ্গায় কে আছে?

এপারে চিতলমারি ও মালঞ্চের মোহানায় নরহরির ঢালিপাড়া ইতিমধ্যে জাঁকিয়া উঠিয়াছে। শিবনারায়ণ নাই, বাধা দিবার আর কেহ নাই। এই দিক দিয়া নিরঙ্কুশ হইয়া নরহরি অনেকখানি সোয়াস্তি পাইয়াছেন। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি ঢালিপাড়ায় থাকেন। মালঞ্চের উপর—বয়স হইয়াছে বলিয়া এবার নিজে তত বেশি নন—তাঁর ঢালির দল আবার ঘোরাফেরা শুরু করিয়াছে। শিবনারায়ণের খাতিরে এ পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভিতরের আগুন নেভে নাই—আগ্নেয়গিরির মতো প্রচ্ছন্ন ছিল, বাধা-বিমুক্ত হইয়া আবার ভয়ঙ্কর হইয়াছে। এ-অঞ্চলে তাঁকে কেহ আর এখন নরহরি চৌধুরি বলে না, নূতন নামকরণ হইয়াছে বাঘাহরি, সংক্ষেপে বাঘা চৌধুরি।

চৌধুরির ঢালা হুকুম, ঢালিপাড়ায় সম্বৎসরে যত ধান লাগে সমস্ত আসিবে তাঁর সদরবাড়ির গোলা হইতে। আট-দশখানা সাঙড়-বোঝাই ধান আসিয়া খালের মুখে লাগে। দিন পাঁচ-সাত ধরিয়া ধীরে সুস্থে ধামা ভরতি ধান নামানো চলিতে থাকে। ওপারে চিন্তামণির দলবল লুব্ধ চোখে তাই তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। কোনরূপ গোপন কথাবার্তা রঘুনাথের সঙ্গে হইয়াছে কিনা বলা যায় না—ক্রমশ দেখা গেল, একজন দু-জন করিয়া খাল পার হইয়া এপারে ঘর বাঁধিতেছে। খবর শুনিয়া নরহরির উৎসাহ আরও বাড়িল। আগে ধানের নৌকা আসিত বছরে একবার, এখন যখন-তখন আসিয়া ভিড়িয়া থাকে। ওপার শূন্য হইয়া এপারে ঘরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; তিন-চার শ ঘর হইয়া

দাড়াইল। নরহরি নিজে আসিয়া কোথায় কোন্ নূতন ঘর বাঁধা হইবে তদারক করিয়া যান। অনেকেই আসিল, আসিল না সেই একটা লোক—বুড়া ওস্তাদ চিন্তামণি। আর আসিল না, নিতান্তই যাদের চিন্তামণিকে ছাড়িয়া আসার উপায় নাই।

মেয়েদের কাজ, ধান ভানিয়া কুটিয়া সিদ্ধ করা। আর ভীমরুলের ডিমের মতো বাধা চৌধুরির সেই মোটা মোটা রাঙা ভাত খাইয়া জোয়ানগুলার বুকের মধ্যে টগবগ করিয়া রক্ত ফোটে, গাঙের ধারে ধারে তারা হাল্লা করিয়া পায়তারা কষিয়া বেড়ায়, চরের উপর বিশ-পঞ্চাশ জনে কুস্তি লড়ে, ঢাল-সড়কির খেলা করে, হাতের তাক কেমন হইল তাই পরীক্ষা করে কখনো বাদার বুনো-হাঁস কখনো বা বোঝাই নৌকার উপর। লকগেট-ওয়ালা নূতন এক খাল হইবে, তার জন্য জমি জরিপ হইয়া গিয়াছে। খাল কাটা হইয়া গেলে খুব সুবিধা হইবে, কিন্তু আপাতত মালঞ্চ ছাড়া ব্যাপারি-নৌকার আর যাইবার পথ নাই। ...দিব্য দাঁড় ফেলিয়া সারি গাহিতে গাহিতে নৌকা চলিয়াছে, হঠাৎ বোঁও—বোঁও—শব্দে মাঝিমাল্লার উপর পোড়া-মাটির গুলি-বৃষ্টি, আর সঙ্গে সঙ্গে মোহানার দিক দিয়া বিকট অট্টহাসি। অচৈতন্য দেহ গলুই হইতে জলে পড়িয়া টানের মুখে পাক খাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, অমনি চরের উপর হইতে দশ-বিশ জন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া খালে খালে নৌকা লইয়া কোথায় যে উড়িয়া চলে, সে নৌকার আর কোন সন্ধান হয় না।

শিবনারায়ণ বলিতেন, দিনকাল বদলাইয়াছে। কিন্তু নরহরি বিগত দিনের মুখে রশি পরাইয়া টানিয়া হিঁচড়াইয়া ফিরাইয়া আনিবেনই। শ্যামশরণের আমল আবার আসিবে।

ইহারই মধ্যে ঢোলের বাজনা শুনিয়া নরহরি খবর লইলেন, মালতীর বিয়ে। সৌদামিনী যেন মন্ত্রবলে সমস্ত করিয়া যাইতেছেন—অন্তঃপুরিকা নারীর পক্ষে কি করিয়া ইহা সম্ভব হয়, নরহরি ভাবিয়া পান না। এক বিপুল-শক্তি দৈত্য যেন তাঁর আজ্ঞাবহ, মুখের কথা মুখে থাকিতেই ঈপ্সিত বস্তু জুটাইয়া আনিয়া

দেয়। দৈত্যটি চিন্তামণি—বুড়া বয়সে সে নব-যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছে নাকি? ঐ ক'বছরের মধ্যে শিবনারায়ণের কাছ থেকে কি পাইয়াছে—যে জন্য তার কৃতজ্ঞতার অবধি নাই?

সৌদামিনীর সম্বন্ধেও আশ্চর্য খবর আসে। শ্যামগঞ্জে থাকিতে তিনি ঘরের কাজকর্ম লইয়া থাকিতেন, অন্দরবাড়ি হইতে তাঁকে একাদনের জন্য কেউ বাহির হইতে দেখে নাই। এখন নাকি বরণডাঙার নূতন কাছারি-ঘরের একদিকে চিক টাঙানো হইয়াছে, সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া প্রতিদিন সেইখানে আসিয়া বসেন। যে দু-খানা চক বরণডাঙার ভাগে পড়িয়াছে, তার প্রত্যেকটি জমার পাই-পয়সার হিসাব পর্যন্ত তাঁর নখাগ্রে। সম্পত্তি-ঘটিত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ তাঁকে নিজে করিতে হয়। তা ছাড়া করিবেই বা আর কে? এই সব সমাধা করিয়া তারপর আবার স্নান করিয়া আসিয়া নিজের হবিষ্যান্ন চাপান। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে এক একদিন একেবারে বেলা পড়িয়া যায়।

মালতী এমন কি অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে যে শিবনারায়ণের বার্ষিক শ্রাদ্ধ চুকিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাত্র জুটাইয়া আনা হইল? নরহরির উপর আক্রোশে নিশ্চয়ই। কিন্তু নরহরি কি জানিতেন, মাধবদাসের জলন্ত আখড়ার মধ্যে শিবনারায়ণ ঢুকিয়া পড়িবেন? শিবনারায়ণের মৃত্যুর কারণ তাঁর নিজেরই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতা। অথচ সৌদামিনী ঠাকরুন নরহরিকে এত বড় শত্রু ঠাওরাইয়াছেন যে মেয়ের বিয়ের লৌকিক নিমন্ত্রণটা পর্যন্ত করিলেন না। করিলেও যাইতেন না অবশ্য—তাঁকে অপমান করার জন্যই তাড়াতাড়ি এই অনুষ্ঠান, ইহার মধ্যে হাস্যাস্পদ হইতে কেন যাইবেন? যারা জানে, চোখ ঠারিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিবে—আর আজকাল তো নরহরির মন-মেজাজের ঠিক নাই, রাগের বশে শুভ ক্রিয়াকর্মের মধ্যে হঠাৎ কোন বিপর্যয় ঘটাইয়া বসা নয় তাঁর পক্ষে। ঘোষ-গিন্নি নিমন্ত্রণ করেন নাই—চমৎকার করিয়াছেন, অতি উত্তম কাজই করিয়াছেন—নরহরিকে আর চক্ষুলজ্জার দায়ে ঠেকিতে হইল না।

মালঞ্চ বাহিয়া বরণডাঙার ঘাটে খানচারেক নৌকা লাগিল—বর ও বরযাত্রীরা আসিয়াছেন। সকাল সকাল আসিয়া পড়িয়াছেন—সন্ধ্যা না হ

পর্যন্ত নৌকায় বসিয়া থাকিবেন, নামিবেন না। সন্ধ্যার পর ঘন ঘন গেঁটে-বন্দুক ফুটিতে লাগিল, বারোটা ঢোল-কাঁসির সমবেত বাজনা, চরকিবাজি হাউইবাজি আর পম্বীর আলোয় চারিদিক মাত করিয়া তুলিল। বরণডাঙার ঘোষ-বাড়ি ঘাট হইতে রশিটাক মাত্র, তবু পালকির ব্যবস্থা হইয়াছে বর ও বিশিষ্ট বরযাত্রীদের জন্য। এইটুকু পথ এক দণ্ডে ফুরাইয়া যায়, সে জন্য মালঞ্চ আর চিত্তলমারির কূলে কূলে ক্রোশ দুই পথ ঘুরিয়া প্রহরখানেক রাত্রে মিছিল বিয়ে-বাড়ি পৌঁছিল।

সমস্ত ঢালিপাড়া খাল-ধারে ভাঙিয়া আসিয়াছে; দু-চোখ মেলিয়া ওপারের বাজি-বাজনা দেখিতেছে। মিছিল চলিয়া গিয়াছে, তখনও তারা দাঁড়াইয়া আছে। নরহরি পিছন দিক হইতে আসিয়া রঘুনাথের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুনাথ চমকিয়া ফিরিতে তিনি বলিলেন, এপারে আমরাও করব সর্দার, ওর বিশগুণ করতে হবে—তুমি সেই যোগাড়ে লেগে যাও।

রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, সম্বন্ধ ঠিকঠাক হয়ে গেল নাকি চৌধুরি মশায়?

হয় নি। কিন্তু আর বাছাবাছি করব না—কাল তোমাকে কসবায় যেতে হবে। শশিশেখর উকিলের নামে চিঠি দিয়ে দেব, ওরা এসে পাকাদেখা দেখে যাক।

কন্যাপক্ষ-বরপক্ষ সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল—চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস হইতে চায় না—নরহরি চৌধুরি। গলবস্ত্রে সাধ্য-সাধনা করিয়া যাঁকে পাওয়া যায় না, উপযাচক হইয়া তিনি বরণডাঙায় চলিয়া আসিয়াছেন।

কীর্তিনারায়ণ আসিয়া আহ্বান করিল, ঘরে এসে বসুন।

নরহরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদ-মস্তক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। বলিলেন, মাথায় টিকি গলায় কণ্ঠি কই, বাবা? মানাচ্ছে না যে!

হঠাৎ তার ডান-হাত টানিয়া লইয়া আগেকার এক দিনের মতো টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। প্রশ্ন করিলেন, খুব খোল বাজাচ্ছ বুঝি মঠে? লাঠি ধরলে বাপকে ছাড়িয়ে উঠতে পারতে, তা শুধু খোল বাজিয়েই কচি হাতে কড়া পড়ে গেল।

নিশ্বাস ফেলিয়া নরহরি চুপ করিলেন। কীর্তিনারায়ণ হাত ছাড়াইয়া লইল। বাপের মৃত্যুর পর হইতে সে-ও এখন আর ভাল চোখে দেখিতে পারে না নরহরিকে।

কীর্তিনারায়ণ বলিল, ঘরে আসুন। মা ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি আসতে পারেন না তো, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরের ভিতর সৌদামিনী অপেক্ষা করিতেছিলেন; নরহরি গিয়া ম্লান হাসিয়া ছড়া কাটিলেন, সেধে এসে পাতলাম পাত—কোন্ বেহায়া না দেবে ভাত? বিনি-নেমন্তন্নে চলে এসেছি ঘোষ-গিন্নি, ভাত দেবেন না চিন্তামণিকে লেলিয়ে দেবেন বলুন? তবে বোষ্টম-লোঠেলের আর যাই থাক, হাতে লাঠি থাকবে না—এই ভরসায় একা একা চলে এসেছি।

চিন্তামণি তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া নরহরি কথা শেষ করিলেন। এতদিন তিনি বউঠান বলিয়া ডাকিতেন, আজ ঘোষ-গিন্নি বলিয়া সম্পর্কহীনতা প্রকট করিতে চান। সৌদামিনী ইহা যেন কানেই নিলেন না—সহজভাবে বলিলেন, অনুগ্রহ করে যখন এসেছেন, দেখে শুনে শুভকর্ম সমাধা করে দিয়ে যেতে হবে।

নরহরি তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, সোনার মেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছেন, আমি দেখব শুনব বলে কিছুই তো বাকি রেখে দেন নি।

সৌদামিনী কঠিন দৃষ্টিতে এক পলক তাকাইলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর তেমনি শান্ত ও স্বাভাবিক। বলিলেন, জামাই দেখেছেন আপনি?

দেখতে খারাপ বলি কি করে—রাঙা-মূলো। কিন্তু বয়সের যে গাছ-পাথর নেই! এ হচ্ছে ঘোষ-গিন্নি, শিবের হাতে গৌরী সমর্পণ করা।

সৌদামিনী বলিলেন, গৌরীর ভাগ্য—শিব আসছেন তার অদৃষ্টে।

তারপর গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সে যাই হোক—মেয়ে ঐ পাশের ঘরে কনে-পিঁড়িতে বসে। তার ভাবী স্বামীর সম্বন্ধে এসব আলোচনা এখানে হওয়া উচিত নয়। বাইরে গিয়ে আপনি অতিথিদের দেখাশুনা করুনগে চৌধুরি মশায়।

অর্থাৎ যতক্ষণ আছি, বাইরে বাইরেই থাকতে হবে?

মালতীর বাপ নেই, বাপের বন্ধু হিসাবে তা-ই তো উচিত। ভিতর সামলাতে হিমসিম হচ্ছি, আপনি ওদিককার ভার নিলে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

বলিয়া তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া সৌদামিনী চলিয়া গেলেন। হতভম্বের মতো মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নরহরি বাহির হইয়া গেলেন। অন্ধকারে খাল পার হইয়া চুপি-চুপি শ্যামগঞ্জে ফিরিলেন।

শ্যামগঞ্জেও বিয়ের বাজনা বাজিয়া উঠিল মাস দুয়েকের মধ্যে। বধূর নাম সরস্বতী—কসবার শশিশেখর মজুমদার উকিলের বোন। বিপুল সমারোহে বর-বউ শ্যামগঞ্জে ফিরিল। বরণডাঙার পারে কিন্তু একটা লোক দাঁড়াইয়া নাই। সন্ধ্যার পর বিশেষ করিয়া আজিকার দিনটায় ঘরে ঘরে মানুষ যেন ঝাঁপ আঁটিয়া বসিয়া আছে। ছেলের বিয়ে দিয়া বউ লইয়া বাড়ি ফিরিবার সময় নরহরির মন দুঃখে ভরিয়া গেল। এত আয়োজন ওপারের কেউ একটা বার তাকাইয়া দেখিল না। এই ব্যাপারেও যেন পরাজয় ঘটিল তাঁর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১)

বড় বর্ষা। মালঞ্চ উন্মত্ত ঢেউ ভাঙিতেছে। ঢেউ অবিশ্রান্ত আছড়াইয়া পড়িতেছে বউভাসির চকের নূতন বাঁধে। বাঁধ ঠেকাইয়া রাখা দায়। মাটি কাটিবার লোক ডাকিতে মালাধর গোমস্তা পাইক পাঠাইল। পাইকটি নূতন—অতশত খবর রাখে না। হাঁকাহাঁকি করিয়া একেবারে নরহরির ঢালিপাড়ায় গিয়া উঠিল।

মাটি কাটতে পারিস ?

জবাব পাওয়া গেল—গলা কাটতে পারি। এবং প্রমাণস্বরূপ একজন আসিয়া সত্যসত্যই পাইকের গলা চাপিয়া ধরিল।

বাঁচাইয়া দিল রঘুনাথ। কোন্ দিকে যাইতেছিল, হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

করিস কি ? করিস কি ভানুচাঁদ ? চকের মালিক চৌধুরি মশায়ের কুটুম্ব হন যে ! বিদেশি পাইক—ইনি হলেন আমাদের অতিথি।

ভানুচাঁদ তখন গলা ছাড়িয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, কুটুম্বর লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করলাম একটু—

বিনয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া রঘুনাথ করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি আজ্ঞে হয় পাইক মশায় ?

কাঁপিতে কাঁপিতে পাইক মহাশয় তখন কোন গতিকে বক্তব্য শেষ করিল। রঘুনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিল, আমরা মাটি কাটি নে। বাধা চৌধুরির ধান আসে—ডাক পড়লে থাজনা দিতে যাই। আমরা ঢালি—মুটে ঐ ওপারের ওরা।

ভ্রূ কুঁচকাইয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিতে লাগিল, পেটের দায়ে ওরা মোট বয়,

মাটি কাটে, কত কি করে। আপনি ভুল করে এ পাড়ায় এসেছেন, পাইক মশায়।

বলিয়া সগর্ব হাসিয়া রঘুনাথ ওপারের চিন্তামণির দলবল দেখাইয়া দিল।

ওপারের লোক খবর পাইয়া মাটি কাটিতে আসিল। উহারা যখন ঘামে-মাটিতে ভূত সাজিয়া কোদাল পাড়িতে থাকে, তখন রঘুনাথের দল তৈল-চিক্কণ চুলে দিব্য টেরি কাটিয়া শিস দিতে দিতে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজের শেষে শ্রান্ত পায়ে ওপারের দল ফিরিয়া যায়, ঘরে ঘরে ঢোল পিটাইয়া এপারে তখন সঙ্গীত শুরু হইয়াছে।

পাইকের কাছে রঘুনাথের সগর্ব উক্তিটা ক্রমশ মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। শেষে সৌদামিনীরও কানে পৌঁছিল। চিন্তামণিকে ডাকিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, আমার গোলা-ভরা ধান নেই ওস্তাদ, কিন্তু ভক্তদের জন্য কর্তা ঐ অতিথশালা গড়েছিলেন। আমার বাপধনেরা সব ঐখানে এসে থাক। শাক-ভাত একসঙ্গে সকলে ভাগ করে খাওয়া যাবে।

ইহার উপর আর কথা নেই। চিন্তামণি ছোট দলটি লইয়া ঘোষ-বাড়িতে উঠিল। ওপার একেবারে উৎখাত হইয়া গেল। চালি বলিতে যা রহিল সমস্ত নরহরির। বাঘা চৌধুরি মালকের একেশ্বর হইয়া পড়িলেন। সে এমন হইয়া উঠিল, দেশ-বিদেশের ব্যাপারিরা যাইবার মুখে ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া ভক্তিভরে মোহর দিয়া চৌধুরি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া যায়। বাঘাহরির নামে সরকারি খেয়াতেও পয়সা লাগে না। একবার একটা পশ্চিমি লোক কোন একটা পার-ঘাটের ইজারা লয়। চৌধুরিবাবুদের মাহাত্ম্য তার কানে গিয়াছিল। কিন্তু একদিন আধময়লা কাপড়-পরা ইয়ার-গোছের এক ছোকরা পারানি পয়সা না দিয়া বিনাবাক্যে চলিয়া যায় দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়া তাকে বলিল, সবাই মিলে নরহরি চৌধুরির দোহাই পাড়লে আমার কি করে চলে বাপু? ফিরবার সময় লিখন নিয়ে এসো, নইলে পয়সা লাগবে।

ইয়ার ছোকরা মুখ ফিরাইয়া কহিল, লিখন সঙ্গেই আছে চাঁদ আমার। এবং বাঁ-হাতখানা মাঝির গলায় তুলিয়া অবলীলাক্রমে তাকে জলের মধ্যে গোটা

দুই-তিন চুবানি দিয়া হাসিয়া দু'হাত সামনে প্রসারিত করিয়া বলিল, একটা কেন—আমার এই দু-দুটো লিখন।

তারপর আপন মনে শিস দিতে দিতে সে চলিয়া গেল।

পর দিন দেখা গেল, খেয়ার ঘাটে নৌকা নাই। দু-তিন শ টাকা দামের নৌকা, বিস্তর চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও কোন সন্ধান হইল না। সরকারি খেয়া বন্ধ রাখা চলে না, যে করিয়া হোক আবার নৌকার জোগাড় করিতে হইল। তার পরের দিন রাত্রে সেখানিও নিখোঁজ। তখন সেখানকারই একজন বাসিন্দা সৎবুদ্ধি বাৎলাইয়া দিল, ঢালি-পাড়ায় যাও গো মাঝি। সেদিন যে-লোকের কাছে পয়সা চেয়েছিলে সে হল ভানুচাঁদ—বাবাহরির বাছা খেলোয়াড়।

মাঝি তখন ভানুচাঁদের খোঁজ করিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ভানু বলিল, আমি কি জানি? যা বলবার বল গিয়ে সর্দারের কাছে। আমাদের বাপু হাত-পা-ই খোলা আছে—মুখ বন্ধ।

বস্তুত অনেক করিয়াও ইহার বেশি আর কিছু বাহির হইল না। যত জিজ্ঞাসা করে, হাসিয়া কেবল শিস দেয়, আর বুড়া-আঙুল নাড়িয়া নাড়িয়া গান করে, জানি নে—জানি নে—

তখন মাঝি রঘুনাথের কাছে গিয়া পড়িল।

নিতান্ত ভালমানুষ রঘুনাথ, যত্ন করিয়া শীতলপাটি পাতিয়া বসাইল, তামাক খাইতে দিল। কিন্তু আসল কথা উঠিলে সে-ও একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। অত্যন্ত দরদ দেখাইয়া কহিল, আ-হা-হা—দু দু'খানা নৌকো। কেন, নোঙর করা ছিল না?

মাঝি বলিল, মোটা কাছিতে নোঙর তো ছিলই, অধিকন্তু লোহার শিকলে চাবি-আঁটা। আর তারাও পালা করিয়া দাওয়ায় সজাগ হইয়া ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; অত বড় নোঙরটা উঠিল, চাবি-ভাঙিল,—কিন্তু এতটুকু শব্দ নাই, জলের উপর সামান্য ছপছপানিও নয়, যেন মন্ত্রবলে কাজ হইয়া গেল।

রঘুনাথ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হয়—অমন হয়ে থাকে, মাঝি ভাই। জোয়ারের টানে হয়তো ভেসে গেছে কোন মুলুকে—

মাঝি খপ করিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিল।

কোন্ মুল্লুকে ভেসে গেছে, সেইটে বলে দিতে হবে, সর্দার।

এবারে রঘুনাথ রীতিমতো রাগিয়া একটানে পা ছাড়াইয়া লইল। বলিল, আচ্ছা আহম্মক তো তুই। মুল্লুকের মালিক চৌধুরি মশায়। বলেন যদি—তিনি বলতে পারেন। আমরা নুন খাই, ডাক পড়লে খাজনা দিয়ে আসি—এই কেবল সম্পর্ক। আমরা কে?

অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আবার সেই নরহরি চৌধুরি পর্যন্ত ধাওয়া করিতে হইল। বয়সের সঙ্গে নরহরির রসিকতা বাড়িয়া গিয়াছে। নজর দিয়া পদপ্রান্তে হাতজোড় করিয়া বসিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

ওকি হল? না না—উঠে বোসো, টাকাটা তুলে নাও। তুমি হলে কোম্পানির খেয়ার ইজারাদার—

কোম্পানির ইজারাদার নাক-কান মলিয়া বলিল, আর ঘাট হবে না চৌধুরি মশায়। আমি পারানির এক-শ গুণ ধরে দিচ্ছি।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পারানি কত?

দু-পয়সা।

নরহরি হিসাব করিয়া কহিলেন, অর্থাৎ আরো টাকা দুই আন্দাজ দিচ্ছ তুমি। আর তোমার নৌকা দু-খানার দাম?

সাড়ে তিন-শ, চার-শ—

নরহরি নরম সুরে কহিলেন, আমারও হাঙ্গাম আছে বাপু, লোকজন লাগিয়ে দেশদেশান্তর খুঁজতে হবে। তা যাকগে, তুমি একখানারই দাম ধরে দিও। কোম্পানির ইজারাদার—যা হোক একটা খাতির-উপরোধ আছে তো!

অবশেষে একপক্ষের কান্নাকাটি অপর পক্ষের খাতির-উপরোধের ফলে এক শ টাকায় রফা হইয়া দাঁড়াইল।

নরহরি বলিলেন, টাকাটা কি নিয়ে এসেছ বাপু?

খেয়ার ঘাট বন্ধ রাখিবার জো নাই, বড় মুশকিল হইয়াছে। মাঝি তাড়াতাড়ি বলিল, আমি কালই দিয়ে যাব—নিশ্চয়—

আমিও খোঁজ-খবর করে রাখব। বলিয়া এক মুহূর্ত লোকটার কাতর মুখের দিকে তাকাইয়া নরহরির সত্য সত্যই করুণা হইল। আর দেশদেশান্তর খোঁজের অপেক্ষা না রাখিয়া বোধ করি যোগ-প্রভাবেই বলিয়া দিলেন, চিত্তলমারির খালে দেড় বাঁক গিয়ে যে বড় কেওড়াগাছটা—তারই কাছে জলের তলায় খোঁজ করে দেখো। দু-খানা নৌকো এক জায়গায় আছে। যাও। আর টাকাটা কালই দিয়ে যেও—নয়তো, বুঝলে তো?

বলিয়া চৌধুরি মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

মাঝি কৃতজ্ঞ অন্তরে চলিয়া গেল। সবই সে উত্তম রূপে বুঝিয়াছিল।

পরদিন কি একটা কাজে রঘুনাথ আসিয়াছিল। হাসিমুখে নরহরি কহিলেন, টাকা নেবে সর্দার? মাঝি বেটা পাইপয়সা অবধি শোধ করে দিয়ে গেছে। নিয়ে যাও না গোটাকতক!

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িল।

চৌধুরি তবু বলিলেন, তুমি না নেও—ভাস্তচাঁদ আছে, আরও ছোকরারা আছে। কীর্তি তো ওদেরই। নিয়ে যাও, আমোদ-স্ফূর্তি করবে।

হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, ভাস্ত কি আর আলাদা একটা কিছু বলবে? দলের লোক না? ও বড্ড ঝঞ্চাট চৌধুরি মশায়। টাকা নেও—হাটে-ঘাটে যাও—দরদস্তুর কর। অত ঘোরপ্যাঁচ পোষায় না আমাদের। আমরা সোজা মানুষ, সম্বৎসর খাওয়াচ্ছ তুমি—হুকুম হলে খাজনা দিয়ে যাব। ব্যস।

টাকা লইল না; প্রণাম করিয়া সে লাঠি তুলিয়া লইয়া রওনা হইল।

(২)

অগ্রহায়ণ মাস। বউভাসির চকের ধান কতক কাটা-ঝাড়া হইয়াছে। কিন্তু দর কম বলিয়া আদায়পত্র বড় মন্দা। আবার যা আদায় হয়, বাঁধ-মেরামতে ও আর দশটা বাবদে চলিয়া যায় তার অর্ধেকের বেশি। এবার তহ্‌শিল করিতে সদর-নায়েব হরিচরণ চাটুজ্জে মহাশয় স্বয়ং বরিশাল হইতে চলিয়া আসিতেছেন। চিঠি আসিয়াছে, তিনি রওনা হইয়া গিয়াছেন; আরও তিন-চারটা মহাল পরিদর্শন করিয়া তারপর এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। দু'টা জেলা পার হইয়া এতদূর অবধিও হরিচরণের নামডাক। অন্যান্য বার যারা আসিয়া থাকে, হরিচরণ সে ধরনের নহেন। মালাধার কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

যথাকালে সদর-নায়েব আসিলেন। রং কালো মাথায় টাক, খুব মোটাসোটা চেহারা, পৈতার গোছাও চেহারার অনুপাতে। হুঁকা, গড়গড়া, অভাবে কলার পাতায় কলকে বসানো—সর্বক্ষণ যা হোক একটা কিছু চাই-ই। মালাধরের চণ্ডীমণ্ডপে মহাসমারোহে কাছারি চলিতেছে। আহারাদির ব্যবস্থা মালাধরের বাড়িতে। মালাধরের মেয়ে তরুবালা সমস্ত আয়োজন করিয়া চড়াইয়া দেয়; একটা হিন্দুস্থানি দারোয়ান আছে—সে-ই ভাত-তরকারিগুলা নামাইয়া জাত রক্ষা করে। মালাধর যেন রাজসূয় ব্যাপার লাগাইয়াছে। গোটা জেলার মধ্যে কইমাছ যত মোটা হইতে পারে, তারই বিপুল সংগ্রহ কলসি-ভরতি করিয়া জিয়াইয়া রাখা। ঘরকয়েক গোয়ালা প্রজা আছে, তারা সকাল-সন্ধ্যা দুধ-ঘি নিয়মিত যোগান দিয়া চলিয়াছে। ক্রমশ গঞ্জের দোকানের সন্দেশ-রসগোল্লাও দেখা দিতে লাগিল। আয়োজন পরম সুন্দর। হরিচরণ মাঝে মাঝে ভদ্রতা করিয়া অনুযোগ করেন, কি শুরু করলে বল দিকি সেন মশাই? এত কি দরকার?

বিনয়ে গলিয়া গিয়া মালাধর বলে, আজ্ঞে না। এ কি আপনার খুশি! ছাই ভস্ম—যা হোক মোটের উপর দু'টি পেট ভরে সেবা করেন।

সেবা আকণ্ঠ পুরিয়াই চলিতে লাগিল। কিন্তু বিকালে জমাখরচ মিলাইবার সময় সমস্তই বোধকরি একদম হজম হইয়া যায়।

এ যে ভয়ানক কাণ্ড, একেবারে পুকুর-চুরি। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হরিচরণ চমকিয়া ওঠেন। চার মজুরে তিন পয়সার তামাক পুড়িয়ে ফেলল? এ কক্ষণো হতে পারে না সেন মশাই।

মালাধর বিরক্ত হইয়া ওঠে। উত্তর দেয়, হয় মশাই, হিসেব করে দেখুনগে —চার জন কেন, এক একজনেই যে পাহাড় উড়িয়ে দিতে পারে!

একদিন সকালবেলা হরিচরণ নিজে বাঁধ দেখিতে গেলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, পাঁচ-শ টাকার মাটি কাটা হইয়াছে, কড়াক্রান্তি অবধি হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে, অথচ বাঁধের কোনোদিকে মাটি কাটার চিহ্ন নাই একটু।

মালাধর বলিল, গর্ত থাকিবে কি মশাই, আট-ন মাস হয়ে গেল—জোয়ার-জলে সমস্তই তো ভরাট করে দিয়ে গেছে।

আর তোলা-মাটি বুঝি বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে?

যে আজ্ঞে। বলিয়া মালাধর সপ্রতিভ হাসি হাসিল।

শোন সেন মশাই—হরিচরণ হাসিলেন না, রূঢ় কণ্ঠে কহিলেন, বাঁধ-মেরামত বন্ধ আজকে থেকে। ভবিষ্যতে বিশেষ হুকুম না নিয়ে কাজে নামবে না।

তা হলে চকে লোনা জল ঢুকবে—

হরিচরণ বলিলেন, কিন্তু তা না হলে যে গোটা চকসুদ্ধ তোমার ট্যাঁকে ঢুকে যাবে।

মালাধর চুপ করিয়া গেল।

শীতের রৌদ্র সমস্ত নদীজল এবং দূরের গ্রামের গাছপালার উপর ঝকমক করিতে থাকে। চাষীর ছেলেরা খামারে হৈ-হৈ শব্দে গরু তাড়াইয়া মলন মলে। নদীর বালুতটের উপর দিয়া ভিন্ন গ্রামের একদল মেয়ে-পুরুষ জাগুলগাছি গ্রামে মেলা দেখিতে যায়। একজনে নাকিসুরে গান ধরিয়াছে, 'নাথ, রাম কি বস্তু সাধারণ?' ক্রমে দূরবর্তী হইয়া গান আর কানে আসে না। ইহারা তখন

বাড়ি আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন, তোমার মাইনে কত সেন মশাই?

প্রশ্নটা ঠিক কি ভাবে হইল মালাধর ধরিতে পারিল না। নায়েবের মুখের দিকে তাকাইয়া করুণ গদ্গদকণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে—আট টাকা মাত্তোর। ওরই মধ্যে খাওয়া।

হাসিয়া ফেলিয়া হরিচরণ বলিলেন, কিন্তু খাওয়া তো আট টাকার মতো নয়। আমাদের বাবুর বাড়িতেও যে এমনটা হয় না—

মালাধর তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ও সব শ্বশুর মশায় তত্ত্বে পাঠিয়েছিলেন।

তত্ত্বে সম্বৎসর চলে নাকি?

আজ্ঞে না, আর বেশি দিন চলবে না। বলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া উদ্যত ক্রোধ সামলাইয়া মালাধর বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

একদিন যথারীতি কাছারি চলিয়াছে, এমন সময় হুম-হাম করিয়া নরহরি চৌধুরির হাঙরমুখো পালকি উঠানে আসিয়া নামিল। যে যেখানে ছিল, তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। নরহরি হাসিমুখে সকলের দিকে একবার তাকাইলেন। তারপর হরিচরণকে বলিলেন, গিন্নির বার্ষিক শ্রাদ্ধ। কয়েকটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের বাসনা হয়েছে। দয়া করে দুপুরবেলা একটু পদধূলি দেবেন নায়েব মশাই।

কাজকর্মের তাড়া আছে জানাইয়া চৌধুরি আর বসিলেন না, সরাসরি আবার পালকিতে গিয়া বসিলেন।

হরিচরণ এতক্ষণ পরে একবার গড়গড়ায় টান দিয়া দেখিলেন, আগুন নিভিয়াছে। দেখিয়া আবার সাজিতে হুকুম করিলেন। সেবারের সেই পাইকটি উপস্থিত ছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া যেন হরিচরণেরই মনের কথাটা প্রকাশ করিয়া কহিল, সর্বরক্ষে!

দাখিলা লিখিতে লিখিতে বাঁকাহাসি হাসিয়া মালাধর বলিল, তাই কি বলা যায় রে ভাই?

উপস্থিত প্রজাপাটক সকলেই হাসিতে লাগিল। মালাধর বলিতে লাগিল, হাসির কথা নয় যে, দাদা। পুরাণে পড়েছ, ভগবানের দশ অবতার। তার ন'টা হয়ে গেছে—শেষ নম্বর ঐ উনি। আস্ত কলিঠাকুর। মাটি দিয়ে ছাঁচ তুলে রাখা উচিত।

দাখিলায় বইটা হরিচরণের দিকে সহির জন্ত আগাইয়া দিয়া মালাধর টাকাকড়ি বাজাইয়া গণিয়া হাতবাক্সে তুলিল। তারপর নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, বিদেশি মানুষ, ভাল করে চেনেন না তাই। বরকন্দাজ না পাঠিয়ে স্বয়ং সশরীরে ঐ যে আদর-আপ্যায়ন করে গেলেন—আমার কিন্তু সেই অবধি মোটে ভাল ঠেকছে না মশাই।

হয়েছে, হয়েছে—চুপ কর দিকি! হরিচরণ সগর্বে বলিতে লাগিলেন, নিজে আসবেন না কি! আমাদের বাবু যে চৌধুরি মশায়ের পিসতুত ভায়রা। খবর রাখ?

ভায়রার নিমন্ত্রণে যে প্রকার উল্লাস হইবার কথা, মুখভাবে অবশ্য তাহার একটুও প্রকাশ পাইল না। কিন্তু একঘর লোকের সামনে আলোচনা আর অধিক বাঞ্ছনীয় নয়। থামিতে গিয়াও তবু মালাধর বলিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ-সন্তান—বিদেশে এসেছেন। খেয়ে-দেয়ে এখন সুভালাভালি ফিরে আসুনগে। আমাদের আর কারও কিন্তু নেমন্তন্ন হয় নি—শুধু আপনার—

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া হরিচরণ নিমন্ত্রণে চলিলেন।

বেলা পড়িয়া আসিল। আগুলগাছি মেলায় আনুষঙ্গিক আজ পুতুল-নাচ হইবে, তারা বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে। দু'জন পাইক পাগড়ি বাঁধিয়া লাঠি লইয়া রওনা হইবার উদ্যোগে উঠানে দাঁড়াইয়া আছে, মালাধর তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্য হইতে বালাপোষটা কাঁধে ফেলিয়া আসিল। এমন সময় হেলিতে দুলিতে হরিচরণ ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল, আশঙ্কা অমূলক; দিব্য হাসিমুখে তিনি পান চিবাইতেছেন। হাসিয়া বলিলেন, বিদেশি লোক বলে খামকা একটা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে সেন মশায়?

মালাধর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ বলিলেন, অতি মহাশয় ব্যক্তি। নরহরি চৌধুরির নাম-ডাকই শুনে আসছি, পরিচয় তো তেমন ছিল না। দেখলাম—হাঁ, মানুষ বটে একটা!

মালাধর সশঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল, বৃত্তান্ত কি নায়েব মশায়?

গর্বিত স্বরে নায়েব বলিলেন, চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়—আর কিছু নয়?

মালাধর গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল। বলিল, কি জানি! শনির নজর পড়লে গণেশের মুণ্ডু উড়ে যায়, এই তো এতকাল জানা ছিল—

কিন্তু সত্যই, বিস্ময়ের পারাপার নাই।

দিনকয়েক পরে পুনরায় হাঙরমুখো পালকি এবং পুনশ্চ নিমন্ত্রণ। এবারে স্বর্ণলতার পুতুলের বিয়ে না অমনি কি একটা ব্যাপার। তারপর যাতায়াত শুরু হইল প্রায় প্রতিদিনই; উপলক্ষের আর বাছবিচার রহিল না। এদিকে বরিশালে জমিদারের নামে হরিচরণ গোটা গোটা লেপাফা পাঠাইতেছেন। মালাধর দাখিলা লেখে আর আড়চোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। শেষে একদিন মরীয়া হইয়া বলিয়া বসিল, কথাটা একটু ভাঙুন দিকি নায়েব মশায়—

কি?

আজ্ঞে, আমরাও ছিটেফোঁটার প্রত্যাশী।

না—না—সে সব কিছু নয়।

হরিচরণ তখনকার মতো চাপা দিলেন বটে, কিন্তু মালাধর ছাড়িবার লোক নয়। অতঃপর প্রায়ই কথাটা উঠিতে লাগিল একদিন শেষে চুপিচুপি নায়েব বলিলেন, বউতাসির চক বাবুরা ছেড়ে দিচ্ছেন।

মৃদু হাসিয়া মালাধর বলিল, নিচ্ছেন নরহরি চৌধুরি—

বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন, কোথায় খবর পেলে? তুমি জানলে কি করে?

মালাধর বলিতে লাগিল, আর কার মাথা-ব্যথা পড়েছে বলুন? কত চেষ্টা

হয়েছে এর আগে। চকের দক্ষিণে চৌধুরির ঢালিপাড়া, গরজ চৌধুরির নয় তো কি আর গরজ হবে বরণডাঙাদের ?

গরজ না ছাই। সে হিসেব-জ্ঞান থাকলে তো! তাচ্ছিল্যের স্বরে হরিচরণ বলিতে লাগিলেন, চৌধুরির হাঁক-ডাক কেবল ঐ মুখে মুখে—হেনো করেঙ্গা, তেনো করেঙ্গা। বুদ্ধি-বিবেচনায় লবডঙ্কা। কত অজুহাত! বলে ও আমার পোষাবে না, আজ বাঁধ ভাঙল, কাল নোনা জল চোঁয়াচ্ছে। শেষকালে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, কেন পোষাবে না মশাই? শ'দুই ঘর ঢালি চাকরান—সবাই তো ভাত গিলছে আর বগল বাজাচ্ছে; খাটিয়ে নিন একটু। আর আমাদের বাবুকেও বুঝিয়ে-সুজিয়ে লিখে দিলাম, আপদ-বালাই ঝেড়ে দিন চৌধুরির ঘাড়ে, কাঁহাতক হাঙ্গামা করে বেড়াবেন বছর বছর ?

মালাধর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, দরদস্তুর হয়ে গেছে নাকি ?

হরিচরণ বলিলেন, তা একরকম। তিন-চার শ'র এদিক-ওদিক আছে, হয়ে যাবে বই কি!

আজ্ঞে, সে দরের কথা বলছি না। একটু হাসিয়া চোখ টিপিয়া মালাধর বলিল, বলি গণেশ-পূজোর ব্যবস্থাটা হল কি রকম ?

হরিচরণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিলেন।

হাসিতে হাসিতে মালাধর বলিল, ব্রাহ্মণ-সন্তান—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আপনি। ঐ দুর্গা বলুন, কালী বলুন—সকল বড়-পূজোর আগে গণেশ পূজো। বাচ্চাঠাকুর আগে খুশি হবেন, তবে বড়দের ভোগে আসবে। আট-টাকা মাইনে পাই মশাই, তা-ও তিন বচ্ছর বাকি। এই হাতবাক্স কোলে করে সেরেস্তায় বসে আছি, সত্যি সত্যি তো যোগ-তপস্যা করতে আসি নি।

শিহরিয়া নায়েব জিভ কাটিলেন, ঘুস ?

আজ্ঞে না, পাওনা-গণ্ডা—

হরিচরণ গম্ভীর মুখে বলিলেন, তোমার চাকরি বজায় থাকে, চৌধুরি মশায়কে সেই অনুরোধ করতে পারি। তার বেশি এককড়াও নয়। পরক্ষণে হাসিয়া বলিলেন, শ্বশুর-বাড়ির মস্ত একটা তত্ত্ব ফসকে যায় বুঝি মালাধর ?

মালাধর মনে মনে বলিল, শ্বশুরের বেটা একাই সাবাড় করছে যে সে হতে দিচ্ছি নে, মাণিক।

নিরুত্তরে সে নায়েবের পরিহাসটা পরিপাক করিল।

দিবানিদ্রার পর বেলাটা একটু পড়িলে হরিচরণ আজকাল প্রায়ই যান ভায়রা কুটুম্বর বাড়ি খবরাখবর লইতে। মালাধরও সঙ্গে সঙ্গে বালাপোষ কাঁধে ফেলিয়া ভিন্ন পথে মেলা দেখিতে বাহির হইয়া পড়ে। দিনের পর দিন একই মেলা কি রকম সে উপভোগ করিতেছে, তাহার সংবাদ পাওয়া যায় না। ইদানীং সে পাইকদেরও সঙ্গে লয় না। এদিকে চক বন্দোবস্তের সমস্ত ঠিকঠাক, দিনস্থির পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে, দলিলের মুশাবিদা করিতে দু'দিন পরে সকলের সদরে যাইবার কথা—হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো বরিশাল হইতে হুকুম আসিল, চক আপাতত বিক্রয় হইবে না—কবলাপত্র স্থগিত থাকুক।

মালাধরই পত্রের মর্ম পড়িয়া শুনাইল। রুক্ষ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন, কাণ্ডটা কি?

মালাধর যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। বলিল, আপনাদের বড় বড় ব্যাপারে, আমি কি জানি মশাই? আমি দাপ্তরে লিখি, মেলা দেখে বেড়াই, ব্যস—

হুঁ—বলিয়া নায়েব গুম হইয়া রহিলেন। সেই বিকালটায় আপাতত চৌধুরি-বাড়ির খবরাখবর লওয়া বন্ধ রাখিতে হইল, ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের মধ্যে যা হোক কিছু খাড়া না করিয়া যাওয়া ঠিক নয়। সকালবেলা কাছারির দোর খুলিয়াই দেখা গেল সামনে রঘুনাথ। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, শরীর গতিক ভাল তো? চৌধুরি মশায় উতলা হয়েছেন।

মালাধরও সবে ঘুম ভাঙিয়া কৃষ্ণের শতনাম আওড়াইতে আওড়াইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল, গলা খাটো করিয়া বোধকরি বাতাসকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল, কুটুম্বিতে একে বলে। একটা দিন দেখেন নি, দুশ্চিন্তায় চৌধুরি মশায় একেবারে একপ্রহর রাত থাকতে লোক মোতায়েন করে দিয়েছেন।

রঘুনাথ কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠি বাহির করিয়া দিল। সেই পুরানো ব্যাপারে—মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ। আর একদফা পদধূলি লইয়া রঘুনাথ বিদায় হইয়া গেল।

কাছারি বসিয়াছে। মালাধর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা হিসাব মিলাইতেছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে হরিচরণের দিকে তাকাইয়া দেখে। এতদিনের মধ্যে যা কখনো হয় নাই—এদিক-ওদিক তাকাইয়া হঠাৎ নায়েব বলিয়া উঠিলেন, একটা সৎযুক্তি দাও তো সেন মশাই—

মালাধর ঘাড় তুলিল না। তেমনি হিসাব করিতে করিতে বলিল, আজ্ঞে?

হরিচরণ বলিলেন, চৌধুরি মশায় নেমতন্ন করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু শরীরটে বড় খারাপ লাগছে—

আজ্ঞে—বলিয়া মালাধর এবার আপন মনে দুর্গানাম লিখিতে লাগিল।

হরিচরণ রাগ করিয়া খাতাপত্র ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কথাটা যে মোটে কানে নিচ্ছ না?

মালাধর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে অসুখ করেছে নিশ্চয়—নয় তো শরীর খারাপ লাগবে কেন?

নায়েব আরও রাগিয়া বলিলেন, তোমায় সেজন্য পাঁচন জ্বালাতে বলছি না সেন মশাই। জিজ্ঞাসা করছি, চৌধুরির নেমন্তন্নের কি হবে?

যেতে হবে।

অসুখ অবস্থায়?

আজ্ঞে, বাবাহরির ব্রাহ্মণভোজনের ইচ্ছে হয়েছে যে!

নায়েব বলিলেন, চিঠি লিখে পাইক পাঠিয়ে দেওয়া যাক। নয় তো ভদ্রলোক অনর্থক যোগাড়যন্ত্র করে বসে থাকবেন—

মালাধর এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সংশয়ের সুরে বলিল, আস্তাকুড়ে গিয়ে বসলে কি যমে ছাড়বে মশাই? বিশ্বাস তো হয় না। তবে আপনাদের দুটুম্বিতের ব্যাপার—এই যা।

যা বলিল তাই। চিঠি লিখিয়া পাইক পাঠানো হইল। কিন্তু নিমন্ত্রণ

মাপ হইল না। যথাকালে একেবারে পালকি-বেহারা চলিয়া আসিল। সঙ্গে রঘুনাথ।

হরিচরণ বলিলেন, জয় হয়েছে।

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, তাইতো চৌধুরি মশায় ব্যস্ত হয়ে পালকি পাঠালেন। মাটিতে সে হাতের পাঁচ-হাতি লাঠিখানা একবার অকারণে ঠুকিল। পিতলের আংটা ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

মালাধর চোখের ইসারায় নায়েবকে ডাকিয়া লইয়া কহিল, বেলা করবেন না, উঠে পড়ুন পালকিতে।

নায়েব বিস্মিতভাবে চাহিলেন। মালাধর বলিতে লাগিল, দেব-দ্বিজে ওঁর অচলা ভক্তি। নেমন্তন্ন ওরা আজ খাওয়াবেই ঠেকছে। একবার বলরাম স্মৃতিরত্নকে পিছমোড়া বেঁধে নেমন্তন্ন খাইয়ে দিয়েছিল।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া হরিচরণ পালকিতে উঠিলেন। নামিয়া নরহরির বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখেন, গম্ভীর মুখে চৌধুরি পায়চারি করিতেছেন। বরিশালের চিঠিটা হাতে দিয়া হরিচরণ বলিলেন, কিসে কি হল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না হুজুর। আমার এক বিন্দু গাফিলতি নেই।

পড়া শেষ করিয়া নরহরি ডাকিলেন, রঘু!

হরিচরণ বলিতে লাগিলেন, ঐ মালাধর বেটার হয়তো কোনরকম কারসাজি আছে। ওটাকে শায়েস্তা করা দরকার।

নরহরি আরও গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, রঘুনাথ!

হরিচরণ ছুটিয়া গিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া আনিলেন।

নরহরি বলিলেন, এঁকে খাবার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এসো।

হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন, কথাটা তা হলে খাবার পরই হবে হুজুর—

নরহরি পুনশ্চ রঘুনাথকে বলিলেন, খাওয়া হলে দেউড়ি পার করে দিয়ে আসবে, বুঝলে?

রঘুনাথ বিশেষ সম্বর্ধনা করিয়া কহিল, আসতে আজ্ঞা হয় নায়েব মশায়।

(৩)

আবছা জ্যোৎস্নায় প্রহরখানেক রাত্রে ঢালিপাড়ার ঘাটে ছোট একখানা ডিঙি আসিয়া লাগিল। এবারে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে ধান নয়—কোদাল। রঘুনাথ সর্দার ডিঙি হইতে নামিয়া গিয়া ভাস্করচাঁদকে ডাকিল। বলিল, চটপট ঐগুলো বিলি করে দে তো বাবা।

ভাস্করচাঁদ আশ্চর্য হইয়া বলিল, শেষকালে চৌধুরি মশায় কোদাল পাঠালেন সর্দার?

সর্দার বলিল, নিয়ে এলাম। দীঘি কাটার সেই চার-পাঁচ শ' কোদাল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভাস্কর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া রঘুনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। যে রকম ঘোরপ্যাঁচ কোম্পানির আইনের—লাঠি কোদাল দুই-ই রাখতে হয় রে—কখন কোনটা লাগে। চৌধুরি মশায় তাই বললেন—নিয়ে যাও সর্দার।

চকের ধান এখনো আধাআধি আন্দাজ কাটিতে বাকি। এখানে-ওখানে খামার করিয়া গাদা দেওয়া হইয়াছে। দিন তিনেক পরে মহা এক বিপর্যয় কাণ্ড হইয়া গেল। মালাধরের উত্তরের ঘরে হরিচরণ ঘুমাইয়া ছিলেন। অনেক রাত্রি। হঠাৎ বহুলোকের চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া নায়েব বাহিরে আসিলেন। চাঁদ অস্ত গিয়াছে। বিশ-ত্রিশজন চাষী বুক চাপড়াইয়া মাথা কুটিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাদের সর্বনাশ হইয়া যায়। বাঁধ ভাঙিয়াছে, নদীর নোনা জল পাকা ধান ডুবাইয়া নষ্ট করিয়া তাদের সম্বৎসরের আশা-ভরসা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে মালাধরও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর সেই ক্রোশখানেক পথ সকলে একরকম দৌড়িয়া চলিয়া গেল। শেষরাত্রির অন্ধকার-নিমগ্ন মালঞ্চ। কোটালের মুখ; জোয়ার নামিয়াছে। শীতের শীর্ণ নিস্তেজ মালঞ্চ জলতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কলকল করিয়া নোনা জল

বিপুল বেগে চকের নয়ানজুলি বোঝাই করিয়া ফেলিতেছে। আট-দশ হাত ভাঙন দেখিতে দেখিতে বিশ হাত হইয়া দাঁড়াইল। বিপুল সর্বনাশের সম্মুখে হতভম্ব হরিচরণ ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। চাষীরা উন্মাদের মতো হইয়া গিয়া ঝাঁপ দিয়া সেই জলস্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িল, যেন বুক দিয়া ঠেকাইতে চায়। পারিবে কেন? জল ধাক্কা দিয়া তাদের ফেলাইয়া দেয়, পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে রক্তাক্ত ক্ষত দেহে কোনগতিকে উঠিয়া আবার জল ঠেকাইবার চেষ্টায় বৃথা আকুলি-বিকুলি করে।

মালাধর চেঁচাইতে লাগিল, উঠে আয় বেটারা। গ্রামে গিয়ে বাঁশ কেটে নিয়ে আয় আমার ঝাড় থেকে। কান্নাতে কি আর জল ঠেকাবে?

বাঁশ আসিয়া পৌঁছিল। পঞ্চাশ-ষাটটা বাঁশের খোঁটা জলের মধ্যে পুতিয়া গোছা গোছা কাটা-ধান আনিয়া তার গায়ে দিতে অনেক কষ্টে জলের বেগ কমিল। রাত্রি শেষ হইয়া পূর্বাকাশে রক্ত আভা দেখা দিয়াছে। জল-কাদা মাখিয়া চাষীদের সঙ্গে মালাধরেরও অদ্ভুত মূর্তি হইয়াছে। তারপর নদীতে ভাঁটা পড়িয়া গেল, ঝপঝপ মাটি কাটিয়া বাঁধ মেরামত হইল।

রুদ্ধকণ্ঠে হরিচরণ বলিয়া উঠিলেন, এ চৌধুরি শালার কাজ, আমি হলপ করে বলতে পারি।

চুপ, চুপ! মৃদু হাসিয়া মালাধর কহিল, বাগ চেঁচিয়ে কয়বেন না—মনে মনে করুন। চৌধুরির দু-শ লাঠি আর চার-শ কান।

একটু থামিয়া বলিল, আমি মশাই রাতদিন মাথা কুটে মরছি, নিদেন পক্ষে গাঙের দিককার বাঁধটা জব্দ রাখুন। আপনি গেলেন সরকারি পয়সা বাঁচাতে। কোটালের টান—পুরাণো বাঁধ রাখতে পারবে কেন? এখন চৌধুরির দোষ দিচ্ছেন। বাবু কি আর বিশ্বাস করবেন কুটুম্বর দোষ?

আলবৎ! হরিচরণ রাগিয়া আগুন। বলিতে লাগিলেন, এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম সেন মশাই, কোনটা কোটালের ভাঙন আর কোনটা মানুষের কাটা—তুমি আমায় শেখাতে এসেছ? বাবুকে আজই চিঠি লিখছি, বুঝুন তাঁর কুটুম্বর কাণ্ডটা।

নায়েব চিঠি লিখিলেন। মালাধরও বাড়ির মধ্যে গিয়ে বিস্তর যুশাবিদা করিয়া গোপনে আর এক সুদীর্ঘ চিঠি লিখিল। সদর হইতে জবাব আসিল হরিচরণের নামে, কি আসিল তিনি কাহাকেও দেখাইলেন না। ক'দিন পরে তল্পিতল্পা বাঁধিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। মনের আনন্দে মালাধর হরির লুঠের জোগাড় করিল।

অতঃপর মালাধর একেশ্বর। বাঁধ-মেরামতে আর কৃপণতা নাই। কিন্তু বাঁধ ভাঙা বন্ধ হইল না। ধান কাটা শেষ হইয়াছে, কাজেই আশু ক্ষতি গুরুতর হইতেছে না। কিন্তু নদী যেন মানুষের সঙ্গে দুষ্টামি লাগাইয়াছে। মালাধর লোকজন ডাকিয়া সমস্তদিন হৈ-হৈ করিয়া নূতন মাটি ফেলিয়া আসে—সকালে গিয়া দেখা যায়, মালক্ষ পাশে আর এক জায়গায় মাথা ঢুকাইয়াছে। আর মজা এই, নদীর যত আক্রোশ ঐ রাত্রিবেলাতেই। বিশেষত কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হইলে তো কথাই নাই।

একদিন অমাবস্যার কাছাকাছি কি একটা তিথি, সমস্তটা দিন মেঘলা করিয়া সন্ধ্যার পরে টিপিটিপি অকালবর্ষা শুরু হইল। খানিক রাত্রে একখানা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া মালাধর একাকী বাঁধের আড়ালে গুঁটিসুটি হইয়া বসিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিসারিত করিয়া সে গাঙের দিকে তাকাইয়া রহিল। আন্দাজ ঠিকই—অনেকক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া তারপর দেখিল, কূল ঘেঁসিয়া উজান ঠেলিয়া কালো রেখার মতো ছোট একটা ডিঙি আসিতেছে। বিশ-পঁচিশটা মরদ একহাতে কোদাল আর একহাতে সড়কি—ডিঙি হইতে নামিয়া ঝপাঝপ বাঁধে কোদাল মারিতে লাগিল। পা টিপিয়া টিপিয়া মালাধর নদীর খোলে নামিয়া নৌকার কাছে গিয়া দেখিল, কাদায় লগি পুতিয়া নৌকা বাঁধা। নিঃশব্দে দড়ি খুলিয়া দিল, তীব্রস্রোতে ডিঙি দেখিতে দেখিতে নিখোঁজ হইয়া গেল। তারপর আবার বাঁধের আড়ালে আড়ালে ঘরে গিয়া দিব্য ভালোমানুষের মতো সে নাক ডাকিতে লাগিল।

পরদিন মালাধর নরহরির বাড়ি গিয়া ধর্না দিয়া পড়িল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে নরহরি কহিলেন, সেন মশাই খবর কি?

মালাধর করজোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল, রাজ্যের মালিক আপনি—আপনার অজানা কি আছে হুজুর ?

বাঁধ ভাঙার ঘটনা সে বলিতে লাগিল। বলিল, আপনার কুটুম্বর বিষয়, আপনি একটা বিহিত করে দিন চৌধুরি মশায়।

গাঙ তো আমার হুকুমের গোলাম নয়। আরও চওড়া করে নতুন বাঁধ দিয়ে দেখ দিকি।

মালাধর বিনয়ে আরও কাঁচু-মাচু হইয়া কহিল, আজ্ঞে গাঙ নয়; মানুষ।

কারা মানুষ ? নরহরির দৃষ্টি একমুহূর্তে প্রখর হইয়া উঠিল।

মালাধর বলিতে লাগিল, চিনব কি করে হুজুর ? যে অন্ধকার! আর কাছে এগুতেও সাহস হয় না। হাতে সব ঝকমকে সড়কি, শেষকালে এফোঁড়-ওফোঁড় গেঁথে ফেলে যদি !

শ্যামকান্ত সেখানে ছিল। সে সগর্জে চড়িয়া উঠিল।

ঠিক বরণডাঙার কাজ। চিরশত্রু আমাদের—জানে আমাদের কুটুম্বর বিষয়, তাই ওখানেও শত্রুতা সাধতে লেগেছে। বিহিত করতেই হবে বাবা, লাভ হোক লোকসান হোক—এ চক আমাদের নিতে হবে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, তুমি মধ্যবর্তী হয়ে ওটার ব্যবস্থা করে দাও মালাধর। তারপর লাঠি-বৃষ্টি করব ঐখানে। দেখি, কে শত্রুতা করতে আসে!

কিন্তু লাঠি-বৃষ্টি হোক আর যা-ই হোক, কাজ ভুলিবার পাত্র মালাধর নয়। বলিল, আজ্ঞে, তা ঠিক—কিন্তু দরদামের কথাটা—

হরিচরণের আমলে যে তিন-শ টাকার কথাকথি চলিতেছিল, রাগের বশে সেটা একেবারে ধরিয়া দিয়াই নরহরি দাম বলিয়া দিলেন।

মালাধর মাথা নাড়িয়া বলিল, আর কিছু নয় ?

ইঙ্গিতটা নরহরি সম্পূর্ণ এড়াইয়া গেলেন। বলিলেন, আর বেশি দিয়ে কে নিচ্ছে এই গোলমেলে মহাল ? আমি রাজি হয়ে যাচ্ছি কুটুম্বিতের খাতিরে।

মালাধর বলিল, কে নেয় না নেয়—জানি নে। খবর দেব দিন পাঁচ-সাতের ভিতরে। আজ্ঞে, আসি তবে—

কিন্তু মালাধরের খবরের আগে খবর আনিল রঘুনাথ। ঢালিপাড়ার নিচে দিয়া সৌদামিনী ঠাকরুনকে নৌকাযোগে যাইতে দেখা গিয়াছে, সঙ্গে মালাধর। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটা আশঙ্কা নরহরির মনে খেলিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, নৌকা সাঁপাড়া দিয়ে উঠল?

হুঁ—

কসবায় গেল নাকি?

তা জানি নে।

ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জন করিয়া নরহরি বলিলেন, সবাই হাত-পা কোলে করে বসে রইলে? গলুইটা টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারলে না?

রঘুনাথ কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, করব কি চৌধুরি মশাই? বড্ড সকাল-বেলা—ছোঁড়াগুলো তখনও সবাই ঘুম থেকে ওঠে নি। নৌকোয় ছিল চিন্তামণি ওস্তাদ—ভাল তোড়জোড় না করে তো এগুনো যায় না।

ইহা যে কত বড় সত্য, নিজে লাঠিয়াল হইয়া নরহরির চেয়ে বেশি জানে আর কে? তিনি আর তর্ক করিলেন না। রঘুনাথকেই কসবায় শশিশেখর উকিলের কাছে পাঠানো হইল। সন্ধ্যার সময় জবাব আসিল, শশিশেখর জানাইয়াছেন, প্রায় তিনগুণ দামে সেই দিনই সৌদামিনী ঠাকরুনের সঙ্গে বউভাসির চক বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

নরহরি রক্তচক্ষে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর সহসা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ঠিক হয়েছে। পাটোয়ারি চাল চালতে গেছি আমি। ও কি আমার পোষায়? আচ্ছা ঠকিয়ে দিয়েছে মালাধর—

রঘুনাথ লাঠি ঠুকিয়া বলিল, তলে তলে ঐ বেটাই বরুণডাঙার সঙ্গে যোগাড়যন্ত্র করেছে। ওকে একটু শিখিয়ে দিতে হবে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, ছি-ছি! ছুঁচো মারতে যাবে কেন সর্দার? আমার ঘোড়া সাজাতে বল।

(৪)

চাঁদ উঠিয়াছে। পাথরে বাঁধানো সুবিস্তৃত অলিন্দ—শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় তাহারই উপর বড় বড় থামের ছায়া চিত্র-বিচিত্র ডোরা কাটিয়া দিয়াছে। গোলঘর, চণ্ডীকোঠা, রান্নাবাড়ি সমস্ত জনহীন। গম্ভীর আনত মুখে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নরহরি অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিছে পিছে আসিতেছিল রঘুনাথ ও আরও পাঁচ-সাত জন। হাত নাড়িতে তারা সব বিদায় হইয়া গেল।

ঠিক এইরকম সময়টায় এক একদিন নরহরি থামে ঠেশ দিয়া ডাকাতের বিলের দিকে অলস দৃষ্টি বিসারিত করিয়া তাকাইয়া থাকেন। ভাঙা জ্যোৎস্নায় বিলের সে এক জ্যোতির্ময় রূপ। এ রাত্রে বিলে পদ্মফুলের রাশি নজরে আসে না কিছুই। ওপারের দিকে যেখানে আজকাল ধানের আবাদ শুরু হইয়াছে—সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার মুখে চাষীরা শুকনা ধানের গোড়ায় আগুন ধরাইয়া দিয়া যায়, সমস্ত রাত ধরিয়া সেই আগুন লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়ায়।···রান্নাবাড়ির ঠিক হাত তুই-তিন নিচে দিয়া চিক্-চিক করিয়া নাককাটির খাল বহিয়া চলে, পাকা-ফলের লোভে দেবদারু-বনে বাদুড় পাখা ঝটপট করে, কেওড়া-চায়ার নিচে ডোঙায় ডোঙায় ঠক করিয়া একবার বা বাজিয়া ওঠে।···এপারে এক বিচিত্র রহস্যলোক, আর ওপারে সংখ্যাতীত অগ্নিকুণ্ড; মাঝখানে নিঃসীম জনশূন্য বিল জ্যোৎস্নায় দেহ এলাইয়া দিয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

ঝুমঝুম করিয়া মল বাজিয়া উঠিতে নরহরির সহাস্য-কঠোর মুখ স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী মেয়ে! অমনি ঝট নড়ে উঠেছে তো? কি করে টের পাস বল দিকি?

চোখ বড় বড় করিয়া সুবর্ণলতা কহিল, সত্যি বাবা, কালীর কিরে—আমি নই, বউদিদি—

কোথায় সে হারামজাদি ? সুবর্ণের হাসি-হাসি চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নরহরি পিছনে চাহিতেই বধূ দিল এক ছুট।

সুবর্ণলতার নালিশ চলিতে লাগিল, বউদিদি মহামিথ্যুক। শাখ বাজাচ্ছি পাশা দিয়ে, কে কত দম রাখতে পারে—বলল, ঐ দেখ্ নাককাটির খাল থেকে যক্ষি উঠে আসছে। সেই যেমন একবার উঠে দুধওয়ালীর নাক কেটে নিয়েছিল তেমনি।

নরহরি মেয়েকে আদর করিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, বোকা মেয়ে! অমনি তুমি ছুটে এলে ?

ছোট্ট মাথাটি সজোরে দুলাইয়া সুবর্ণলতা বলিল, যা রে—আমি না দেখে এসেছি বুঝি ? আলসের ফাঁকে তাকিয়ে দেখলাম, কালো মস্ত মস্ত ছায়ার মতো সব উঠে আসছে। এসে দেখি, সে সব কিছু না—তুমি, আর পিছনে তোমার ঢালিরা।

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মেয়ে লুটাইয়া পড়িল।

নরহরি বলিলেন, আচ্ছা মেয়ে তো! ভয় করল না ? যক্ষি দেখছি তোমও নাক কেটে নেবে একদিন।

বাপের আদরে কি যে করিবে, সুবর্ণ ঠিক করিতে পারে না। বলিল, চাঁপাফুল নেবে বাবা, খাসা স্বর্ণচাঁপা ? তুলে এনেছি। চক্ষের পলকে সে ছুটিয়া গেল। তখনই আবার আসিল। বলিল, ফুল নিচে রয়েছে। সুত্তোর— কি হবে ফুলে ? শুকিয়ে গেছে, ও ভাল না! তারপর বলিল, বাবা, বউদিদি কি করেছে জান সে দিন ? সে এক কাণ্ড।

হাত-মুখ নাড়িয়া সুবর্ণ বলিতে লাগিল, দুপুরবেলা। কেউ কোথাও নেই। আমি আর বউদিদি বড় খাটে ঘুমুচ্ছি। পায়ের শব্দে কি রকমে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, এদিক-ওদিক চেয়ে চোরের মতো দাদা ঘরে ঢুকছে—

অলিন্দের পাশে কক্ষের মধ্যে ঝিন-মিন করিয়া গহনা বাজিয়া উঠিল। নরহরি হাসিয়া বলিলেন, থাম্—থাম্ দিকি।

না, শোন বাবা। নাছোড়বান্দা সুবর্ণ বলিতে লাগিল, কি দুষ্টু বউদিদি,

শোন একবার! চুপচাপ শুয়ে ছিল, যেন কত ঘুমুচ্ছে! দাদা যেই এসেছে, চট করে অমনি উঠে দাঁড়াল। আমি চোখ মিটমিট করছি, দেখি কি করে! দাদা খাটের কাছে এসে বউদিদির মুখের কাছে মুখ নিয়ে—

নরহরি বলিলেন, রাত হয়েছে—এখন শুতে যাও মা। আর গল্প থাক।

সুবর্ণ না বলিয়া ছাড়িবেই না। বলিতে লাগিল, মুখের কাছে মুখ না নিয়ে দাদা বলল, আর কামরাঙা আছে ঘরে? বউদিদি ফিস-ফিস করে বলল, না।

নরহরি হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বলল নাকি?

কথা বিশ্বাস করিতেছে না ভাবিয়া সুবর্ণলতা ক্রুদ্ধভাবে আরও জোরে মাথা ঝাঁকাইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ বাবা, সত্যি—কালীর দিব্যি। বউদিদি বলল, আমি স্পষ্ট শুনলাম। তোমাদের সামনে কথা কয় না, ঘোমটা দিয়ে দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সেদিন বলেছিল, আমি শুনেছি।

নরহরি বলিলেন, বেশ করেছে। আর তাই লাগাতে এসেছ আমার কাছে? যক্ষিতে যদি নাক না-ও কাটে, আজকে বউমা ঠিক নাক কেটে নেবে তোমার।

সুবর্ণ কক্ষের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নির্ভীক কণ্ঠে বলিল, তোমার কাছে শোব তা হলে—

ওরে বাস্ রে! ভুল করে অন্ধকারে আমার নাকটাই যদি কাটা যায়?

সুবর্ণলতা কিন্তু হাসিল না, বড় বড় চোখ দু'টি মেলিয়া বাপের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। শেষে ধীরে ধীরে আগের কথাটাই আর একবার বলিল, আজকে আমি তোমার সঙ্গে শোব বাবা।

হু-হু করিয়া এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল। একটু পরেই উঠানে ঘোড়ার খুরের ধ্বনি। তীক্ষ্ণ চোখে নিচের দিকে চাহিয়া নরহরি সেই অলক্ষ্যের উদ্দেশে বলিলেন, ওখানে থাক ঘোড়া। চাঁদ ডুবে গেলে রওনা হব।

সকল আবদার এক মুহূর্তে বন্ধ হইয়া গেল। বাপকে সুবর্ণলতা ভাল করিয়া

জানে। এক-পা দু-পা করিয়া সে ফিরিয়া গেল। দোরের কাছে গিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল—লাজুক অপ্রতিভ ধরনের হাসি হাসিল—বলিল, তোমার সঙ্গে কালকে শোব বাবা। হ্যাঁ?

এই ডাকাতের বিল, মালঞ্চ নদী, নাককাটির খাল, শ্যামশরণের সুপ্রাচীন অমসৃণ পাথরের প্রাসাদ লইয়া সম্ভব অসম্ভব কত যে গল্প চলিয়াছে তার সীমা নাই। ছোট্ট মেয়ে স্বর্ণলতা—সৌদামিনী ও কীর্তিনারায়ণের কথা আবছা তার মনে আছে। বাড়ির মধ্যে তার সঙ্গে দুটো ভাল-মন্দ গল্প জমাইবার মানুষ এখন কেবল বউদিদি। আর কোন কোন দিন হাতে কাজ না থাকিলে, মনে তেমন কোন কাজের ভাবনা না থাকিলে নরহরি চৌধুরি উহাদের সঙ্গে ছেলেমানুষ হইয়া আসিয়া বসেন। কিন্তু সে-ও কালেভদ্রে কদাচিৎ। শ্যামকান্ত প্রায়ই বাড়ি থাকে না। আঠারো ক্রোশ দূরে দৌলতপুর গ্রাম, অনেক বিদ্বান লোকের বসতি, ইংরাজি-ইস্কুল আছে, চতুষ্পাঠি আছে, সেইখানে সে মানুষ হইতেছে। কত দূর কি হইতেছে, তার খোঁজ লইবার অবসর নরহরির বড় নাই। শ্যামকান্ত ছুটিতে দু-এক দিনের জন্য বাড়ি আসে, বিষয়-আশয় প্রজাপাটকের ব্যাপারে তার বড় উৎসাহ, বেশির ভাগ সময় বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া মেয়াদ অন্তে ফিরিয়া যায়। বধূ সরস্বতী আর মেয়ে স্বর্ণলতার মনের বাজনা হাসি-ঠাট্টার কলশব্দেই কেবল গম্ভীর বাড়িখানার মধ্যে সমস্তটা দিন গানের সুর বহিতে থাকে।

রাত্রে একেবারে পৃথক আর এক জগৎ—এই পাষাণ-গৃহের সে এক অপূর্ব রহস্যময় রূপ!

এক একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া স্বর্ণলতা অবাক হইয়া থাকে, হঠাৎ এ কোন নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছে সে! জ্যোৎস্না তেরছা হইয়া মেজেয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া শুইয়াই খণ্ড-চাঁদের খানিকটা দেখা যায়, খিলান-করা ছাতে কালো ছায়া স্তূপাকারে জমিয়াছে, বিস্তৃত মেহগ্নি-খাটের এক পাশে ঘুমন্ত সরস্বতীর চুল খুলিয়া গিয়াছে, শিথিল গৌর বাহুর উপর চুলের

রাশির উপর শাড়ির চওড়া পাড়ের উপর এখানে-সেখানে টুকরা টুকরা জ্যোৎস্না পড়িয়া সে যেন মায়ালোকের নূতন বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে, দিনের বেলাকার চেনা মানুষ সে বউদিদি আর নাই। উঠিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিকের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় করিতে ইচ্ছা করে। অপূর্ব অভাবিতপূর্ব সমস্ত। দিনের বেলাকার কোন-কিছুই মেলে না ইহাদের সঙ্গে। নাককাটির খালের জলের মধ্যে বগ-বগ করিয়া কত কি যেন এক একবার মাথা চাড়া দিয়া উঠে··· জল ছিটাইতে ছিটাইতে মাঝখান দিয়া কি যেন তীরবেগে ছুটিয়া চলে··· চাঁদাকাটার ঝাড়ের মধ্য দিয়া ঝির-ঝির করিয়া ডাঁটার জল ঝরিয়া পড়ে। আবার ওদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ডাকাতের বিলে দেখ, কত অনুপম সুন্দরী তরুণী বিল ঝাঁঝির মধ্য দিয়া চোখ চাহিয়া রহিয়াছে···হীরার আংটি হাতে সোনার মতো ঝকঝকে মুখ কত বড়মানুষের ছেলে···কত ছোট্ট শিশু জলতল হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ওঠে, মা—মা—মা···কচি মেয়ের পায়ে পায়ে জলতরঙ্গ মল বাজিয়া ওঠে···জলে বুদ্বুদ ওঠে, কারা ওখানে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া নাকানি-চুবানি খাইতেছে! বাদাম-বনে খড়-খড় করিয়া পাতা নড়ে, কারা যেন ঘুরিয়া বেড়ায়, চোখের তারা বাঘের মতো—অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া দিয়া তারা আগাইতেছে! ···বনঝোপের মধ্যে অজানা ফুল, শিশির-সিক্ত মাটি, সমস্ত মিলিয়া অদ্ভুত ধরনের এক মাদক গন্ধে সুবর্ণলতার চোখ আবার ঝিমাইয়া আসে।

সে রাত্রে সরস্বতীর সঙ্গে বড় খাটে শুইয়া ঘুমের মধ্যে সুবর্ণ শুনিতে পাইল, খট-খট করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া নরহরি চলিলেন। প্রাসাদ-সীমা শেষ হইয়া নরম মাটিতে ঘোড়ার খুর আর বাজে না, তবু তার কানে তালে তালে আরো অনেকক্ষণ ধরিয়া খুরের শব্দ বাজিতে লাগিল। শব্দহীন জগৎ, নির্নিমেষ নক্ষত্র-মণ্ডলী, তন্দ্রাচ্ছন্ন রাত্রি—সেই তন্দ্রার রাজ্য বিমথিত করিয়া ঘোড়া দূর হইতে কত দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে!

(৫)

সুন্দরবন বেশি দূর নয় ; এখান হইতে তিনটা ভাঁটি ও পো দেড়েক জোয়ার মাত্র লাগে। তাই শীতের ক'মাসে গোল আর মোম-মধুর নৌকার বড় ভিড়। ষ্টিমারও চলে দু-একখানা, তবে সে নিতান্তই শখ করিয়া। ধান-কাটার মরশুমে দুই পারের আবাদে বিস্তর বালিহাঁস আসিয়া পড়ে, হাঁস শিকারের লোভে বনকরের অফিসারেরা সেই সময়ে কখন কখন ষ্টিমার ঘুরাইয়া এই পথে আসেন। মরা-গোনের সময় জল মরিয়া গিয়া দু-চার জায়গায় বালির চড়া জাগিয়া ওঠে, ষ্টিমারের সাধারণ পথ তাই এ নদী দিয়া নয়—সেই মাথাভাঙার দিক দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া যায়। এ অঞ্চলের লোক আঁধার রাতে সার্চ-লাইটের আলো দেখিতে পায় মাত্র।

অমনি একখানা শখের ষ্টিমার সম্প্রতি গাঙে আসিয়াছে, হুস-হুস শব্দে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়াইয়া ভাঁটায় আগাইয়া জোয়ারে পিছাইয়া সমস্ত দিনে গড়ে হাত কুড়িক করিয়া চলে। ডেকের উপর চেয়ার পাতিয়া বসিয়া একটা লোক মাঝে মাঝে চা-বিস্কুট ও কমলালেবু খান। লোকটি সাহেব—টুপি-পরা সাহেব, ঠিক যেমনটি হইতে হয়। উড়ন্ত বকের ঝাঁক দেখিলে খাওয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ বন্দুকে তাক করেন। গুড়ুম-গুড়ুম করিয়া গুলি-বৃষ্টি হয়। বকের অবশ্য কিছু-মাত্র ক্ষতি হয় না তাহাতে। নির্বিঘ্নে তারা দৃষ্টিসীমা পার হইয়া গেলে সাহেব নিশ্চিন্ত চিত্তে পুনরায় প্লেট টানিয়া লইয়া বসেন।

তীরের লোকগুলা কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কে-একজন রটাইল, সুন্দরবনে যাইবার লোক ইহারা নয়—এ সব জল-পুলিস। সম্প্রতি খুব বাড়াবাড়ি লাগাইয়াছে ইহারা—কোম্পানি বাহাদুরের আবার টনক নড়িয়াছে, চালিপাড়ায় নজর দিতে চর আসিয়াছে, শিকার-টিকার সব মিছা কথা। গতিক দেখিয়া সন্দেহ হইবার কথাই বটে! ষ্টিমারের লোকেরা ষ্টিমারের সঙ্গে যদি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া থাকে তো

আলাদা কথা—নহিলে বর্তমান পুরুষে তো সুন্দরবনের ত্রিসীমানায় কারো পৌঁছিবার কথা নয়। এবং দলের বড়কর্তা সেই সাহেবটি হইতে শুরু করিয়া তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা—বন্দুকে সকলেরই হাত এমন সাফাই যে এই বিদ্যার বালাই লইয়া ষ্টিমারে উঁহারা সব শিকারে আসিয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করা অতি শক্ত। ব্যাপার যা-ই হোক, ঢালিপাড়া কিন্তু অকস্মাৎ একেবারে শিষ্টশান্ত হইয়া গেল।

এ ক'দিন ষ্টিমার একটু-আধটু তবু যা হোক নড়াচড়া করিতেছিল, সে দিন দুপুর হইতে একদম নিশ্চল হইয়া বসিল। ভোঁ-ভোঁ করিয়া অনবরত বাঁশি বাজিতেছে। কাণ্ডটা কি? ঢালিপাড়ার যে যেখানে ছিল গাঙের ধারে আসিয়া জুটিল। অল্প অল্প ভাঁটার টান ধরিয়াছে, লোক দেখিয়া খালাসিরা চেঁচাইতে লাগিল। দু-গাছা কাছি তীরের দিকে ছুঁড়িয়া চেঁচাইয়া বলিল, ধর সবাই মিলে; টেনে দাও—কসে টানো তোমরা একটু। কাছির আগা তীর অবধি পৌঁছিল না, জলে পড়িল। রঘুনাথ ইহাদের মধ্যে নাই, জরুরী ডাক পাইয়া সকালবেলা চৌধুরি-বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, এখনো ফিরে নাই। কাজেই সকলে ভানুচাঁদের দিকে তাকাইল। ভানুচাঁদ মুখ ঝাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, কাছি টানতে বলছে কি—কি বলছে বেটারা, শুনতে পাচ্ছি নাকি আমরা কিছু? চুপ করে থাক, যে যেমন আছ।

একজনে ওরই মধ্যে বেশি বিচক্ষণ—সে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। ভানু-চাঁদের বয়স কম, একটা কোন মজার নামে লাফাইয়া ওঠে। রঘুনাথ না থাকায় আজ একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে। লোকটি তীরের জনতা দেখাইয়া কহিল, তা হলে বাপু, তাড়িয়ে দিই এদের। একেবারে পাড়া ভেঙে এসেছে—শেষকালে রেগে-টেগে যাবে ওরা? বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া ষ্টিমার এবং বিশেষ করিয়া সাহেবকে দেখাইল।

ভানুচাঁদ হাসিয়া খুন। বলিল, রাগে রাগুক। ডাঙায় এসে উঠতে হবে না আর। চড়ায় আটকে গেছে—হি—হি—হি। গাঙ সাঁতরে আসবে নাকি? আসে যদি—

যদি বন্দুক মারে?

যেমন বক মেরে থাকে ?

আর এক দফা হাসাহাসি চলিল।

বিকাল হইয়া আসিল। ভাঁটায় জল সরিয়া গিয়া নদীগর্ভ নিকানো আঙিনার মতো তকতক করিতেছে। হঠাৎ দেখা গেল, সাহেব বুট পরিয়া বন্দুক হাতে বীরবিক্রমে কাদায় নামিতেছেন। সঙ্গে পাঁচ-সাত জন লোক— কেউ গুলির বাক্স লইয়াছে, কেউ তারের খাঁচা। ছুরি কাঁটা এবং আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলোও সঙ্গে চলিয়াছে। অর্থাৎ ব্যাপার সহজ নয়। এইবার সাহেব শিকার করিতে ভূতলে নামিলেন। সঙ্গের লোকেরা কখনো আড়কোলা করিয়া, কখনো বা হাত পা গলা মাথা যে যেখানে পারিল ধরিয়া টানাটানি করিয়া কায়ক্লেশে সাহেবকে কূলে আনিয়া হাজির করিল। ততক্ষণে সেখানে আর কেহ নাই—একা ভানুচাঁদ কেবল অবাক হইয়া দেখিতেছিল, এত কষ্টের মধ্যেও সাহেব হাতের বন্দুক, মুখের গালি—কোনটাই ছাড়েন নাই। ভানু-চাঁদের সঙ্গেও একবার চোখাচোখি হইয়া গেল। কিন্তু সাহেব শুধু কটমট করিয়া তাকাইলেন, কিছু বলিলেন না। তারপর ঐ বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে ডজনখানেক কমলালেবু উড়াইয়া সাহেব কিছু ঠাণ্ডা হইলেন। সঙ্গের লোকেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। খোসা স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিল।

শিকারীর দল অবশেষে বাদায় নামিল।

এ হেন ব্যাপারে শেষ না দেখিয়া কোন মতেই ফেরা যায় না। ভানুচাঁদ পিছনে পিছনে চলিয়াছে। হঠাৎ কিন্তু রসভঙ্গ ঘটিয়া গেল। সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভানুচাঁদের দিকে তাকাইয়া আরদালিকে কি বলিয়া দিলেন। আরদালি আসিয়া কহিল, কি সাঙাৎ, যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

সেই সুরেই ভানুচাঁদ জবাব দিল, বুকের ওপর দিয়ে হাঁটছি না তো ? অত ব্যথা লাগছে কেন ? জমিদারের জায়গা—আমারও না, কারো বাবারও না।

ইহার ঠিকমতো জবাব দিতে গেলে পাখীর সন্ধান স্থগিত রাখিয়া ঐখানেই মল্লযুদ্ধ ফিরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সাহেব বোধকরি কথাবার্তা কিছুই শুনিতে পান

নাই, গজেন্দ্রগতিতে তিনি আগাইয়া চলিলেন। ভাম্বুচাঁদের পেশীবহুল লম্বা চওড়া দেহখানির দিকে তাকাইয়া আরদালিও আপাতত ক্ষমা করিয়া যাওয়া সমীচীন মনে করিল। সুর সপ্তম হইতে একেবারে খাদে নামিয়া আসিল। বলিল, যাও দাদা, তুমি চলে যাও। বাজে লোক সঙ্গে নিই নে আমরা। গোলমাল করে পাখী তাড়িয়ে দেয়।

ভাম্বুচাঁদ বলিল, সে তো তোমরাই খুব পারবে! আমি তাড়াব না—দুটো-একটা মারব। আচ্ছা পূবমুখোই চললাম তবে—তোমরা ঐ-দিকে যাও। ঠিক-ঠাক বন্দুক মেরো ভাই, আমার ওদিকটায় উড়ে যায় যাতে—

হাসিয়া একাকী সে মোড় ঘুরিল। যাইবার মুখে বাড়ি হইয়া গুরোল-বাঁশটা লইয়া গেল।

দলবল ফিরিয়া আসিয়া আবার যখন বাঁধের উপর উঠিল, তখন বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে। আয়োজন একেবারে নিরর্থক হয় নাই, তাদের খাঁচায় একটা মরা কাক। বাঁধের ধারে একটা টিপয় পড়িয়াছে, স্টিমারে উঠিতে আবার এখনি কাদায় পড়িতে হইবে, গোধূলির আলোটুকু থাকিতে থাকিতে সাহেব তাড়াতাড়ি তাই দু-হাতে মুখের মধ্যে রসদ বোঝাই করিতেছেন। হঠাৎ ওদিকে ভাম্বুচাঁদ আসিয়া উঠিল। গান করিয়া হাসিয়া গুরোল-বাঁশ নাচাইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, এ হল দেশি বন্দুক—দেখ, ভাই সব। পোড়া মাটির গুলি—কার নাক ভাঙব বল? মন্তোর পড়ে ছাড়ব—চলে যাবে বোঁ-ও-ও-ও—

গর্ব করবার কথাই বটে। দড়ি দিয়া গোটা কুড়িক বুনো-হাঁসের পা বাঁধিয়া আনিয়াছে—কতকগুলি মরে নাই তখনো। তারই দু-তিনটা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিতে সাহেব চমকিয়া তাকাইয়া দেখিলেন। খাওয়া তখন প্রায় সমাধা হইয়াছে। আগাইয়া আসিয়া সাহেব বলিলেন, হাসিস কেন?

ভাম্বুচাঁদ ভালোমানুষের মতো কহিল, ঐ কাকটা কি মরে পড়ে ছিল, না হুজুর মেরেছেন?

সে কথার উচ্চবাচ্য না করিয়া সাহেব বলিলেন, তোর ঐ পাখীগুলো দিয়ে দে।

কেন ?

একজনে ইঙ্গিতে ভাস্থচাঁদকে কাছে ডাকিয়া কহিল, বড্ড ভাল সাহেব রে ? টাকা পাবি। দিয়ে দে—

ভাস্থচাঁদ কহিল, টাকা কি হবে ? চৌধুরির খাই, কাঁসি বাজাই—টাকা চাই নে।

আরদালির সঙ্গে পরিচয় সকলের আগে। বোধকরি সেই সুবাদেই সে আরও তিন-চার জনকে লইয়া ভাস্থচাঁদকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। বলিতে লাগিল, পাখী ক'টা দাও ভাই। ষ্টিমারে সারেং-খালাসি সব বেটা হা-পিত্যেশ বসে বসে পথ তাকাচ্ছে। হুজুর বলে এসেছিলেন সবাইকে, রাত্রে গোস্ত হবে।

সাহেবও বেশি দূরে ছিলেন না, সমস্তই কানে যাইতেছিল। কালো রঙের সাহেব, অতএব কথা বুঝিতেও কিছু কষ্ট হয় না। অনেকটা আপনার ভাবেই বলিলেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার ! একটা পাখী আজ আমাদের ওদিকে ছিল না। ঐ কাকটা কেবল। নইলে কি আর—

অনেক বলাবলিতে ভাস্থচাঁদের বোধকরি অবশেষে করুণা হইল। আচ্ছা—বলিয়া সে পাখীর দড়ি খুলিতে বসিল। একজনে ছুটিয়া গিয়া তাদের খাঁচাটা টানিয়া আনিল। সাহেব শিস দিতে দিতে গুলির বাক্সে চাবি আঁটিতে লাগিলেন। আর একজনে উপদেশ দিল, একটা করে খোল ভাই। এমনি সময়ে হঠাৎ ভাস্থচাঁদ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া যেন নৃত্য শুরু করিল।

উড়ে গেল, ইস—সমস্ত উড়ে গেল যে !

তারপর মিনিটখানেক শূন্য পানে সে এমনি ভাবে তাকাইয়া রহিল, মাথায় যেন তার বাজ পড়িয়াছে বা অমনি একটা কিছু। হাতে তখন সত্যই একটা পাখীও নাই। উড়িয়াছে বটে। নিতান্ত যেগুলা মরিয়া গিয়াছিল, উড়িতে উড়িতে সেগুলা টুপ করিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। জ্যান্তগুলা সাদা পাখা নাড়িতে নাড়িতে নদীপারে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। দাঁত বাহির করিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাস্থচাঁদ হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইহার পর সাহেবের আর ধৈর্য রহিল না, বজ্রগর্জন করিয়া উঠিলেন, রাগের বশে ইংরাজি বাংলার বাছ-বিচার রহিল না। চালাকি পেয়েছিস, ইউ গাধা রাস্কেল? ধরে আন্ ওটাকে—ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখে নি—

চিৎকার-গোলমালের মাঝখানে একে দুয়ে দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে দশ-বারো জন ঢালি ভাস্তুচাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁধের এদিকে-ওদিকে কাছাকাছি কোথাও উহারা ছিল নিশ্চয়। সাহেব চিৎকার করিতে লাগিলেন, কে আছিস, নিয়ে আয় আমার চাবুকটা ষ্টিমার থেকে। আর বেঁধে কাছে নিয়ে আয় ঐ বেটাকে এক্ষুণি—

চাবুক আনিতে সকলেরই উৎসাহ। চক্ষের পলকে পাঁচ-সাত জনে কাদা ভাঙিয়া ষ্টিমারে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু বাঁধিয়া আনারই লোকাভাব। যে রকম মালকোঁচা আঁটিয়া গুয়োল-বাঁশ হাতে সারবন্দি সব দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে সকলেই সকলকে বিপুল উৎসাহে আগে ঠেলিয়া দেয়, নিজে কেহ আগাইতে চায় না। সাহেবের গর্জন সমভাবে চলিতে লাগিল, বন্দুক ঠুকিতে ঠুকিতে বাঁধের মাটি এক বিঘৎ বসিয়া গেল, অথচ আসামি নিতান্ত যদি নিজে হাত-পা বাঁধিয়া হাজির না হয়, তাহাকে আনিবার কোন ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত হইয়া উঠিল না।

অনেক ঠেলাঠেলি তর্কাতর্কি পরামর্শের পর সকলে পিছাইয়া একেবারে গাঙের ধারে চলিয়া আসিল।

সাহেব গর্জন করিয়া বলিলেন, কি?

একজনে কহিল, বড্ড শাসাচ্ছে হুজুর, গাঙের জলে চুবিয়ে দেবে। সন্ধ্যাবেলা, শীতের দিন—

আর একজনে বলিল, চাবুক-টাবুক নয় হুজুর। যে ক'টা বন্দুক আছে, সব নিয়ে আসতে হুকুম দিন। ডাকাত-দুশমন এরা—পদ্মপালের দল। এই ফাঁকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও সমস্ত চালাকি কথা নয়।

হুজুর হুকুম দিলেন, আনো সবগুলো বন্দুক।

যে আজ্ঞে—বলিয়া তৎক্ষণাৎ আর একদল বন্দুক আনিতে ষ্টিমারে উঠিল।

তাদের দেরি হইতেছে বলিয়া আর একদফায় আরও ক'জন। হঠাৎ ভাঙ্গটার ও ঢালিরা হো-হো করিয়া হাসিয়া প্রান্তর-নদীকূল হাসিতে তরঙ্গিত করিয়া বাঁধ বহিয়া ধীরে ধীরে পাড়ার দিকে ফিরিয়া চলিল। সাহেবের হাতের বন্দুক যেমন ছিল তেমনি রহিল—পিছনে তাকাইয়া দেখেন, বন্দুক আনিতে একে একে সকলেই ষ্টিমারে গিয়া উঠিয়াছে; তিনিই কেবল একা। অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। একদম কারো সাড়াশব্দ নাই। বিরক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, সরলি নাকি সব ?

ষ্টিমার হইতে জবাব আসিল, না।

সাহেব কৃতার্থ হইয়া কহিলেন, তা হলে বিছানা পেতে ঘুম হচ্ছে নাকি ?

ইহারও বিনীত জবাব আসিল, আজ্ঞে না। একটু আহারাদি হচ্ছে।

রাত্রি প্রহরখানেক হইয়া গেল, কিন্তু একটু আহারাদি চলিতেই লাগিল, শেষ হইবার নাম নাই। নদীকূলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাহেবের শীত ধরিয়া গিয়াছে। অধীর কণ্ঠে অবশেষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিচ্ছিস বেটারা ?

আজ্ঞে না। সামান্য।

জোয়ার এসে গেল যে !

কথাটা সত্য কি না পরখ করিতে একজন রেলিঙ দিয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল। উচ্ছল তরঙ্গ প্রায় বাঁধের ধার অবধি ভরিয়া তুলিয়াছে, ষ্টিমার তরঙ্গের আঘাতে অল্প অল্প দুলিতেছে। খুশি হইয়া লোকটি বলিতে লাগিল, তবে তো সুবিধে হল হুজুর, জাহাজ ভেসে উঠেছে। একেবারে ডাঙার ধারে লাগাব। উঠা-নামার আর অসুবিধে হবে না। এই এলাম আমরা।

টুলে বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে কোন সময়ে সারেঙের একটু ঘুম আসিয়া গিয়াছে। সাহেবের চেঁচামেচিতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভোঁ-ভোঁ করিয়া বাঁশী বাজাইল। সুতীব্র আলো পড়িল জলের উপর। একবার ডাহিনে একবার বা বামে ঘুরাইয়া আগাইয়া পিছাইয়া অনেক কষ্টে অনেক যত্নে অবশেষে ষ্টিমার যখন কূলের কাছাকাছি আসিল, তক্তা ফেলিয়া দিতে সাহেব আর দৃক্‌পাত

না করিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া একেবারে চিমনির ধারে চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। শীতের হাওয়া দিতেছিল। সাহেব ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন পর্দা ফেলিতে। যাহাকে বলা হইল, সে করিৎকর্মা লোক—কেবলমাত্র পর্দা ফেলিল না, কেবিনে পুরু করিয়া বিছানাটাও পাতিয়া দিল।

কত রাত্রি তার হিসাব নাই, নদীর উপর ষ্টিমার পর্দা মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। চারিদিক নিষুপ্ত, ইঞ্জিনের ষ্টিমে যেন একটা অতিকায় ঘুমন্ত জন্তুর নিশ্বাসের শব্দ হইতেছে। একজন খালাসি নিচের ডেকে শুইয়া শুইয়া নাক ডাকিতেছিল, হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। কোথায় যেন ইঁদুর নড়িতেছে। খড়-খড় করিয়া পাতা-লতার বোঝা ঠেলিয়া ইঁদুরের মতো কি একটা বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। তারপর খেয়াল হইল, বাড়িঘর তো নয়, ষ্টিমারে ইঁদুর আসিবে কোথা হইতে? সজাগ হইয়া চোখ বুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল। শব্দ শুনিল—স্পষ্ট খস-খস শব্দ—শিয়রের দিকে, খানিকটা ওধারে। ষ্টিমারে লণ্ঠন আছে পাঁচ-সাতটা। এদিকটাতেও পোস্টের সঙ্গে একটা বাঁধা আছে বটে, কিন্তু ঝুল-কালিতে তার এমন অবস্থা যে আলোর চেয়ে সেটা আঁধারই বাড়াইয়াছে বেশি। হঠাৎ জলের মধ্যে একটা ভারী বোঝা পড়িয়া যাওয়ার মতো শব্দ হইল, লাফাইয়া উঠিয়া পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া সে দেখে, কুয়াসাময় জ্যোৎস্নায় ভরা-জোয়ারে একখানা নৌকা ষ্টিমারের গা ঘেঁসিয়া দ্রুত পলাইয়া যাইতেছে। চকিতে অমনি একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি আগাইতে গিয়া কমলালেবু পায়ে ঠেকিতে লাগিল, পায়ের আঘাতে কতকগুলো জলে ছিটকাইয়া পড়িল, কতকগুলো পায়ে পায়ে চেপ্টা হইয়া গেল। আলো খুলিয়া আনিয়া বিস্তর কষ্টে ঠাহর করিয়া দেখে, যা ভাবা গিয়াছিল তাই, নৌকা যে চুপি-চুপি আসিয়া কেবল ষ্টিমার দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে তাহা নয়, সাহেবের বাছাই-করা গণিয়া-রাখা লেবুর দুটো ঝুড়িই অন্তর্ধান করিয়াছে—আর কি কি গিয়াছে ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া দেখিতে হয়। মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল, আরও লণ্ঠন জ্বলিল, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হইতে লাগিল। সাহেব ট্রাউজারের

ফিস্তা করিতে করিতে ঘুমচোখে ছুটিয়া আসিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া ঘুম তো উড়িয়া গেল চক্ষের পলকে, সাহেব গুম হইয়া রহিলেন, পাঁচ-সাত মিনিট কথা বলিতে পারিলেন না। তারপর হুকার দিয়া উঠিলেন, ওঠো—চল সব—

উঠিতে তো কারো বাকি নাই, কিন্তু চলিতে বলিলেই চলা—এই শীতের রাত্রে সেটা বড় সহজ কথা নয়। পর্দার একটু কোণ তুলিয়া দেখিতে গিয়া হাড়ের মধ্য অবধি কনকন করিয়া ওঠে, এ অবস্থায় চোর ধরার চেয়ে কম্বল জড়াইয়া আবার শুইয়া পড়িতে সকলের উৎসাহ বেশি। নৌকা দৃষ্টিসীমার একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সাহেবের বোধ করি মনে মনে তখনও আশা, চোরের দু-হাত যখন নৌকা বাহিবার কাজে ব্যস্ত, তখন ঝুড়ি শেষ করিয়া ফেলিবার ফাঁক এখনো হাত দু-খানার হয় নাই। অতএব সেই ফাঁক পাইবার আগেই গিয়া পড়িতে পারিলে কাল সকালবেলা এই লোনা জলের দেশে আর যাই হোক একেবারে নির্জলা উপবাস করিয়া মরিতে হইবে না। তাড়াতাড়ি কোন গতিকে সজ্জা সমাপন করিয়া সকলের আগে তিনি কূলে নামিয়া দাঁড়াইলেন।

কাজেই ওদিকেও সমারোহে তোড়জোড় আরম্ভ হইল। নৈশ শীত-বায়ুতে সাহেব একাকী ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে শুরু করিয়াছেন, চেঁচাইয়া জোর দেখাইবার মতো অবস্থাও আর নাই। শেষ পর্যন্ত আবার সিঁড়ি বহিয়া উঠিয়া একটা একটা করিয়া হাত ধরিয়া সকলকে নামাইতে হইবে কিনা ভাবিতেছেন, এমনি সময় হাতিয়ার-পত্র লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গেরা হুড়মুড় করিয়া বীরবিক্রমে নামিয়া আসিল।

কোন দিকে তিলমাত্র সাড়াশব্দ নাই, নির্জন অস্পষ্ট জ্যোৎস্না থমথম করিতেছে। ক্রমে চালিশাড়ার কাছাকাছি আসিয়া তারা আলোর ধারে সারবন্দি দাঁড়াইল। বাবলাবনে অজস্র জোনাকি ঝিকমিক করিতেছে। পিছনের একজন আগে আসিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে হুজুর ?

চলিতে চলিতে দেহ ইতিমধ্যে একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সাহেব ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, নেমন্তন্ন খেতে।

লোকটি বলিল, আজ্ঞে না, খাওয়াতে—সে বুঝেছি। কিন্তু কথাটা বুঝে দেখুন হুজুর। রাত্রিবেলা। কে কি রকম মানুষ—একেবারে পাড়াসুদ্ধ ঘাঁটা দেওয়া—বুঝে দেখুন কথাটা—তার চেয়ে কাল সকালে বরং—

সাহেব বলিলেন, বলেছ ভাল। তবে এক কাজ কর। চর হয়ে তুমি বরং দেখে এস। আমরা দাঁড়াই এখানে।

লোকটার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, এমন জানিলে হিতোপদেশ দিতে কদাপি আসিত না। দশজনের পরামর্শ মতোই সে মুখপাত্র হইয়া আসিয়াছিল। উদ্দেশ্য, চোর ধরাটা এইভাবে আপাতত স্থগিত হইয়া যাইবে। উল্টো-উৎপত্তি হইয়া বসিতে সে হতভম্বের ভাবে পিছনে সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া রহিল। রাত্রে ভাল মুখ দেখা যায় না, কিন্তু সাহেবের কথাবার্তা একটুকুও যে আর কারো কানে গিয়াছে ভাবভঙ্গিতে এমন মনে হইল না। সহযাত্রী হইতে কেহই আগাইল না, একটা মুখের কথাও কেহ বলিল না।

সাহেব পুনশ্চ বলিলেন, সেই ভাল হে। তুমি চলে যাও, চুপি-চুপি সন্ধান নিয়ে এস। বুঝে দেখলাম বটে, সমস্ত পাড়া ঘাঁটানো ঠিক নয়।

বোধকরি আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রকেই সাক্ষী করিয়া লোকটা তখন করুণ মুখে অগ্রসর হইল। সাহেব পিছন হইতে বলিলেন, ফিরো কিন্তু—ডুব দিয়ে বোসো না। দাঁড়িয়ে রইলাম—

দুর্গা! দুর্গা! ও কি কথা?

সে মনে মনে যা করিতে করিতে গেল সেটা প্রকাশ করিয়া বলার কথা নয়। কিন্তু ফিরিয়া আসিল অনতিপরেই। উৎফুল্ল স্বর।

ফিস-ফিস করিয়া কহিল, আসুন। গুড়ি মারিয়া সে আগে আগে চলিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, গিয়েছিলে তো সত্যি সত্যি?

এই দেখুনসে এসে—বলিয়া রাগের বসে ধাঁ করিয়া লোকটি পাশের উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়া কি কতকগুলা তুলিয়া আনিল। লণ্ঠন ধরিয়া দেখা গেল, লেবুর খোসা।

চোরেরা বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই, বমাল বোধ করি শেষ করিয়াই রাখিয়াছে,

হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলার উপায় রাখে নাই। দারুণ আক্রোশে সদলবলে সাহেব সেই উঠানে গিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ হইতেই একটা একটানা আওয়াজ আসিতেছিল, যেন বিশ-পঁচিশটা কামারশালে হাপর টানিতেছে। উঠানে যাইতেই সেটা আরো প্রবল হইয়া কানে যাইতে লাগিল। নজর করিয়া দেখা গেল, হাপর নয়—নাক। খোলা দাওয়ায় মাদুরের উপর মরদগুলা পাহাড়ের মতো পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সেই পাহাড়ের নাসারন্ধ্র দিয়া যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে। সাহেব বন্দুকের ঘোড়া টিপিলেন, নিশীথ রাত্রে নদীকূলে সেই আওয়াজ ধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। লোকগুলা কিন্তু পাশ ফিরিয়া শুইল না।

বন্দুকে হইল না—ইহার পর একটিমাত্র উপায়, বন্দুকের কুঁদা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা। বোধ করি তারও অন্যথা হইত না, সাহেব একেবারে মরীয়া—কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একটি দীর্ঘ ছায়ামূর্তি রাস্তা হইতে ছুটাছুটি করিয়া একেবারে উহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব হাঁকিলেন, খাড়া রও—

লোকটি হুকুম মান্য করিল ; ঘাড় নিচু করিয়া সেলাম করিল।

তুমি কে ?

লোকটি বলিল, সর্দার। আমি বাড়ি ছিলাম না। ছোঁড়াগুলো গোলমাল করেছে নাকি কর্তা ?

দলের সর্দার সামনে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, সাহেব মনে মনে ভারি ফুর্তি করিয়া রঘুনাথকে ডাক করিয়া বন্দুক উঠাইলেন।

রঘুনাথ একেবারে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মারবেন না কর্তা। একদম মরে যাব। রক্ষে করুন।

সাহেব অটল। বন্দুক তেমনি ধরাই আছে। দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

চোর তোরা সব—

আজ্ঞে না, কক্ষণো না। আমরা বুঝি নে কিছু। দোষদিষ্টি মাপ করুন—নাবালক আমরা।

চাঁদের মৃদু আলো, তার উপর গোটা দুই-তিন লণ্ঠনের আলো রঘুনাথের কাঁচাপাকা দাড়ির উপর আসিয়া পড়িল। নাবালকের কথায় সাহেবের লোকজন সকলে হাসিয়াই খুন। ইহার পর বন্দুক দেখাইয়া কি হইবে! হাত নামাইয়া হাসিমুখে সাহেব বলিলেন, তা সত্যি, দাড়ি দেখে নাবালক বলেই ঠেকছে বটে! মারব না তোকে। আচ্ছা ঐগুলোকে তোল—দেখি, ওরাই বা কি?

রঘুনাথ শেষের কথায় মনোযোগ না দিয়া দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল, আজ্ঞে, এ দাড়ি কিন্তু আমার নয়—

কার?

কালী করালীর।

এবারে হাসির তুমুল রোল উঠিল। সাহেব অনেক কষ্টে হাসি সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কালী করালীর দাড়ি উঠল কবে?

রঘুনাথ কিন্তু হাসি-ঠাট্টার ধার দিয়াও গেল না; গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল, ওপারে বরণডাঙায় মস্ত এক ওস্তাদ আছে—চিন্তামণি। তার সঙ্গে একবার শখের খেলা খেলতে গিয়েছিলাম। মেরে ভূত ভাগিয়ে দিল। শিবনারায়ণ ঘোষ আর চৌধুরি মশায় দু-জনে বড় ঠাট্টা করলেন। কালীমায়ের নামে মানত করে সেইদিন চুল-দাড়ি রাখলাম। মা দিন দেন তো চিন্তামণিকে হারিয়ে দিয়ে চুল-দাড়ি তাঁর পায়ে নামিয়ে আসব একদিন।

একজনে টিপ্পনী কাটিল, আজকে যা নমুনা দেখলাম, সর্দার, ও দাড়ির আশা কালীমায়ের কোনকালে নেই।

নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া একগাল হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, আজ্ঞে, আমারও এর পরে বড্ড মায়া—

হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে একটা মাদুর আনিয়া বলিল, বসুন কর্তা। তামাক সাজব?

এত আপ্যায়নেও সাহেব বসিলেন না। বলিলেন, না—ডাক্ ওদের।

ষ্টিমারে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে নাকি?

হ্যাঁ। আর আমার সেই নেবুর ঝুড়ি দুটো। সেই সঙ্গে আর যা যা নিয়ে এসেছ। সাহেব বলিতে লাগিলেন, এই যদি করে তো ভাল, নইলে তোমার কোন চালাকিতে ভুলছি নে।

রঘুনাথ জিভ কাটিল। বলেন কি কর্তা? চালাকি করলাম কখন? কিন্তু ওরা তো সে রকম ছেলে নয়। কর্তার জিনিষপত্তোর আর কারা নিয়ে গিয়েছে। আপনারা ভুল করে এ-পাড়ায় এসেছেন।

আর এগুলোও ভুল করে এসেছে নাকি? যে লোকটাকে কপালক্রমে চর হইতে হইয়াছিল, জ্যোৎস্নার আলোয় আঙুল দিয়া সে উঠানের পাশে দেখাইয়া দিল।

তবু রঘুনাথ তর্ক ছাড়ে না। ও খোসা—নেবু তো নয়। আপনি একবার বুঝে দেখুন কর্তা।

এমন সময় ভানুচাঁদ হঠাৎ দাওয়ার উপর পাশমোড়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

গোলমাল কিসের?

রঘুনাথ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।

হারামজাদা, খোসা কুড়িয়ে এনে উঠোনে রেখে এখন নাকে-তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিস। দিল যে এদিকে সাবাড় করে।

ভানুচাঁদ দাওয়া হইতে লাফাইয়া উঠানে পড়িল। রঘুনাথ বলিতে লাগিল, নেবু আনিস নি তা জানি, কিন্তু খোসাই বা আনতে গেলি কেন? পানের মশলা হবে? ও-ও তো কর্তার। ধর্, পায়ে ধর্—তা হলে দয়াময়ের রাগ পড়ে যাবে—

ভানুচাঁদ বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল, তাই ধরতে দেবে সাহেব? দেবে নাকি! তা একা তো নই। দলবল ডাকি? আয়রে জিতু, ভোলা, মহেশ—চলে আয় পা ধরতে।

হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ভূতের মতো একের পর এক ছায়ামূর্তি হঠাৎ দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। তারপর আনাচ-কানাচ হইতে আরও অনেকে ছুটিয়া আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইতে লাগিল। ভানুচাঁদ হাসিতে হাসিতে

বলিল, এস সর্দার, তুমি ধরবে সাহেবের ডান ঠ্যাং আর আমি বাঁয়েরটা। দেখা যাক টেনে, গায়ের বল কার বেশি—তোমার না আমার। আর তোরা যা ঐ নন্দীভৃঙ্গীগুলোর দিকে। দু-দু'জনে এক একটাকে নিয়ে পড়।

যে কথা সেই কাজ। তে-রে-রে করিয়া শক্তিমান জোয়ানগুলা লাফাইতে লাফাইতে পা ধরিতে আসিল। সাহেব আর দিশা না পাইয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিন জনে ছুঁড়িল। বাবলাবনে কয়েকটা পাখী জাগিয়া উঠিয়া কিচমিচ করিয়া উঠিল।

ও বাবা গো—বলিয়া রঘুনাথও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

বিস্মিত, নিশ্চেতন পাথরের মতো ঢালিরা। ছুটিয়া আসিয়া সকলে রঘুনাথকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর ক্রন্দনাকুল শত কণ্ঠ নৈশ বাতাসে ধ্বনিত হইতে লাগিল, সর্দার! সর্দার!

সাহেবও হতভম্ব হইয়া গেছেন। পিছনের লোকেরা অবাক্। ভীত বিপন্ন দৃষ্টিতে সাহেব তাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কে ছর্‌রা দিয়েছিসি? ফাঁকা দেওড় করবার কথা ছিল না?

তাই তো হয়েছে।

ছাই হয়েছে। সহসা গভীর গর্জনে সাহেব চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সর্দারের চারিপাশে ভিড় করিয়া যারা দাঁড়াইয়া বসিয়া ছিল, সকলের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া ভানুচাঁদ বলিয়া উঠিল, তোমরা থাক এখানে—সর্দার মরছে। কিন্তু যারা মারল ওকে, আমি তাদের সঙ্গে মোলাকাৎটা সেরে আসি।

লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া সে সাহেবের দলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়। রঘুনাথের জ্ঞান ছিল, সে ভানুর হাত ধরিয়া ফেলিল। ক্ষীণ কণ্ঠে মানা করিতে লাগিল, যাস নে রে ভানুচাঁদ, আমার কথা শোন্—যাস নে।

ভানুচাঁদ মাথার ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, ভয় নেই—তোমার জ্ঞান থাকতে থাকতেই ফিরে আসব। মরবার সময় খানিক হেসে মরতে পারবে সর্দার। আমি আসি—হাত ছাড়—

রঘুনাথ হাত ছাড়িল না। বলিতে লাগিল, তোরা বাবারা নিমিত্তের ভাগী

হতে যাস নে, আমার শেষ-কথাটা শোন। নির্দোষীকে খুন করে গেল, ওদের ফাঁসি হবেই। কোম্পানির রাজত্বে নিস্তার নেই কোন রকমে।

ভানুচাঁদ হাত ছাড়াইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু মরিতে বসিয়াও রঘুনাথের গায়ের বল কম নয়। আবার মুমূর্ষুর গায়ে কোনক্রমে ব্যথা না লাগে—অধীর কণ্ঠে ভানুচাঁদ কহিতে লাগিল, ঐ ওরা পালিয়ে গেল। ছাড়—ছাড়—

রঘুনাথ কাতরাইতে কাতরাইতে কহিল, যাবে কোথায়? কোম্পানীর জাল পাতা রয়েছে। তুই বড্ড ক্ষেপা ভানুচাঁদ। আমার সামনে তোরা সার বেঁধে দাঁড়া—আর যারা আছে সবাইকে খবর দে—কেউ যেন বাদ না থাকে। আমার এই শেষ-হুকুম।

ভানুচাঁদ বলিয়াছিল ঠিকই। এদিকে যখন একের পর এক সমস্ত ঢালি-পাড়ার মেয়ে-পুরুষ মুমূর্ষুকে ঘিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সাহেবের দল ততক্ষণে ত্বরিত পায়ে ষ্টিমারে চড়িয়া সিঁড়ি তুলিয়া লইল। সাহেব বারম্বার দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলেন, ষ্টিমে জোর দে শূয়ার বাচ্চারা, আরও জোর—

জল কাটিয়া পূর্ণ বেগে ষ্টিমার ছুটিতেছে। কেবিনে গিয়াও সাহেব তিষ্ঠাইতে পারিলেন না—বারম্বার মনে হয়, পিছনে পিছনে ফাঁসের দড়িও বুঝি সমান বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সারেঙ ও খালাসিগুলা উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, সাহেব হাঁকিতেছেন, জোরা চালা—আরও—

(৬)

বোধকরি অত কথা কহিবার শ্রমেই রঘুনাথ অবসন্ন ভাবে চোখ বুঁজিয়া এলাইয়া পড়িল। বুকে কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, উপুড় হইয়া দুইহাতে সেই আহত স্থান চাপিয়া ধরিয়াছিল। সন্তর্পণে হাত একটু সরাইয়া দিয়া জায়গাটা দেখিবার চেষ্টা হইতেই হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে মরণোন্মুখ রঘুনাথ তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, তাড়িয়ে দিলাম চালাকি করে। দেখ তো—

আর দেখিবার কিছু নাই। ষ্টিমার ততক্ষণে বাঁক পার হইয়া পূর্ণবেগে চলিয়াছে। দলসুদ্ধ হাসিয়া ধূলার উপর লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

রঘুনাথ বলিল, সাহেব লোক—গোলমাল করতে আছে? কে জানে—হয়তো বা জলদারোগা-টারোগা হবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। দেখ্ তো কত দূর গেল!

দেখিবে আর কি, কান পাতিয়া কয়েক মুহূর্ত একটু স্থির হইয়া শুনিল—একটা গুমগুম আওয়াজ ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইতেছে। রঘুনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, সাহেব কিন্তু বড্ড দাগা পেয়ে গেল। ও হারামজাদারা, বলি নেবুগুলো সব সাবাড় করেছিস নাকি?···কিন্তু এ সমস্ত কি খেলা হচ্ছে, বল দিকি? চৌধুরী মশায় আসছেন, কাজকর্ম রয়েছে—আমি তো ফিরে এসে দেখে শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, এ আবার কি গেরো!

চৌধুরির আসিবার কথায় সকল কথা তলাইয়া গেল। এক সঙ্গে বিশ-পঁচিশটা ব্যগ্র কণ্ঠ, কখন আসবেন তিনি? কখন? কখন?

এই রাত্রে।

আনন্দে মরদগুলার লাফাইয়া নাচিতে ইচ্ছা করে। বলিল, উঃ—কত দিন পরে! মশালের যোগাড় রাখব নাকি সর্দার?

রঘুনাথ বলিল, সেকথা হয় নি তো—সে সমস্ত বোধ হয় নয়। চৌধুরি মশায় শুধু বললেন, আমি যাব—তুমি এগুতে লাগ সর্দার।

ঢালিপাড়ায় কেহ ঘুমায় নাই। কাঠের বড় বড় গুঁদা জ্বলিতেছে, তাহাই ঘিরিয়া সকলে জাগিতেছে। নানারকম গল্প চলিতেছে, দা-কাটা তামাক পুড়িতেছে খুব। তারপর জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল। চারিদিকে আবছা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল, ঘোড়ার খুরের শব্দ—খটাখট-খটাখট—। লোকগুলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরহরি চৌধুরি একলাফে নামিয়া সকলের সামনে দাঁড়াইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, কাল সকালে পঁচিশখানা লাঙল নামবে বউভাসির চকে-

আনন্দোচ্ছল স্বরে ভাস্টাদ জিজ্ঞাসা করিল, চকটা তা হলে দিয়ে দিয়েছে ওরা ? ভাল হল চৌধুরি মশায়, বেশ হল—খাসা হল—

চৌধুরি হাসিলেন। এ হাসি রঘুনাথ আগে দেখিয়াছে, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। রঘুনাথের দিকে তাকাইয়া নরহরি প্রশ্ন করিলেন, কেউ জানে না বুঝি এখনো ? সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল, কত বড় নিরর্থক এই প্রশ্ন। নরহরি নিজে আসিয়া না বলা পর্যন্ত তাঁর কথা অতিবড় সুহৃদকেও ভুল করিয়া রঘুনাথ বলিবে না—ইহা চিরদিনের বিধি।

নরহরি হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরা চক দেয় নি ভাস্টাদ, আমাদের নিয়ে নিতে হবে। খান পঁচিশেক লাঙল এখানে এসে পৌঁছবে রাতারাতি। কাল তোমরা পঁচিশ জনে তাই নিয়ে চকের খোলে নামবে।

ভাস্টাদের মুখ এক মুহূর্তে ছাইয়ের মতো হইল, তার সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল। হাতের লাঠিখানার উপর সে মাথাটা কাত করিয়া দিল।

রঘুনাথ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কি হল রে ভাস্ ?

ভাস্ নিরুত্তর।

একটুখানি ঠেলা দিয়া রঘুনাথ আবার ডাকিল, কথা বলছিস না কেন ? কি হল তোর ?

ভাস্টাদ বলিল, ওসব আমি পারব না সর্দার। মাথা নাড়া দিয়া বলিতে লাগিল, না—কিছুতেই পেরে উঠব না, বুঝলে ? সেদিন এল কোদাল, আজ আসছে লাঙল। তবু তো কোদালের কাজ ছিল রাত্তিরবেলা। দিন দুপুরে চাষাদের সঙ্গে লাঙল ঠেলতে পারব না আমি।

বলিতে বলিতে ভাস্টাদের গলা ধরিয়া আসিল।

প্রায় সমস্ত কথাই নরহরির কানে যাইতেছিল। বলিলেন, ও রঘুনাথ, বলে কি ছোকরা ?

রঘুনাথ বলিবার আগেই ভাস্টাদ আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চৌধুরি মশায়, তোমার কামারে কেবল কোদাল আর লাঙলই গড়ছে—সড়কি-

বল্লম গড়ে না আজকাল? ছিলাম ঢালি, এখন কি চাষা বানিয়ে তুলবে আমাদের?

চৌধুরি হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, হুকুম দিয়ে দিয়েছি বাপু, হাকিম নড়বে তো হুকুম নড়বে না। কাল সকালে পঁচিশখানা লাঙল চকে নামবেই—আর বাঁধের উপর বসে তামাক-টামাক খাবে আরও জন পঞ্চাশ। তা ছাড়া গাঙের খোলে নৌকোর মধ্যে—ঘুমোতে পারে, দাবা-পাশা খেলতে পারে—তা-ও ধর আর শ-খানেক আন্দাজ। তুমি কোন দলে থাকবে ভাগ্নচাঁদ?

ভাগ্নচাঁদ আগ্রহের স্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আমার ঐ তামাক খাওয়ার কাজ। লাঠি আর হুঁকো নিয়ে বাঁধে আমি টহল দিয়ে দিয়ে বেড়াব—ঐটে বেশ পারব।

প্রসন্নমুখে সকলের দিকে তাকাইয়া নরহরি ঘোড়ায় চড়িয়া সপ্ করিয়া চাবুকের ঘা দিলেন। মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিন্তু লাঙলের কাজটাও মন্দ ছিল না হে! মাটি চষতে হবে না বেশি—বরণডালার কেউ যদি আসে, বুকের উপর দিয়ে ফলা টানতে হবে। পারবে না তোমরা?

হাঁ, হাঁ—করিয়া অনেকগুলা কণ্ঠস্বর বাঘের মতো গর্জন করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে নরহরি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঢালিরা যে যার ঘরে ফিরিতে লাগিল। ভাগ্নচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া রঘুনাথ বলিল, লাঙল একটু ধরে-টরে রাখলে বুদ্ধির কাজ হত কিন্তু। এই যেমন আজকের কাণ্ড—কোম্পানির নজর পড়ে যাচ্ছে, পুরাণো দিনকাল আর থাকছে না বাপু। বন্দুক-গুলিগোলার পাল্লায় লাঠি আর কতদিন?

ভাগ্নচাঁদ হাসিয়া বলিল, যতদিন এই হাত দু'খানা কাটা না যাচ্ছে সর্দার। মরদ-মানুষের হাত থাকবে, লাঠি থাকবে না—এ কি রকম কথা!

পায়ের নিচে জোয়ারের জল ছলছল করিয়া লাগিতেছে। রঘুনাথ বড় স্নেহে ভাগ্নচাঁদের কাঁধে হাত রাখিল। ভাগ্নচাঁদ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখের সামনে মুখ আনিয়া বলিতে লাগিল, ভাবছ কেন সর্দার? যতদিন চলে চলুক। যখন চলবে না, গাঙের জল তো আর শুকিয়ে যাবে না?

(৭)

সৌদামিনী ঠাকরুনের পানসি কসবা হইতে ফিরিতেছিল। খুব ভোরবেলা, অল্প অল্প কুয়াসা করিয়াছে। মালাধর বলিল, ভাল দেখা যাচ্ছে না মা, উই যে কালো কালো—উঁহু—উঁহু ওদিক কেন? ওদিককার ওসব হল বাঘা চৌধুরির —আমাদের চকের সীমানা দক্ষিণের ঐ বাবলাবন থেকে।

চিন্তামণি পিছনের গলুয়ে তামাক সাজিতেছিল। কলিকা ফেলিয়া মচ-মচ করিয়া ছই-এর উপর দিয়া চলিয়া আসিল। মালাধরের নির্দেশমতো ঠাহর করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সোজা বাঁশের লাঠি লইয়া চিরকাল কারবার, সীমানা-সরহদ্দ তল্লাস করিবার ধৈর্য তার ধাতে নাই। কোটরের মধ্যে চোখ দু'টা চক-চক করিয়া উঠিল। বলিল, মা-ঠাকরুন, ডাকব একবার কর্তাভাইকে? তুমি একেবারে এক রাজ্যি কিনে ফেলেছ, দাদাভাই আমার দেখবে না একটু?

এলোমেলো শয্যায় কীর্তিনারায়ণ অঘোরে ঘুমাইয়া আছে, হাত-পা গুটাইয়া এক জায়গায় আসিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িতে গিয়া আছাড় খাইয়া কপাল কাটিয়া গিয়াছিল, তার দীর্ঘ রেখা জয়পত্রের মতো আঁকিয়া আছে। চিন্তামণি দুই পা আগাইয়া লেপটা আস্তে আস্তে কীর্তিনারায়ণের গায়ের উপর তুলিয়া দিল। এবারে মালাধরের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কি বল গো সেন মশাই, নৌকাটা লাগান যাক এইখানে? দাদাভাইকে কাঁধে নিয়ে চকের উপর দিয়ে সোজা দেব এক ছুট। তোমার এই পানসির আগে আগে গিয়ে বাড়ি উঠব। রাজা তার রাজ্যপাট দেখবে না, তাই কি হয়?

মালাধর ঘাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সায় দিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়—দেখবেন বই কি! ঐ একবার ছায়া দেখিয়ে গেলেই হল। তারপর আমি রইলাম, আর রইল চকের প্রজাপাটক। নজর নিদেনপক্ষে ষোল আনা ধরলেও একটি হাজার। এখন না দেয়, খাজনা দিতে তো আসতে হবে—তখন? আরে আরে—বেটারা বেয়েই চলল যে! ডাইনে মেরে ধর্ নৌকো।

সৌদামিনী ইহারই মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখে তাঁর জল আসিয়াছিল। ঐটুকু এক চকে চিন্তামণির এত আহ্লাদ, আর পুরাণো আমলে কর্তা যে দিন নাজির-ঘেরির গোটা তালুক কিনিয়া ফেলিলেন! সে একদিন গিয়াছে। পাইক-বরকন্দাজরা সমস্ত দিন আমরুল শাক ঘসিয়া ঘসিয়া চাপড়াশ সোনার মতো চকচকে করিয়া ফেলিল। তারা আগে আগে চলিল, পিছনে কর্তার পালকি, তার পিছনে পঙ্গপালের মতো কর্তার হাতে-ধরিয়া-শেখানো লাঠিয়ালের দল। পাকা বাঁশের দীর্ঘ লাঠি উঁচাইয়া সারবন্দি সকলে চলিয়াছে। সে-সব যেন কালিকার কথা। মাসটা বৈশাখ, বড় গরম, যাই-যাই করিয়া রওনা হইতে একেবারে ঘোর হইয়া গেল। আকাশে খণ্ড-চাঁদ উঠিতেছে। সৌদামিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বিয়ে করতে চলেছ যেন! উলু দেব? কর্তা রসিকতা করিয়া একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন—আর ঘর-ফাটানো হাসি! শ্লোক বলিতেন তিনি কথায় কথায়, সে সব সৌদামিনী এক বর্ণ বুঝিতেন না—হাসিটা কিন্তু আজো স্পষ্ট কানে বাজে। হাসি তো নয়—যেন জোয়ারের ঢেউ, চারিদিক একেবারে তোড়পাড় করিয়া দিত।

আগে জমিদারি ছিল না, ঐ নাজির-ঘেরি হইতে জমিদারির পত্তন। সৌদামিনীর বড় ভাই ভগ্নীপতিকে সদুপদেশ দিয়া পাঠাইলেন, বিষয়-সম্পত্তি কিনে গেলেই হয় না। ভাল করে আর একবার ভায়াকে বিবেচনা করতে বোলো, এ চাতালের উপর বসে ভুঁড়ি দুলিয়ে পুঁথি-পড়া নয়। শিবনারায়ণ এদিকে ভালমানুষ লোক, সংস্কৃত ও ফারসি জানিতেন চমৎকার। সে আমলের কালেক্টরির বাংলানবিশ দেওয়ান। লাঠি খেলিতেন, কুস্তি করিতেন, আর অবসর পাইলেই পণ্ডিত মহাশয়দের লইয়া কাব্যচর্চা হইত। কিন্তু জমিদার হইয়া কাব্যের পুঁথি ক্রমশ সিন্দুকে উঠিল। দেখাইয়া দিলেন, সম্পত্তি রক্ষা করিয়া বাড়াইয়া-গুছাইতেও সক্ষম তিনি। কর্তা থাকিলে আজ কি এমনটা হইত, সৌদামিনীকে এমন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত? সেদিনের লজ্জাবতী বধূ আজ বাঘিনীর মতো ঠাঁটটা আগলাইয়া বসিয়া আছেন। যখন-তখন ছেলের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস পড়ে, কবে যে সে মানুষ হইয়া উঠিবে!

হঠাৎ নৌকা ঘুরিয়া যাইতে সৌদামিনীর চমক ভাঙিল। হুকুম দিলেন, এখানে বাঁধতে হবে না, চলুক যেমন চলছে—

মালাধর সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ—চালা, চালা নৌকো। তোড়জোড় না করে ফস করে অমনি বাঁধলেই হল—নাঃ? আপনি জানেন না গিন্নি-মা, আজকাল এমন হয়েছে—চৌধুরির ঐ ভূতপ্রেতগুলো হক্ না হক্ মাথায় লাঠি মেরে বসে। আখেরের ভাবনা ভাবে না। তারপর গলা নিচু করিয়া কহিল, কিন্তু একটুখানি ধরুক মা। আমাকে নেমে যেতে হবে। আমার বাড়ি ঐ সোজা। মিছেমিছি ঘুরে মরব কেন অদ্দুর?

চিন্তামণি নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী বলিলেন, রাগ করলে ওস্তাদ? অত বড় ঐ ছেলে—তুমি বললে, পিঠে নিয়ে মাঠ ভাঙবে। পিঠ তা হলে কুঁজো হয়ে যাবে, বুক ফুলিয়ে লাঠি ধরতে হবে না আর কোনদিন।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া নদী-জলের দিকে তাকাইয়া চিন্তামণি দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া সৌদামিনী বলিলেন, আমরা বাজে লোক কি না! ওস্তাদ আমাদের সঙ্গে কথাই বলে না।

ওস্তাদ বলিল, বলাবলি আ'র কি মা, আর তো সেদিন নেই—বুড়ো অকর্মা হয়েছি, দুধের ছেলেটাও বয়ে নিতে পারি নে। তাই বলি, ছুটি দাও এবার—যাই—

সৌদামিনী খুব হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আ—হা, সে বুঝি তুমি! অকর্মা আমার ঐ ছেলে। যেখানে যাব আঁচল ধরে সঙ্গে চলেছেন। ঐ ননীগোপাল আমার মানুষের মতো হয়ে তোমাদের সঙ্গে মহালে ঘুরবে—আ আমার কপাল!

চিন্তামণি রাগিয়া আগুন হইল। বলিল, তাই বুঝি সোনার পালঙ্কে তোমার ননীগোপালকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ মা? কার ছেলে, হুঁশ আছে তা? খালি কাঠের উপর পড়ে রয়েছে, শীতে ধনুকের মতো হয়ে গেছে, কাপড়খানা গায়ে তুলে দেবার ফুরসৎ তোমাদের কারো নেই—এতেও মনোবাঞ্ছা পুরল না মা?

ঘাটে সারবন্দি বাছাড়ি নৌকা। মালাধর হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, দেখিস, দেখিস মাঝি, লাগে না যেন—সামাল! ডান পাশ দিয়ে—ঐ বালির চরটার ওখানে ধরবি।

বলিতে বলিতেই ঠক করিয়া পানসির মাথা একটা নৌকার গায়ে গিয়া লাগিল। ছই-এর ভিতর হইতে অমনি মধুরকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল, কোন্ মুমুন্দি গো?

মালাধর বলিল, হেঁ হেঁ বাবা, গোলপাতা কাটতে চলেছ? মেজাজ বড্ড গরম যে! থাম, থাম। আগে বসি গিয়ে কাছারি। সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মা, এই খুঁটো-সেলামি আদায় করে দেব আপনাকে বছরে পাঁচ-শ টাকা।

আশ্চর্য হইয়া সকলে মালাধরের মুখের দিকে তাকাইল।

মালাধর গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িল। বলিতে লাগিল, আলবৎ! বাপের সুপুত্তুর হয়ে সব খুঁটো-সেলামি দিয়ে যাবে। এই গাঙ না হয় কোম্পানির, পাড় তো আমাদের চকের সামিল। পাড়ে খুঁটো পুঁততে হবে না? মাগনা কাছি মেরে সব যে পড়ে পড়ে ঘুমোবেন, সে হচ্ছে না। এক এক খুঁটোর খাজনা চার চার আনা। দেখুন না কি করি।

সৌদামিনী চিন্তামণির দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন, বোঝো, বসে পড় না ওস্তাদ। ঐ খুঁটো-সেলামি দড়ি-সেলামি কলসি-সেলামি—শুনে নাও সব মালাধরের কাছ থেকে। সর্দার-পাইক তুমি—কাজে লাগবে।

চিন্তামণি রুক্ষ-কণ্ঠে কহিল, ও সব আমাদের এখানে হবে না সেন মশাই। তোমার আগের মনিবের কাছে চলে থাকে তো চলেছে—আমাদের এখানে নিয়ম-কানুন আলাদা। আসল খাজনা—তাই গিন্নি-মা মাপ করে দেন কথায় কথায়—তার হেনোতেনো ছাইভস্ম!

সৌদামিনী বলিলেন, তবু শিখে রাখ সমস্ত। পরিণামে কি হবে ঠিক কি? পেট তো মানবে না! ছেলে যে এদিকে দিগ্‌গজ হয়ে উঠছেন। 'ক' লিখতে একেবারে কেঁদেই খুন।

মাধাধর প্রশ্ন করিল, কেন?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সৌদামিনী বলিলেন, বোধ হয় কৃষ্ণ নাম মনে পড়ে। কিম্বা হয়তো কলম ভেঙে যায়—

এবার চিন্তামণির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। ঘুমন্ত কীর্তিনারায়ণের দিকে আর একবার স্নেহ-দৃষ্টিতে চাহিল। বলিল, ভাঙবে না? ওঁর কবজির হাড় দেখছ মা, চওড়া কি রকম! খাগের কলম টিকবে কেন? লাঠি—পাকা পাঁচ-হাতি বাঁশের লাঠি, তার কমে মানাবে না ও-হাতে। দাদামণিকে আমি লাঠিখেলা শেখাব। সব শিখিয়ে দিয়ে যাব—কর্তার কাছ থেকে যা পেয়েছি, সমস্ত।

মালাধর বলিল, কিন্তু ও কথা বললে হবে কেন মা? খোকাবাবু লেখেন তো বেশ। কসবায় দেখলাম এবার—

চিন্তামণি বাধা দিয়ে অধীর কণ্ঠে কহিল, তার গরজটাই বা কি? কিচ্ছু দরকার নেই। পুঁথি পড়তে হয়, নিয়ে আসা যাবে পণ্ডিত-মশায়দের। তাঁরা পড়ে পড়ে শোনাবেন। আর তোমরা আধকুড়ি নায়েব-গোমস্তা রইলে, কর্তাভাই লিখতেই বা যাবে কোন্ দুঃখে?

মালাধর তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, তা ঠিক। কি দুঃখে লেখাপড়া করতে যাবেন? কিন্তু যা উনি শিখেছেন, তাই বা ক'জন জানে? কসবায় দেখলাম এবার, দিব্যি সই দিয়ে দিলেন—গোটা গোটা মুক্তোর মতো অক্ষর। কলম ভাঙা-টাঙা মিছে কথা। একটু থামিয়া আবার বলিল, বাবা চৌধুরির চেয়ে অনেক ভাল লেখেন উনি।

চিন্তামণি তখন আপনার ঝোঁকেই বলিয়া চলিয়াছে, হুকুম দাও মা-ঠাকরুন, দাদাকে আমি লাঠি শেখাই। বাড়ি যা খুলবে ও-হাতে! আজ ওঁকে ভরসা করে দিতে পারলে না মা, কিন্তু গুরুর নাম করে বলছি, কর্তাভাই আমার হাজার লোকের মহড়া নেবে একদিন। আমি বুড়োমানুষ, আমি হয়তো বেঁচে থাকব না, তুমি দেখো—

সৌদামিনী শান্ত দৃষ্টি তুলিয়া চিন্তামণির দিকে একটুখানি চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, ভরসা করে দিতে পারলাম না, তাই বুঝি! এই বুঝলে তুমি ওস্তাদ?

চকের নতুন কাছারি বাঁধা হোক, পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে ষোল-বেহারার পালকি হাঁকিয়ে তোমার দাদাভাই সেখানে গিয়ে উঠবে। এখন এমনি-এমনি গেলে কি তোমাদের ইজ্জত থাকে? ওকি—ওকি—

নৌকা কূলের কাছাকাছি আসিতেই মালাধর লাফাইয়া পড়িল। চটিসুদ্ধ সে পড়িল গিয়া একেবারে কাদার মধ্যে। নোনা কাদা—কে যেন যত্ন করিয়া ছানিয়া নিভাঁজ করিয়া রাখিয়াছে। মালাধরের হাঁটু অবধি তলাইয়া গেল। পানসির সকলে হাসিয়া উঠিল। মালাধরের দৃক্‌পাত নাই। দুই আঙুল তুলিয়া দেখাইয়া সে কহিতে লাগিল, কিছু ভাবতে হবে না মা, এই দুটো মাস সবুর করুন, আটচালা কাছারি-ঘর তুলে দিচ্ছি। বাঁশ-খড় সব ভূতে যোগাবে, এক পয়সাও চাইনে ঘর থেকে। মাত্তোর দুটো মাস।

মালাধর বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছিল। হৈ-চৈ শুনিয়া তাকাইয়া দেখিল, একটু দূরে দল বাঁধিয়া কারা চাষে লাগিয়াছে। শব্দ-সাড়া খুবই হইতেছে, গরু বড় চলিতেছে না, লাঙলের মুঠা ধরিয়া দশ-বিশটা জোয়ান সারবন্দি দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতেছে।

হাঁক দিল, কারা?

লোকগুলা তাকাইয়াও দেখিল না।

মালাধর বলিল, কার জমিতে কে লাঙল দেয়? শেষকালে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে মরবি বেটারা? সব নতুন বন্দোবস্ত হবে, সেলামি লাগবে—হেঁ হেঁ, মাগনা নয়।

বাঁধের আড়াল হইতে ভানুচাঁদ যেন হঠাৎ পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাতে হুঁকা। দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে ভানু বলিল, তামাক ইচ্ছে করবে নেন মশাই? সাজা রয়েছে। এস না এদিকে।

মালাধরের কণ্ঠ এক মুহূর্তে একেবারে খাদে নামিয়া আসিল। বলিল, না বাবা, তামাক নয়। বেলা হয়ে গেছে বড্ড। বলছিলাম ছোঁড়াগুলোকে। ওরা সব বুঝি তোমাদেরই পাড়ার? সবাই আমরা পাড়াপড়শি, পর তো নয়—তাই

বলছিলাম, বাগধনেরা, এই যে সকালবেলা পরের জমিতে লাঙল নামিয়েছ, একটা ফ্যাসাদ যদি বাধে আমাদেরই আবার ঠেকাবার জন্য দৌড়তে হবে।

ভাঙ্গচাঁদ বিস্ময়ের ভাবে কহিল, পরের জমি হল কোথায়? জমি তো আমাদের। বাঁশের গায়ে লাঠিটা ঠেশ দেওয়া ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে সেটা হাতে করিয়া তুলিল। বলিল, কেন—তুমি সেন মশাই, সমস্ত তো জান। মনে পড়ছে না বুঝি?

মালাধর তাড়াতাড়ি বলিল, পড়ছে বই কি বাবা! জমি তোমাদের নয় তো কার আবার? সাত পুরুষে জমি চৌধুরি মশায়ের। খুব মনে পড়ছে। হি-হি করিয়া মালাধর হাসিতে লাগিল। বলিল, দুপুর রাতে ঝপাঝপ কোদাল মারছিলে, কাছি খুলে ডিঙি গেল ভেসে। তিন দিন পরে দীঘলের বাঁধাল থেকে সেই ডিঙি ত্রৈলোক্য গিয়ে নিয়ে এল। খুব মনে আছে।

ভাঙ্গচাঁদও হাসিতেছিল। হাসি থামাইয়া বলিল, কাছি খুলে গেল না হাতী। ও ঠিক তোমার কাজ, ডিঙি তুমি খুলে দিয়েছিলে। অন্ধকারে তখন ঠাহর করতে পারি নি যে! নইলে আর কিছু না হোক, হাতে তো কোদাল ছিল একখানা করে—

মালাধর জিভ কাটিল। সর্বনাশ! অমন কাজ করতে পারি আমি? না বাবা, কোদালের কোপ-টোপ তোমরা দেখে শুনে জায়গা বিশেষে ঝেড়ো।

খানিকক্ষণ ধরিয়া সে হাসিল। তারপর গলা খাটো করিয়া বলিল, সে ছিল রাত-বিরেতের কাজ—সাক্ষি মেলে না, সে একরকম মন্দ নয়। কিন্তু দিন-দুপুরে এই যে হৈ-হৈ করে গরু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এটা কি রকম হচ্ছে বল তো? এখন যদি গ্রামের ওদের সাক্ষি মেনে দেয় এক নম্বর ফৌজদারি ঠুকে! চৌধুরি মশায়ের আর কি হবে, মরতে মরবি তোরাই তো বাবা।

কে কথা বলে রে ভাঙ্গ? আরে, আরে—আমাদের মালাধর যে!

গলা শুনিয়া মালাধর পিছন ফিরিল। রঘুনাথ সর্দার। সে একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য হইয়া রঘুনাথ বলিল, কাল দেখে এলাম পরেশ উকিলের ওখানে—ফিরলে কখন বল? কাজকর্ম চুকল তো?

মালাধর তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, তার তো কাজকর্ম—হ্যাঃ! মেয়েমানুষ অবোলা জাত—সঙ্গে করে নিয়ে গেল নাছোড়বান্দা হয়ে। সমস্ত রাত মশা তাড়িয়ে মরেছি। তারপর শরীর-গতিক ভালো তো বাবা? চৌধুরি মশায় আছেন ভালো?

রঘুনাথ কহিল, চৌধুরি মশায় যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

পাংশুমুখে মালাধর বলিল, কেন? কেন বল দিকি?

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, চাকরি-টাকরি দেবেন বোধ হয়।

মালাধর তাড়াতাড়ি কহিল, তা দেবেন বই কি! চাকরি আমাদের পেশা। চৌধুরি মশায় বিচক্ষণ লোক—জানেন তো সমস্তই। তা বেশ, আমি দেখা করব ওঁর সঙ্গে।

এক পা দু'পা করিয়া মালাধর বেশ খানিকটা আগাইয়াই ছিল, এবারে সে হন-হন করিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। পিছন হইতে রঘুনাথ বলিল, দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে যাও—এক্ষুণি দেখা হয়ে যাবে। চৌধুরি মশায় চকের চাষ দেখতে আসছেন।

ততক্ষণে মালাধর পথ ছাড়িয়া গ্রামের সীমানায় পা দিয়াছে।

কিন্তু কি ক্ষণে সেদিন রাত্রি পোহাইয়াছিল, গ্রামে পৌঁছিয়াও গ্রহ কাটিল না। মোড় ঘুরিয়াই বাঘ, স্বয়ং বাঘাহরি চৌধুরী। সঙ্গে আরও যেন কে কে—একজন তো মধ্যমপাড়ার যজ্ঞেশ্বর চাটুজ্জে। তাকাইয়া দেখার ফুরসৎ মালাধরের ছিল না। সে দিকটায় পানের বরোজ ও সুপারি-বন। ধাঁ করিয়া আগে তো রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর কোন বনে ঢুকিবে সেটা পরের বিবেচনা। কিন্তু শনির নজর এড়ায় নাই। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হাঁক আসিল, কে? কে ওখানে?

মালাধর মুখ ফিরাইয়া কোন গতিকে কহিল, এই যে—আমি। প্রশ্ন করিয়াছে শ্যামকান্ত, সে-ও চৌধুরির পিছু পিছু চক দেখিতে চলিয়াছে। যজ্ঞেশ্বর আগের কথার খেই ধরিয়া বলিতেছিলেন, ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাছারি করতে যাবেন কেন? সে উচিত হবে না চৌধুরি মশাই। এক ফুলকি আগুনের মাত্র

ওয়াস্তা। তার চেয়ে যেমন ছিল—গ্রামের মধ্যে থাকুক। ঐ মালাধরকে জিজ্ঞাসা করুন বরং। ও তো হাল চাল সমস্ত জানে—

কথা শুনিয়া মালাধর ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কিছু ভাববেন না চৌধুরি মশাই। ভার আমাকেই দিন। কাছারি-টাছারি সমস্ত বেঁধে দেব। আটচালা চৌরিঘর—দারোয়ানের দেউড়ি সমস্ত। ছটো মাস শুধু সময় দেবেন, দেখে নেবেন তারপর।

চৌধুরি বলিলেন, তুমি ওখানে কি করছ?

মালাধর বলিল, আজ্ঞে আপনারই কাছে যাচ্ছিলাম।

হাসিমুখে নরহরি বলিলেন, পথটা বেছেছ ভাল। কিন্তু আমার কাছে কেন বল দিকি?

মালাধর ততক্ষণে দু-এক পা করিয়া রাস্তার দিকে আগাইতেছিল। অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, আর বলেন কেন মশাই! চাকরি—হা-হা-হা—ছা-পোষা মানুষ কাঁধের উপর কন্যাদায়, চক দখল করুন, যা-ই করুন—চকের আদায়ের কাজটা যেন আমার থাকে। নতুন কাউকে বহাল করে বসবেন না। রঘুনাথও বলল সেই কথা—বলল, যাও, চৌধুরি মশায়ের সঙ্গে দেখা কর গিয়ে—তিনি তো জানেন তোমাকে!

শ্যামকান্ত ব্যঙ্গের সুরে কহিল, তা জানেন বটে, আগাগোড়া সমস্ত জানেন। তোমার চাকরি যাবে কোথায়? কেন, বরণডাঙ্গার উনি কি বলছেন?

মালাধর বলিল, আরে রামোঃ। বরণডাঙ্গা করবে মহাল শাসন! এক নম্বর মেয়েমানুষ, আর দুই নম্বর হল এক পুঁটকে ছোঁড়া। চৌধুরি মশায়ের যমদূতগুলো কবে ঐ মা-ব্যাটা আর নায়েব-গোমস্তা সবসুদ্ধ গোটা চকটাই মালঞ্চের তলায় রেখে আসবে, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? আমাদের আখেরের ভাবনা আছে মশাই। বলিয়া সে একবার নরহরির দিকে, একবার আর সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্রোতারাও হাসিতে লাগিল। হাসিলেন না কেবল নরহরি। গম্ভীর স্বরে বলিলেন, চাকরি তোমায় দেব মালাধর। কাল বিকেলে দেখা কোরো।

যে আজ্ঞে—বলিয়া তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলা লইয়া মালাধর বিদায় হইল।

শ্যামকান্ত খানিক তাহার গমন-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অনেকটা যেন আপনার মনে বলিয়া উঠিল, আস্পর্ধা বটে লোকটার!

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন, তা ঠিক, মালাধর আমাদের চক্ষুলজ্জা করে না। একটু চুপ থাকিয়া বলিলেন, তা ছাড়া চিরকাল ঐ চাকে কাজ করে আসছে। শ্যামগঞ্জে বরণডাঙায় গণ্ডগোল জমে উঠল। এ বয়সে ও-ই বা যায় কোথায়?

শ্যামকান্ত বলিল, কিন্তু গণ্ডগোলের মূলে তো ও-ই। ও-ই বরণডাঙার গিন্নিকে নিয়ে এল এর মধ্যে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, উঃ—আমাকে সুদ্ধ ঘোল খাইয়ে দিল। কম লোক মালাধর! তাই তো দেখা করতে বললাম। এবার ওকে নিশ্চয় বেঁধে ফেলব।

শ্যামকান্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, ওকে বিশ্বাস করবেন?

নরহরি বলিলেন, বিশ্বাস করব কেন? চাকরি দেব।

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, তা লোকটার ক্ষমতা আছে বটে! কিন্তু বাবাজি যা বললেন, তা-ও দেখুন ভেবে। বড় বিশ্বাসঘাতক লোক—পয়সা পেলে লোকটা না পারে এমন কাজ নেই।

নরহরি বলিলেন, পয়সা-কড়ি যা'তে পায়, সেই উপায় করতে হবে তা হলে। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কে আসবেন আমার তহ্‌শিলদার হতে? জমিদার বাড়ি হাতী-ঘোড়া জীব-জানোয়ার পুষতে হয়, ঐ রকম মালাধরও দু-চারটে পুষতে হয়। এসব আপনারা বুঝবেন না চাটুজ্জে মশায়, চাকরি আমি ওকে দেবই। আর আমাদের বড়বাবুও ওকে পছন্দ করবেন—আমার চেয়ে বেশি করবেন। আগে থাকতে এই বলে রাখছি।

বলিয়া শ্যামকান্তকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

গামছা কাঁধে তেল মাখিয়া জন সাত-আট দীঘির ঘাটে চলিয়াছে। হাঁক-ডাক করিয়া মালাধর তাদের উঠানে আনিল। বলিতে লাগিল, সু-খবর শুনে যান দাদা, আর তহ্‌শিলদার নয়—সদর নায়েব, হেঁ হেঁ, একদম হরিচরণ চাটুজ্জে। বিশটা বউভাসি এখন শর্মার মুঠোর মধ্যে। চৌধুরি মশায় তাই বলছিলেন—নায়েব যা, নবাবও তাই। ঐ কেবল নামের হেরফের।

একজন প্রশ্ন করিল, বাঘা চৌধুরির চাকরি নিয়েছ নাকি?

মালাধর চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, মুশকিল তো হচ্ছে ঐ। দুই সূয্যির উদয় হল—কার রোদে এখন ধান শুকোই? বরণডাঙার গিন্নি তো হাত-পা কোলে করে বসে আছেন—বলেন, যা কর তুমি মালাধর। আর ওদিকে চৌধুরিও নাছোড়বান্দা। বিকেলে গিয়ে চেক-মুড়ি আনতে বলেছেন। মামলা আর মাথা ফাটাফাটি চলুক এইবার, কে মালিক সাব্যস্ত হতে থাকুক। আমি ওসব তালে নেই। আমার কি, আমি নির্গোলে আদায়-পত্তোর করে যাই কাল সকাল থেকে।

পরদিন বরণাডাঙা হইতে হারাণ সরকার আসিয়া উপস্থিত। বলিল, মা পাঠিয়েছেন।

একগাল হাসিয়া মালাধর বলিল, বেশ, বোলো মা'কে। কিছু ভাবনা নেই। আদায়ের আরম্ভ কালকে থেকে।

হারাণ চোখ-মুখ ঘুরাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, তা যেন হল। কিন্তু চৌধুরি যে চকে লাঙল লাগিয়েছিল। বলে, চক নাকি তার। চক হল তার, আর আমরা পুঁটিমাছের মতো করকরে টাকা গুণে দিয়ে এলাম—সে হয়ে গেল ভুয়ো! মা তোমাকে ডেকেছেন আজ।

মালাধর বলিল, যাব বিকেলে।

পরদিন পুনশ্চ হারাণ আসিল। কই? কি হল?

মালাধর বলিল, একদিনে আর কি হবে ভাই? প্রজাপাটক বিস্তর খবর হয়ে গেছে। দুটো মাস দেরি করতে বল। সব হয়ে যাবে—আটচালা কাছারি-বাড়ি দেউড়ি সমেত।

হারাণ বলিল, সে কথা নয়, তোমার বরণডাঙা যাবার কথা। রোজ ওরা হৈ-হৈ করে লাঙল চালাচ্ছে, দখল সাব্যস্ত করছে, বুঝলে না? একটা বিহিত করা দরকার। মা'কে বলছিলাম ভাই, ফৌজদারি-দেওয়ানি দুটোই জুড়ে দেওয়া যাক। সেইসব ঠিকঠাক হবে আজকে। তুমি একবার চল সেন মশাই।

মালাধর বলিল, বিকেলে যাব।

হারাণ বলিল, কালও তো বলেছিলে ঐ কথা।

মালাধর চটিয়া বলিল, আজকে আবার একটা নতুন কথা বলব না কি? সে লোক আমি নই। বিকেলবেলা যাব, বলে দিও।

সকালের পর দুপুর, তারপরেই বিকাল আসিয়া থাকে। রোজই আসে। মালাধর বিকালে হয়তো যাইবেই, সেজন্য তাড়া কিছু নাই। কিন্তু প্রজাপাটক ডাকাডাকি করিয়া এদিকে মালাধর বিষম তাড়া লাগাইল। ভোরবেলা হাতবাক্স কোলে করিয়া দুর্গানাম লিখিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপে বসে। পাইক-বরকন্দাজ নাই, কিন্তু তাহাতে যায় আসে না। বেলা প্রহরখানেক হইতে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি নিজেই দপ্তর হাতে ঘুরিতে শুরু করে। এই রকম সন্ধ্যা অবধি চলে। সন্ধ্যার পর রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া আবার চণ্ডীমণ্ডপে বসে। কিন্তু আদায়পত্রের সুবিধা হয় না বিশেষ কিছু। লোকে জিজ্ঞাসা করে, কোন তরফের আদায় করছ সেন মশাই?

মালাধর বলে, তাতে দরকার কি বাবু? তোমাদের হকের খাজনা, শোধ করে যাও, ব্যস।

কিন্তু ওদিকে কসবায় ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, সে খবর রাখ?

মালাধর বলে, নিষ্পত্তি তো হবে একটা। আমার এ কায়েমি চাকরি, আমি নড়ছি নে কিছুতে। আসে বরণডাঙা—ভালো, আসেন চৌধুরি, আরও ভালো।

আমি করচা লিখে শেষ করে রেখেছি। মালিকের নামের জায়গাটা ফাঁক রয়েছে কেবল।

তুমি কোন দলে সেন মশাই ?

মালাধর হাসিয়া বলে, তোমরা যে দলে। বরণডাঙার গিন্নি রোক টাকা গুণে দিয়েছেন। সেটা তো আর মিথ্যে নয়। বেশ তো—দাও টাকা, রসিদ দিচ্ছি, বরণডাঙার মোহর-মারা রসিদ—

চৌধুরির লোক এসে শাসিয়ে গেছে, বরণডাঙাদের টাকা দিলে ঘাড় ভাঙবে।

তবে চৌধুরির টাকাই দাও। কাঁচা-রসিদ কিন্তু। বিকেলে গিয়ে চেকমুড়ি আনব। সেই সময় এস, একেবারে দাখলে পেয়ে যাবে।

এত তর্কাতর্কি করিয়াও কিন্তু লোকগুলা গাঁটের টাকা গাঁটে লইয়া পিছাইয়া পড়ে।

একদিন উঠান হইতে আওয়াজ আসিল মালাধর আছ ?

উঁকি মারিয়া দেখিয়া মালাধর তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। এস এস, রঘুনাথ সর্দার যে! বলি, খবর ভালো ? চৌধুরি মশায় ভালো আছেন ?

রঘুনাথ বলিল, তলব হয়েছে।

হবারই কথা। বিকেলে যাব।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, এখনই।

মালাধর হাসিয়া বলিল, কেন, চৌধুরি মশায়ের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ইচ্ছে হল নাকি আবার ? আমি তো ব্রাহ্মণ নই।

রঘুনাথ চুপি-চুপি বলিল, বাঘা চৌধুরির আমল চলে যাচ্ছে। শ্যামকান্ত লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে গদি চেপে বসেছেন। এ দেবতা একেবারে কাঁচা-খেগো। এখন আর ভোজন-টোজন নয়। একদম সোজা হুকুম, নিয়ে এস সঙ্গে করে। না আসতে চায়, বেঁধে এনো।

মালাধর শুষ্কমুখে বলিল, ভয়ের কথা হয়ে উঠল বড্ড। কি করা যায় ?

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, আপাতত দুর্গা বলে উঠে পড়। জ্যান্ত বা মরা—বুঝতে পারলে না? চল—

শ্যামকান্ত বিনা ভূমিকায় বলিল, জমিদারি এবার থেকে আমি দেখছি। বাবা আর কত খাটবেন—আমার উপর ভার পড়েছে। চাকরি নিতে হলে আমার খোশামোদ করতে হবে।

মালাধর সবিনয়ে বলিল, যে আজ্ঞে!

তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি কেন, বুঝেছ?

মালাধর একগাল হাসিয়া বলিল, বুঝেছি কতক কতক। চাকরি দেবেন বোধ হয়।

শ্যামকান্ত কহিল, না—মুণ্ডপাত করব। সৌদামিনী ঠাকরুন মামলা রুজু করেছেন—চক বেদখলের মামলা। সমস্ত তোমার কারসাজি।

মালাধর জিভ কাটিয়া ঘাড় নাড়িয়া মহা প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কক্ষণো না, একেবারেই না। আমার গরজটা কি মশাই? বিষয় আপনাদের যার হয় হোকগে, আমার সেহা-করচা নিয়ে সম্পর্ক। ষোল আনা হিস্যার মালিক সৌদামিনী দেব্যা না লিখে নরহরি চৌধুরি লিখতে আমার আর কি এমন বেশি খাটনি, বলুন।

তবে বরণডাঙার হয়ে এত কাণ্ড করলে কেন?

মালাধর বলিল, বরণডাঙা? আমার বয়ে গেছে। চৌধুরি মশায়ের সঙ্গেই তো কথাবার্তা চলছিল—হরিচরণ চাটুজ্জে মধ্যবর্তী। চাটুজ্জে রাঘব-বোয়াল মশাই, সমুদ্দুর শুষে নেয়। পান খাবার খরচা-টরচা কি আদায় করল—ভাগের বেলা একেবারে তাইরে-নাইরে-না। তখন মনে ভাবলাম, দুত্তোর—পুষ্যোপো মনিবকে কিছু পাইয়ে দিই এই ফাঁকে—ধর্ম হবে। নুন খাই যার, গুণ গাই তার। তা হয়েছে মশাই, ভালই হয়েছে। প্রায় ছুনোছনি নয়। নোনা-ওঠা চর—মেয়েমানুষ ছাড়া কে নিত অত টাকা দিয়ে? মনিব মশায় রেজেস্ট্রি-অফিস থেকে টাকা বাজিয়ে নিয়ে সোজা বরিশালের স্টিমারে উঠে বসলেন।

শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিল, আর তুমি এলে বুঝি নিরম্বু একাদশী করে ?

মালাধর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ঐ তো ভুল করছেন বড়বাবু। চৌধুরি মশাই ঐ ভুল করলেন বলে তো এত গণ্ডগোল। বলি চাকর-মনিব কি আলাদা ? আমার সাবেক মনিব মশায় জানতেন সব। আট টাকা মাইনে মশায়, রাত-দিনের চাকরি, খোরাকি ওরই মধ্যে। তা-ও আজ আড়াই বছর মাইনে বাকি। মনিব কি ভাবতেন, আমি বাতাস খেয়ে আছি ?

শ্যামকান্ত হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, চকের দলিলের নকল আছে তোমার কাছে, সেইটে আমি দেখব।

মালাধর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে না—নেই।

শ্যামকান্ত বলিল, কসবায় গিয়ে খোঁজাখুঁজি করবার সময় নেই আর। বুধবারে মোকর্দমার দিন। দলিল না দেখালে তোমার গলা কাটব।

মালাধর বলিল, দলিল কি গলার ভিতর রয়েছে বাবু ?

শ্যামকান্ত হাসিয়া ফেলিল। না থাকে, সিন্দুকের ভিতর আছে। সিন্দুক খুলবার মন্তোর আমি জানি। বাবা যে ভুল করেছেন, আমার বেলা তা হবে না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন মালাধর, বোসো—। বোসো ফরাসের উপর। রঘুনাথ, দেওয়ানজির সেরেস্তা থেকে জেনে এস, বুধবারেই মোকর্দমার দিন তো ?

শ্যামকান্তর মন্ত্রটা কি প্রকার কে জানে, কিন্তু ফল তার হাতে হাতে। পুনরায় ডাকাডাকি আর আবশ্যক হইল না। মালাধর সন্ধ্যার পর আবার ক্রোশখানেক হাঁটিয়া সৌদামিনীর সেই দলিলের নকল চাদরে বাঁধিয়া লইয়া আঁধারে আঁধারে শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিল।

শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিল, এইটে তো সেই ? তোমায় বাপু কিছু বিশ্বাস নেই।

প্রদীপের আলোয় শ্যামকান্ত মনে মনে পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল, জবর দলিল তো ! বাঁধন-কষনের বাকি নেই কিছু। তবে আর অনর্থক মামলা করে কি হবে ?

মালাধর কৃতার্থ হইয়া যেন গলিয়া পড়িবার জো হইল। বলিল, আজ্ঞে, আমার কাজকর্ম এই রকম। খুঁৎ পাবেন না। চাকরিটা দিন, দেখতে পাবেন তখন ?

বিরক্ত মুখে শ্যামকান্ত বলিল, চক পেলে তো চাকরি ? যত-কিছু উৎপাত আসতে পারে, একটা একটা করে সব তো দলিলে ঢুকিয়ে বেঁধে ফেলেছ। মাথা ঢোকাবার একটু ফাঁক নেই—

মালাধর হাসিয়া বলিল, নেই—কিন্তু হতে কতক্ষণ ? হুজুর যদি ইচ্ছে করেন, মাথা তো মাথা, হাতী ঢুকিয়ে দিতে পারি ওর মধ্যে।

শ্যামকান্ত বলিল, রেজেস্ট্রি কবলা যে ! ওর উপর কি চালাকি করবে ?

মালাধর বলিল, হুকুম হয়তো হোসেনশা'র আমলের সনদ বেরিয়ে যেতে পারে। রেজেস্ট্রির চেয়েও তার দাম বেশি। আসলে হল, হুজুরের ইচ্ছে। বলিয়া আঙুলে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া মালাধর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হুজুর, কথাবার্তাটা এবার আগে থাকতে আস্কারা হয়ে যায় যেন। সেবারে যত গোলমাল, সমস্ত ঐ দোষে। আরে বাবু, গণেশ-পূজো না হলে মা-দুর্গা ভোগ কি নেন কখনো ? হল না তাই।

(৯)

সমন লইয়া আদালতের পেয়াদা দেখা দিল।

মালাধর পড়িয়া যাইতেছিল, বাদী শ্রীমত্যা সৌদামিনী ঘোষ, জওজে মৃত শিবনারায়ণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেশা—

দেখি—বলিয়া নরহরি তার হাত হইতে কাগজটা টানিয়া লইয়া টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

মালাধর কহিল, শেষকালে ঐ যে লিখেছে, বুধবারে অত্র আদালতে উপস্থিত হইবা—মোটের উপর তারিখটা যেন ঠিক থাকে হুজুর।

চৌধুরি মালাধরের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে

মালাধর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল, মানে, ফৌজদারি মামলা কি না—অন্তর্জলী থেকে আসামি টেনে তুলে নিয়ে যায়। তাইতে বলছিলাম। তা দেখুন না হয় একবার যুক্তি-পরামর্শ করে—

হঠাৎ নরহরি হাসিয়া উঠিলেন! নীরস ভয়ানক হাসি, অন্তরের মধ্য অবধি কাঁপিয়া উঠে। বলিলেন, শ্যামগঞ্জের চৌধুরিরা কোন্ পুরুষে কবে কাঠগড়ায় উঠেছে মালাধর, যে মামলার তারিখ মনে করিয়ে দিচ্ছ? মরদে মরদে বিবাদ, লাঠিতে লাঠিতে তার মীমাংসা—আইন-আদালত করবে কি?

নিশ্বাস ফেলিয়া এক মুহূর্ত তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, তবে কি না এবার মাঝে মেয়েমানুষ এসেছে! বরগডাঙার গিন্নি কসবায় গিয়ে এমন করে মাথা মুড়োবেন, কে জানত? হাকিমের কাছে না কেঁদে আমার আছে কাঁদলে দিতাম এ সমস্ত ছেড়েছুড়ে—

চৌধুরি গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। মালাধর শ্যামকান্তর বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গেল। অনেকক্ষণ এমনি কাটিল। শেষে নরহরি ডাকিলেন, রঘুনাথ!

রঘুনাথ আসিলে বলিলেন, চল ঘুরে আসি। দু-জনে অনেক দিন পরে পাল্লা দিয়ে আজ ঘোড়া ছোটানো যাবে।

সর্দার ও মনিব মালঞ্চের কূলে কূলে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। বালুকায় ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতেছে না। অনেক রাত্রি, চারিদিকে অতল নিস্তব্ধতা। তেঘরার বাঁকে জল নাই মোটে। নদীজলে ঘোড়া নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তাঁরা পার হইয়া উঠিলেন।

গভীর রাত্রে কেউ মালঞ্চের রূপ দেখিয়াছ?

ভাঁটার টান শেষ হইয়া ঘোলা জল থমকিয়া দাঁড়ায়, জেলেরা জাল তুলিয়া লণ্ঠনের আলোয় বাঁধের পথে ঘরে ফিরে, আবছা অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারা ঝিকমিক করে। ওপারে নির্জন নিঃশব্দ দিগন্তবিসারী মাঠ, এপারে ঢালিপাড়ার

শত শত খোড়োঘর, বাবলা-বন। ঠিক এই সময়টা শ্রান্ত অবসন্ন নদী শিথিল দেহ এলাইয়া যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। খড়ের নৌকা, ধানের নৌকা, পূবদেশি ব্যাপারির লঙ্কা-হলুদের নৌকা সমস্ত সারি সারি নোঙর ফেলিয়া বালুতটে মাথা রাখিয়া ঘুমায়। দিনের আলোয় যে মরদগুলার লম্বা পাকা লাঠি আর চিতানো চওড়া বুক দেখিয়া চমকিয়া ওঠ, রাতের নক্ষত্রালোকে মাটির দাওয়ায় কাঠির মাদুরের উপর অসহায়ের মতো তারাও পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। হয়তো হঠাৎ অনেক দূর হইতে অস্পষ্ট একটা কুকুরের ডাক আসে, শোঁ করিয়া আকাশে একটা উল্কা ছুটিয়া যায়, এক ঝলক শীতল নৈশ বাতাস ঘুমের মধ্যে একবার বা পাশমোড়া দিয়া জাগিয়া ওঠে। হাওয়ায় হাওয়ায় জলতরঙ্গে সেই অপরূপ নির্জনতায় রূপসী মালঞ্চের এলানো আঁচল, গায়ের কত গহনা ঝলমল করিয়া ওঠে!

এত পথ দু-জনে চলিয়া আসিলেন, ভাল-মন্দ একটি কথা নাই। যেখান হইতে নরহরি ঘোড়ায় চাপিয়াছিলেন, চাতালের নিকট সেইখানটিতে আসিয়া তিনি লাফাইয়া নামিলেন। পুরাণো দুর্গের মতো বিশাল প্রাসাদ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে; রঘুনাথ ঘোড়া দু'টি আস্তাবলে লইয়া গেল। উঠানে ঢুকিয়া নরহরি দেখিলেন, শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় আলো। অত বড় মহালের মধ্যে কেবল শ্যামকান্ত ও মালাধর জাগিয়া থাকিয়া কি পরামর্শে মাতিয়া আছে। মালাধরের এখন আর বাড়ি হইতে আসা যাওয়া করিতে হয় না, এখানেই থাকে, বৈঠকখানার পাশের ঘরটা শ্যামকান্ত তাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। নরহরি ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, কসবায় গিয়েছিলাম—

পরামর্শ বন্ধ হইয়া গেল, দু-জনেই তাঁর মুখের দিকে চাহিল। নরহরি বলিতে লাগিলেন, কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না—শিবনারায়ণের বউ সত্যি সত্যি গিয়েছে মামলা করতে। একি একটা বিশ্বাস হবার কথা? অথচ সমন দেখে অবিশ্বাসই বা করি কি করে? তাই গেলাম ভাল করে খবরটা নিতে। শশিশেখরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি কাণ্ড বাপু? সে বলল, দেওয়ানি-ফৌজদারি আজকাল কোন জমিদারের ঘরে বিশ-পঁচিশ নম্বর না আছে? ওতে আর ভয়টা কি!

বলিয়া নরহরি একটু হাসিলেন। বলিতে লাগিলেন, শশিশেখর অভয় দিল,

তবু ভয় আমার এত হয়েছে—সমস্ত পথ কেবল ভাবতে ভাবতে এসেছি। ঐ সমস্ত করে এখন থেকে বিষয় রাখতে হবে নাকি?

মালাধর বলিল, কোন ভাবনা নেই। আমরাই বা পিছপাও কিসে? বড়বাবুকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

সে কথা কানে না লইয়া নরহরি বলিতে লাগিলেন, বরণডাঙার গিন্নি যা করেছেন, ঐ চলবে এখন দেশের মধ্যে। পুরুষ-জোয়ান নেই আর, সমস্ত মেয়ে-রাজ্য। আমি আর করব কি—সত্যিই আমার ছুটি। যা করতে হয় তুমি কর শ্যামকান্ত। আমি মামলা-মোকর্দমা করে বেড়াতে পারব না—বুঝিও না।

মালাধর তৎক্ষণাৎ বলিল, বেশ তো হুজুর, আমরাই করব। তুই তুড়ি দিয়ে মামলা জিতে আসব। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। হেঁ হেঁ—পনের আনা তদ্বির এরই মধ্যে সারা হয়ে গেছে।

শ্যামকান্ত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তা ঠিক। বড্ড কাজের লোক এই মালাধর। ওকে পেয়ে খুব কাজ হল। মামলার জন্যে ভয় নেই বাবা।

নরহরির মুখে হাসি ফুটিল। বলিলেন—ভয়? ভয়ই সত্যি। কিন্তু আসল ভয়টা হচ্ছে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি—তোমাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি নে।

তারপর পুরাণো স্মৃতির ভারে নরহরির কণ্ঠস্বর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণের বউ গেল কসবায় নাক কাঁদতে। বাঘের ঘরণীর এই দশা—কিসে আর সাহস থাকে বল। শিবনারায়ণের বিদ্যের কাছে নবদ্বীপের বামুনদের অবধি মাথা হেঁট হয়ে যেত। আর কি লাঠিই ধরত! লাঠির লোভ দেখিয়ে চিন্তামণি-ওস্তাদকে কেড়ে নিয়ে গেল। প্রথম যেদিন দেখা হয়, এমন মার মেরেছিল—কবজির উপর আজও এই দাগ রয়ে গেছে। বলিয়া একটি স্বল্পাবশেষ আঘাত-চিহ্নের উপর সগর্বে তিনি আঙুল রাখিলেন।

শ্যামকান্ত বলিল, অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে।

নরহরি বলিলেন, হ্যাঁ, যাই। পুরোপুরি বিশ্রাম এবার। আমি কিছুতে বুঝতে পারছিনে শ্যামকান্ত, এখনও চিন্তামণি-ওস্তাদ বর্তমান রয়েছে, অথচ জমাজমির হাঙ্গামায় বরণডাঙার বাড়ি থেকে লাঠি বেরুল না, বেরুল একরাশ কাগজপত্তোর। তাই তো বলি, আমরা সেকেলে মানুষ—বিদ্যে তো আঁকুড়ে ক আর বকঠুঁটো খ—ঐ সব কাগজপত্তোরের আমরা বুঝি কি? তুমি বিদ্বান হয়ে এসেছ, ও-সব তোমাদের পোষায়। এই কথাটাই তোমাকে বলতে এলাম।

বলিয়া হাসির শব্দে চতুর্দিক সচকিত করিয়া নরহরি বাহির হইয়া গেলেন।

পাশের ঘরে সকলে অঘোরে ঘুমাইতেছে, নিশ্বাসের গভীর শব্দ আসিতেছে। নরহরির কিন্তু ঘুম নাই। শিয়রের দেয়ালে আংটার উপরে সযত্নে লাঠি রাখা আছে। এ লাঠির ব্যবহার এখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, পঞ্চাশ বছর আগে কিশোর বয়সে প্রথম তিনি এই লাঠি ধরিয়াছিলেন। লাঠির মাথায় পেঁচানো সোনার সাপ, সাপের দুই চোখে দু'টি লাল পাথর। নরহরি ঘুমাইয়া পড়িলে যৌবনের সাথী লাঠিখানা এখনও পাথরের চোখ মেলিয়া পাহারা দিয়া থাকে। নির্জন কক্ষে লাঠিয়ালের সঙ্গে লাঠি কথা বলে। আজ রাত্রে বাদাম-বনে কুয়োপাখী ক্রমাগত ডাকিতেছে, ডাকাতের বিল ভরিয়া অজস্র জোনাকি—যেন আকাশের সমস্ত তারা ভাঙিয়া খসিয়া ধুলার মতো হইয়া উড়িতেছে, যেন মাঠের মধ্যে শত শত দীপ জালিয়া বড় ধুম করিয়া কাদের বিয়ে হইতেছে। নরহরির কি হইল—অনেক দিনের পর লাঠিটা নামাইয়া মুঠা করিয়া ধরিয়া শয্যার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিশোর কালে এমনি করিয়া লাঠি ধরিতে বুক ফুলিয়া উঠিত! অভ্যাসের বসে এখন আর সে উত্তেজনা নাই, লাঠির পরে সে ভালবাসা নাই, লাঠি যেন নরহরির মুখোমুখি চাহিয়া সেই সব দিনের জন্য কত দুঃখ করিতে লাগিল।

ও-ঘরে হঠাৎ স্বর্ণলতা ধড়মড় করিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া বসিল। বোধকরি কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। সভয়কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, বউদিদি, বউদিদি!

ঝিকে ডাকিতে লাগিল, হাবির মা, হাবির মা গো—

নরহরি ডাকিলেন, এস মা, তুমি এ-ঘরে চলে এস।

বাপের আদরে ঘুম-চোখে স্বর্ণ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। এত রাত্রে বাপের হাতে লাঠি! স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল।

লাঠি কি হবে বাবা?

কি হবে ভাবছি তো তাই। ফেলে দেব।

স্বর্ণ বলিল, আমি নেব।

নিবি তুই? নিবি? তারপর অসহায়ের মতো কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, যার নেবার কথা, সে নিল না। ওরা নেবেও না কোনদিন।···স্বর্ণ, তুই লাঠি শিখবি?

স্বর্ণলতা আনন্দ আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। বলিল, হ্যাঁ বাবা। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে। দিনে না পার, রাতে শিখিও। বড় আলোটা জেলে দিয়ে শিখব—আমি ঘুমুব না।

নরহরি বলিলেন, না মা, দিনমানেই শিখো তুমি—সমস্ত দিন ধরে আমি তোমাকে লাঠি শেখাব। এবার আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে।

স্বর্ণ বাহু দিয়া বাপের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। বলিল, বেশ হবে বাবা, খুব ভাল হবে। তুমি আর কোথাও যাবে না তা হলে? কোথাও না? তারপর অল্প একটু হাসিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত চুপি চুপি কহিল, আজকে তবে তোমার সঙ্গে শোব বাবা।

নরহরি মেয়েকে পাশে বসাইয়া মাথার উপর হাতখানি রাখিলেন।

(১০)

স্বর্ণের আজকাল মাটিতে পা পড়ে না। পড়িবার কথাও নয়, সে দশের বাড়ি অবধি শিখিয়া ফেলিয়াছে। লাঠি হাতে একবার সোজা হইয়া দাঁড়ায়, একবার বা হাঁটু গাড়িয়া বসে, কখনও মাটিতে শুইয়া পড়ে। ভাবখানা, যেন সামনে তার শ' দুই-তিন লোক, আর সে একলা অত লোকের মহড়া লইতে লাগিয়াছে।

নরহরি টিপিটিপি হাসেন। সরস্বতী প্রশংসমান চোখে চাহিয়া থাকে। তারও বড় লোভ হয়। নরহরি যখন সামনে না থাকেন এক একদিন করুণা-পরবশ হইয়া স্বর্ণ বলে, আচ্ছা, ধর্ তুই একখানা লাঠি—এমনি করে, হ্যাঁ—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এদিক-ওদিক তাকাইয়া সরস্বতী লাঠি তুলিয়া লয়। বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করে, বার বার চারিদিকে চায়, স্বর্ণ যেমন করিয়া বলে তেমন ধরা হয় না। হঠাৎ গায়ের উপর স্বর্ণের লাঠির চোট আসিয়া পড়ে, সামলাইতে পারে না। হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া সরস্বতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। বলে, থাক ভাই, থাক তোর দশের বাড়ি। ঠাকুরজামায়ের জন্যে তুলে রেখে দে। তখন কাজে আসবে। আমাদের উপর বাজে খরচ করিস নে।

বাড়ির মধ্যে দুষ্ট কেবল শ্যামকান্ত। সে বড় ক্ষেপায়। আরশুলায় স্বর্ণের বড় ভয়, আরশুলা উড়িতে দেখিলে সে আঁতকাইয়া উঠে, গায়ে পড়িলে চেঁচাইয়া বাড়িতে লোক জড় করে। ইদানীং বাপের কাছে লাঠি শিখিয়া লাঠিয়াল হইতেছে, আরশুলার ভয় কিন্তু যায় নাই। শ্যামকান্ত তার নূতন নামকরণ করিয়াছে—আরশুলা-পালোয়ান। ঐ নামেই যখন-তখন ডাকে। তাই শ্যামকান্তকে লুকাইয়া লাঠি খেলিতে হয়।

স্বর্ণ বলে, বাবা, বউদিদিকে তুমি কিছু শেখাও না। ও কাঁদে।

হাসিমুখে নরহরি জিজ্ঞাসা করেন, তাই নাকি রে?

এমন মিথ্যুক স্বর্ণ! কাঁদিল সে কবে? বড় বড় চোখে সরস্বতী স্বর্ণের দিকে চায়। তারপর কিন্তু সত্যসত্যই চোখে জল আসিয়া পড়ে। শ্বশুরের প্রতি অভিমান হয় বড়। নরহরি তবু হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়েন। বলেন, সে হচ্ছে না, দুষ্টু বেটি। ছেলে আমার লাঠি উঁচু করে ধরতে আছাড় খায়, লাঠি শিখে তাকে বুঝি নাকানি-চুবানি খাওয়ানোর মতলব? আচ্ছা, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ—সে-ই বা কি বলে!

সেদিককার মতামত সরস্বতীর ভাল করিয়াই জানা আছে, জিজ্ঞাসার আবশ্যক হয় না। কোনদিন বা নরহরি বলেন, আচ্ছা বেশ—মুখ ভার করে থেক না মেয়ে। এস এদিকে, লাঠিখেলা থাক—হাতের খেলা বরঞ্চ দু-

একটা শিখিয়ে দিই। বলিয়া হাত মুঠা করিয়া কয়েকটি ভঙ্গি দেখাইয়া দেন। লাজুক মুখে সরস্বতী অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে। নরহরি হাসিয়া বলেন, ঐ হয়েছে। ব্যস, আজকে থাক এই অবধি। এইটে এখন ভাল করে শেখ। তারপর শ্যামকান্তর ইচ্ছেটা কি—তোমাদের নতুন কালের পথ কোনটা—ভাল করে জেনে নিয়ে দেখা যাবে তখন।

স্বর্ণ চুপি-চুপি বউদিদির কানে বলে, এই, এক বুদ্ধি শোন্। সব ঠিক হয়ে যাবে। যা শিখলি, ঐটেই আজ ভাল করে চালাবি দাদার পিঠের উপর। তখন মত দেবার দিশে পাবে না। বুঝলি?

সরস্বতী স্বর্ণের গায়ে চিমটি কাটিয়া দেয়।

আবার বাপে মেয়েয়লাঠি লইয়া পায়তারা দিতে থাকে। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সরস্বতী ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। নরহরি তাহাকে এড়াইতে চান, সরস্বতী স্পষ্ট বুঝিয়াছে।

একদিন উহাদের ঐ আখড়ায় রঘুনাথ আসিয়া ডাক দিল, চৌধুরি মশায়!

নরহরি ঘাড় নাড়িয়া না-না করিয়া উঠিলেন। বৈঠকখানার দিকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, এখানে নয় সর্দার, কাছারি এখন ঐ দিকে। যাও তোমাদের বড়বাবুর আছে। আমার ছুটি—

রঘুনাথ বলিল, তাই তো অবাক হয়ে যাচ্ছি, এটা কি রকম হল? দুই পক্ষে সাজ-সাজ পড়ে গেছে। উকিল-মুহুরিগুলো আদালতের বটতলায় টুল পেতে ঝিমোত, এখন তারা সব চাপকান মেরামত করে ঐ ভরসায় হা-পিত্যেশ তাকিয়ে আছে। সৌদামিনী ঠাকরুন কসবায় কায়েমি বাসাভাড়া নিলেন, আর আপনি নিলেন ছুটি!

নরহরি বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, মামলা হবার আগেই আমার হার। অনেকে অনেক কথাই বলে সর্দার, সব আমার কানে আসে। তোমাদের বড়বাবুও নাকি বলাবলি করছিলেন, মামলার তোড়জোড় দেখে বাবা ভয় পেয়ে গেছেন। আহা, ছেলের আমার একান্ত ইচ্ছা, জমিদারি করে বেড়ায়। দোষ দিই নে।

অনেক বিদ্যে শিখেছে—বিদ্যে খাটাবার উপায় তো চাই! আমি তাই উপায় করে দিলাম। বলিয়া নরহরি চুপ করিলেন।

চির-কঠোর সর্দারের চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়ে বুঝি! রুদ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ কহিল, চৌধুরি মশায়, আমরা তো বিদ্যে শিখি নি—আমাদের উপায়?

বিদ্যে না শিখলে বিতুর হয়ে ক্ষুদ খেয়ে বিদায় নিতে হবে। অন্য উপায় নেই। নিজের রসিকতায় চৌধুরি নিজেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, দিন বদলাচ্ছে। তুমি-আমি লাঠি ধরে ঠেকাতে পারব কেন? ধুলোয় পড়ে মরে থাকব, কেউ চেয়েও দেখবে না। তার চেয়ে শ্যামকান্ত যেমন যেমন বলে, সেই রকম করে যাও—সুখে থাকবে। ওর খুব সাফ মাথা, সব জিনিস ভালো বোঝে।

আর আপনি?

নরহরি বলিলেন, আমার কথা কেন সর্দার? বুড়ো হয়ে গেছি।

রঘুনাথ বলিল, কিন্তু আমরা বরাবর ভাবতাম, বুড়ো কোনদিন হবেন না আপনি—

কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া নরহরি বলিতে লাগিলেন, আমিও ভাবতাম তাই। দশটা দিন আগেও বুড়ো ছিলাম না। বউভাসির চকে তোমরা সব লাঙল চালাতে গেলে—কেউ মাঠে, কেউ বাঁধে, কেউ বা নৌকোর মধ্যে সমস্ত দিন ধরে হল্লা করে এলে। সন্ধ্যের পর শ্যামকান্ত এল সঙ্গে দু-চারজন মাতব্বর ব্যক্তি। সবাই বলে, দিন দুপুরে পরের জমিতে পড়ে এমনটা করা ঠিক নয়। আইন বড় খারাপ। আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। আইন আবার কি? যার লাঠি, তার মাটি—এই তো আইন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন, বুড়ো হয়েছি বলে সেদিনও আমি ভাবতে পারি নি। ওদের সমস্ত কথায় কেবলি হাসি পাচ্ছিল। ভাবছিলাম, শ্যামশরণ চৌধুরির বাড়ির মধ্যে এসে এরা এসব বলে কি? দাঙ্গার দোষ দেখাচ্ছে এখানে বসে! ঐ পাথরের দেয়ালগুলোর যদি জোড় খুলে দেখা যায়, ওর ভাঁজে ভাঁজে কত মাথার খুলি কত হাড়-পাঁজরা

বেরুবে বল তো? শশিশেখরকে বলছিলাম তাই যে, দেশসুদ্ধ বুড়িয়ে গেল কি করে? শশিশেখর বলল, বুড়ো আপনিই তালুই মশাই। বসে বসে মড়ার হাড় আগলাচ্ছেন, ওদিকে আর কেউ ফিরেও চাইবে না।

রঘুনাথ রাগ করিয়া বলিল, না চাইল তো বয়ে গেল। কিন্তু লাঠি হল গিয়ে মড়ার হাড়? শশী উকিল বলল একথা?

নরহরি বলিতে লাগিলেন, অন্যায় কথা কি বলেছে সর্দার? আমাদের বাপ-পিতামহের হাড় এই লাঠি। কত পুরুষ ধরে এই লাঠি রাজ্য করে এসেছে। এবার যদি সে লাঠিতে ঘুন ধরে থাকে, ঝগড়া করতে যাব কার সঙ্গে?

অনেক দিনের লোক রঘুনাথ, নরহরির অনেক সুখ-দুঃখের সাথী। রাগের মুখে তার পাত্রাপাত্র জ্ঞান রহিল না। বলিল, আমরা সামান্য লোক—ঢালি, আমাদের লাঠিতে ঘুন ধরবার দেরি আছে চৌধুরি মশাই। সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে এবার আপনি লাঠি অন্দরে নিয়ে এসেছেন, ঘুন-ধরা লাঠি মেয়েদের হাতে দিয়ে যাবেন বুঝি!

চৌধুরি হাসিতে লাগিলেন। হাসিমুখে বলিলেন, ঠিক তাই। যাকে দেব ভেবেছিলাম, সে নিল না। তাদের দরকার নেই—কি করব? কি ভেবেছিলাম শুনবে সর্দার?

বলিতে বলিতে সহসা চৌধুরির কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, মুখের ভাব কেমন এক-রকম হইয়া গেল। বলিতে লাগিলেন, ইচ্ছা ছিল—শ্যামশরণকে আবার তাঁর পুরাণো বাড়িতে নিয়ে আসব। শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়ত, বিশ্বাস করি নি তার কথা। মিল করে ছেলের নামও রেখে দিলাম শ্যামকান্ত। তোড়জোড়ের ত্রুটি থাকল না, কিন্তু শুকনো গাছ ঠেলে উঁচু করে ধরলেই কি আর তাতে পাতা গজায়? শ্যামশরণ স্বর্গে বসে হাসতে লাগলেন, নামের ফাঁকি অপমান হয়ে রাতদিন আমার বুকে সূঁচ ফোটাচ্ছে।

রঘুনাথ বলিল, লাঠি নিয়ে তাই এবার খেলতে লেগেছেন চৌধুরি মশাই। বেশি বুদ্ধি হয়েছে। দু-চারদিন খেলার পর ওঁদের শখ মিটবে—তখন লাঠি উনুনে চলে যাবে। রান্নাঘরের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে বটে।

খেলা? না, তা হবে না। দৃঢ় কণ্ঠে নরহরি বলিতে লাগিলেন, আগুনে পোড়ে পুড়বে—তবু আমার লাঠি নিয়ে কাউকে আমি খেলতে দেব না। লোকে বলে, লাঠিখেলা। খেলা করতে করতে আমিও এই লাঠি শিখেছিলাম। কিন্তু এখন এই ডানহাত আমার যেমন, হাতের লাঠিখানাও তেমনি। তাই নিয়ে খেলা করতে দেব আমি? আমার লাঠি মরবার আগে মেয়ের হাতে দিয়ে যাব—আর নয় তো মালঞ্চের জলে। রাতদিন তাই মেয়েকে নিয়ে আছি, ঘুমিয়েও স্বস্তি নেই। তা ও পারবে···পারবি না রে খুকী?

রঘুনাথ নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। নরহরি বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, বউমা আমার মুখখানা শুকনো করে বসে বসে দেখছেন। কিন্তু হবে না মা, তোমার রক্তে এ জিনিস নেই। যার সঙ্গে তোমার জীবন কাটাতে হবে, সে অশ্রদ্ধা করে একে। তোমার হাতে আমি কি খেলা করতে লাঠি দেব?

আবার বলিয়া উঠিলেন, রঘুনাথ, তোমার মেয়েকেও শেখাও না দু-চারটে বাড়ি। ভাল মেয়ে যমুনা।

(১১)

বাপের কাঁধের বোঝা শ্যামকান্ত সর্বান্তঃকরণেই লইয়াছে। পিতৃভক্ত ছেলে, সন্দেহ নাই। দিনরাত যুক্তি-পরামর্শ, লোকজন ডাকাডাকি। মালাধর তো ভোরবেলা হইতেই কুড়িখানেক মানুষ লইয়া সাক্ষির তালিম দিতে বসিয়া যায়। দু-একদিন অন্তর কসবায় গতায়াত চলিতেছে। এমনি সময়ে একদিন শ্যামকান্ত মালাধরের সঙ্গে নরহরির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, নানা রকম ছল-ছুতো করে অনেক দিন কাটান গেল। এবারে হাকিম আর শুনবে না। পরশু মোকর্দমা।

নরহরি বলিলেন, আমি তা শুনে কি করব?

শ্যামকান্ত বলিল, আপনি আপনার ঘোড়ায় যাবেন। শেষরাতে রওনা হলে আদালত বসবার মুখেই পৌঁছে যাবেন। আমরা কাল সকালে আগে-ভাগে পানসিতে রওনা হব।

নরহরি বলিলেন, মামলা-মোকর্দমা আমি তো বুঝি নে। আমি গিয়ে করব কি?

মালাধর সামনে চলিয়া আসিল। হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, বুঝতে হবে না কিছু। বুঝবার কিছু বাকি রেখেছি আমরা? সমস্ত ঠিকঠাক। আপনি খালি বলে আসবেন, বউভাসির চক বলে কথিত সম্পত্তিতে আপনি বিশ বছরের দখলিকার। ব্যস!

নরহরি বলিলেন, বললেই অমনি হয়ে যাবে?

মালাধর সগর্বে শ্যামকান্তর দিকে চাহিল। বলিল, তা হবে কেন? আরো কত পাকা দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে! অত বড় পানসি তবে ভাড়া হচ্ছে কি জন্যে?

দলিলের সিন্দুকসুদ্ধ নিয়ে যাবে নাকি?

মালাধর হাসিয়া বলিল, সিন্দুকে আর ক'টা দলিল আছে চৌধুরি মশাই? বেশির ভাগ তো এখনও চালের কলসিতে। নরহরির বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। কলসির ভিতর সব পড়ে পড়ে পুরাণো হচ্ছে। শ্যামশরণের আমলেরও রয়েছে—আজকের নয়। জমাখরচ সেহা করচা—সমস্ত। বেরুক আগে, দেখবেন তখন। কারো বাপের সাধ্যি হবে না যে বলে, এসব আপনার গোলাম এই অধমাধম মালাধর সেনের কারুকার্য। বলিয়া নিজের চতুরতায় মালাধর হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসি থামিয়া গেল নরহরির কথায়। শ্যামকান্তকে লক্ষ্য করিয়া নরহরি গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, আমার কোন পুরুষে কেউ কাঠগড়ায় ওঠেন নি, আমিও উঠব না। আমার ছুটি। যা করতে হয়, তোমরা কর গিয়ে। এতখানি করে ফেলেছ, আর বাকিটুকু পারবে না?

শ্যামকান্ত বলিল, তা যদি হত, মিছামিছি আপনাকে কষ্ট দেব কেন বলুন? আপনার নামে বিষয়, মোকর্দমাও আপনার নামে—একটা বার শুধু হাকিমকে দেখা দিয়ে আসতে হবে। তারপর অতিশয় ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল, আমরা অনেক খেটেছি, সমস্ত একেবারে অনর্থক হয়ে যাবে। আর এটায় গোলমাল

বেরুলে—বলা তো যায় না, ফৌজদারিতে যদি জেলের হুকুম-টুকুম হয়ে বসে, তাতেও মুখ উজ্জ্বল হবে না বাবা। এবারটা আপনাকে যেতেই হবে।

মালাধরও বলিল, কোন গোলমাল নেই চৌধুরি মশাই। এজলাসে গিয়ে হলফ পড়বেন—ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া যাহা বলিতেছি তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তারপর ক'টা মাত্র কথা বলেই খালাস। তার পরে আমরা তো রইলাম—

শেষ পর্যন্ত কিন্তু গোলমাল বেশ জমিয়া উঠিল।

নরহরি কাঠগড়ায় উঠিয়া কথা কয়টি নির্ভুল ভাবেই বলিলেন, বউভাসি নামক একটি চক সৌদামিনী কিনিয়াছেন বটে, কিন্তু জমি তাহাতে মাত্র দুই-তিন শ' বিঘা। চকের উত্তর সীমানা নরহরির চক। সেই চকের জমি অন্যায়-ভাবে গ্রাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। নরহরির প্রজাপাটক ঐ সব জমি বরাবর চাষ করিয়া থাকে—এ কেবল এবারের একটি দিনের ঘটনা নহে। কিন্তু মিথ্যা মামলার সৃষ্টি করিয়া চৌধুরিকে নাস্তানাবুদ করা এই প্রথম।

প্রমাণ ?

প্রমাণের অভাব নাই কিছু। কয়পক্ষে ঝুড়িখানেক কাগজপত্র দাখিল হইয়াছে। কতকগুলি তার অতি-পুরাণো সেকেলে অদ্ভুত ছাঁদে লেখা, পোকায় কাটা। আবার পাল্টা জবাবে বরণডাঙা তরফ হইতে যাহা সব বাহির হইতে লাগিল, তাহাতেও আতঙ্ক লাগে। হাজার দলিলের হাজার রকম মর্ম গ্রহণ করিতে করিতে টানাপাখার নিচে বসিয়াও হাকিম গলদঘর্ম হইয়া উঠিলেন।

কাগজের স্তূপ উল্টাইতে উল্টাইতে বরণডাঙা-পক্ষের পরেশ উকিল নরহরিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাপরে বাপ! আয়োজন সামান্য নয়। একেবারে বিশ বছরের দাখলে সংগ্রহ। একখানা হারায় নি, নষ্ট হয় নি। আপনার প্রজারাও বড় ভালো চৌধুরি মশাই। দলিলগুলো দরকার মাফিক ঠিক ঠিক বের করে এনে দিয়েছে।

নরহরি রাগ করিয়া বলিলেন, ভাগ্যিস দিতে পেরেছে। নইলে আপনাদের দয়ার বাঁধা-কইমাছ যে এতক্ষণ কানে হেঁটে বেড়াত!

কিন্তু এত দাখলে লেখা হল কোথায়, তাই কেবল ভাবছি।

মালাধর নরহরির পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। ফিসফিস করিয়া সে সমঝাইয়া দিল, মস্ত বড় কাছারি রয়েছে আমাদের। আটচালা ঘর—দেউড়ি সমেত। সেখানেই আদায়পত্তোর হয়, দাখলে লেখা হয়—

নরহরি কহিলেন, ভেবে কিনারা করতে পারলেন না উকিল বাবু? দাখলে লেখা হয়ে থাকে পাটের আড়তে।

উকিল মৃদু হাসিয়া বলিল, পাটের আড়তে নয়, পাটোয়ারির ঘরে। সে আমি জানি।

নরহরি কহিলেন, তা যদি বলেন, আমার কাছারি-ঘরটা তবে একদিন দয়া করে দেখে আসবেন মশাই।

উকিল কহিল, আমি কেন—যাঁরা দেখবার তাঁরাই গিয়ে দেখে আসবেন। ঘরটা শক্ত করে বাঁধবেন—দেখবার আগেই যেন উড়ে না পালায়।

সৌদামিনীর উকিল পুরা দুইদিন এমনি কত কি জেরা করিল, পনের-কুড়িটা সাক্ষিরও তলব হইল। কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় না, সমস্যা আরও সঙ্গিন হইয়া ওঠে।

হাকিম রাগ করিয়া কলম ছুঁড়িয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে সরেজমিন তদন্তের হুকুম লইল। বিচার স্থগিত রহিল।

বাহিরে আসিয়া মালাধর হাসিয়া খুন। বলে, রসগোল্লা খাওয়ান বড়বাবু। জয় নির্ঘাৎ। গোটা ঢালিপাড়া প্রজা হয়ে এসেছে, পানসির খোল বোঝাই দলিল-দস্তাবেজ—তার উপর কাছারি-বাড়ি, নায়েব-গোমস্তা···আর চৌধুরি মশাই যা বলা বলে এলেন—

শ্যামকান্ত বলিল, রোসো—তদন্তটা হয়ে যাক আগে। কোন বেটা যাবে, সে আবার কি করে আসে—

মালাধর বলিল, ফৌজদারি তো ফেঁসে গেল। এখন স্বত্বাসত্ত্বের কথা।

দেওয়ানি মামলা মশাই, যার নাম হল 'দেও আনি'—যা কিছু আছে, সব এনে এনে দিয়ে যাও। ব্যস্! তদন্ত এখন গড়াতে গড়াতে ছ-মাসের ধাক্কা। ছুটো মাস সময় দিন আমাকে—কি কাছাড়ি-বাড়ি করে দেব দেখবেন। ছুটো মাসের মাত্র সময় চাই।

কিন্তু স্বপ্নেও যাহা আন্দাজ হয় নাই, তাহাই ঘটিল। আদালতের আদিকাল হইতে এমন অসম্ভব কাণ্ড বোধকরি কখন হয় নাই। ঐ শ্যামগঞ্জ-বরণডাঙা অঞ্চলটাতে জমাজমি-ঘটিত আরো কয়টা তদন্ত ছিল। ডেপুটি যাওয়ার ঠিক হইয়াই ছিল। তাঁর সেই তালিকার মধ্যে বউভাসিটাও জুড়িয়া দেওয়া হইল। ঢালিপাড়ার যারা সাক্ষি হইয়া আসিয়াছিল, তারা সব বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে; কেবল পরবর্তী আর কয়েকটি কাজকর্মের দরুন এবং শশিশেখর একটু ছোট-খাট ভোজের আয়োজন করিয়াছে সেইজন্য নরহরিরা যান নাই। রঘুনাথ ঘোড়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, ভোররাত্রে পানসিতে ইহারা একত্র হইয়া রওনা হইবেন, এইরূপ ঠিক আছে। বিকালে অকস্মাৎ শশিশেখর জরুরি খবর পাইল, ডেপুটি বউভাসির চকের তদন্ত করিতে পরের দিনই পৌঁছিয়া যাইবেন।

শ্যামকান্ত মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন উপায়? তদন্তের তারিখ একটা সপ্তাহও পিছাইয়া দেওয়া যায় না?

শশিশেখর কহিল, বউভাসি পথেই পড়ে গেল কিনা! ঐটে সেরে তারপর অন্যান্য জায়গায় যাবেন। ও আর ঠেকাবার উপায় নেই। এখনো বেলা আছে, চলে যান—কাছারি গিয়ে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে-গাছিয়ে ফেলুন গে—

নরহরি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, মালাধর রয়েছে—গুছাবার বাকি নেই কিছু। কাছারিরই কেবল অভাব। কিন্তু মালাধর, আমাকে এমন করে দাঁড় করিয়ে তোমরা মিথ্যেবাদী সাজালে? ঘোষগিন্নি এখনই হাসতে আরম্ভ করেছে, আমি টের পাচ্ছি।

মালাধর রুদ্ধস্বরে কহিল, হাসে কি সাধে কর্তা? ঘুস দিয়েছে কত? আদালত-বাড়ির টিকটিকিগুলোর পর্যন্ত পেট ভরতি। আর আমাদের হল কি?

আমি করছি তদ্বির, টাকার থলি বড়বাবুর হাতে। অমন কাঁচা তদ্বিরে কাজ হয় কখনো ?

খুব তাড়াতাড়ি ফিরিবার দরকার। আর পানসি নয়—তিনখানা পালকির বন্দোবস্ত হইল। নরহরি শ্যামকান্ত মালাধর—সকলেরই পালকি। হুমহাম করিয়া বিকালবেলা বেহারারা শ্যামগঞ্জের দিকে ছুটিল।

(১২)

বর ! বর !

ঠাহর করিয়া দেখিয়া ভানুচাঁদ বলিল, হ্যাঁ, বরই বটে ! বরের পালকি, কনের পালকি—আর ঐ শেষের পালকি মেরে চলেছেন বোধ হয় ওদের পুরুত মশায়—

ঘাটে ছিল একখানা ডিঙি, সেইটাই ঠেলিয়া সে স্রোতে ভাসাইয়া দিল। ঝুপ-ঝাপ করিয়া তখন আরও আট-দশ জন জলে ঝাঁপাইয়া আসিয়া ডিঙিতে চড়িয়া বসিল। অত লোকের ভারে ডিঙি জলের উপর আঙুল তিনেক মাত্র জাগিয়া আছে। একটু এপাশ-ওপাশ করিলেই জল ওঠে।

আকাশে চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদ। অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় রঘুনাথও ওপারের দিকে খানিকক্ষণ নজর করিয়া দেখিল। তারপর কহিল, বর না হাতী! না বাজনাদার, না একটা বরযাত্রী···আরে একটা বোঠেও নিতে পারিস নি তোরা কেউ, হাত দিয়ে কাঁহাতক উজোন ঠেলে মরবি ? বর—তা তোদের এত তাড়া কিসের ? বরের তো মাথায় দুটো শিং বেরোয় নি !

ভানুচাঁদ মাঝ-নদী হইতে কহিল, বাজনা-টাজনা সব আগে ভাগে রওনা করে দিয়েছে। বোঠে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে এরাও সরে পড়বে ততক্ষণে। চুপি চুপি চলেছে কেমন—বারোয়ারির চাঁদা-টাদা বলে পথে কিছু না দিতে হয়! মানুষ আজকাল কম শয়তান হয়ে উঠেছে !

কিন্তু আশ্চর্য, পালকি না পলাইয়া ওপারের খেয়াঘাটে বটতলায় নামিল। ক্রমশ দেখা গেল, তিনখানাই পাশাপাশি খেয়ার উপর উঠিয়াছে। ভানুচাঁদেরা

ডিঙি লইয়া আর আগাইল না। এপারেই আসিতেছে, তখন মোলাকাৎ তো নিশ্চয় হইয়া যাইবে।

খেয়া আগাইয়া আসিলে তাড়াতাড়ি পাশে ডিঙি লাগাইয়া দেখে, আগের বড় পালকির মধ্যে চৌধুরি মহাশয় চুপচাপ বসিয়া। চৈত্র-সন্ধ্যায় মৃদু মধুর হাওয়া দিতেছে। জ্যোৎস্না-ধূসর নদীজল ছল-ছল করিয়া নৌকার নিচে আহত হইতেছে, নৌকা নাগরদোলার মতো দুলিতেছে। ঢালিপাড়ার ঘাটে অনেক লোকের জটলা, তাদের প্রত্যেকটি কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু নরহরির লক্ষ্য কোনদিকে নাই, পালকির মধ্যে স্থাণুর মতো বসিয়া। ডিঙিটা আসিয়া খস করিয়া খেয়ানৌকার গায়ে তাঁহার ঠিক পাশে লাগিল, তাহাও বোধকরি টের পাইলেন না। পিছনে শ্যামকান্ত ও মালাধর বাহিরে নৌকার গলুয়ের দিকে কাছাকাছি বসিয়াছিল। তাহারা ডিঙির দিকে তাকাইয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

খেয়া ঢালিপাড়ার ঘাটে গিয়া লাগিতেই কয়েক জনে কলরব করিয়া উঠিল।

কে? কে?

ভানুচাঁদ লাফাইয়া কূলে গিয়া নামিল। ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া সকলকে থামাইয়া দিল। ফিস-ফিস করিয়া বলিল, চুপ! চৌধুরি মশায়। অসুখ করেছে ওঁর।

সকলকে সরাইয়া রঘুনাথ আগে আসিয়া দাঁড়াইল। পালকি ঘাটের উপর নামাতেই তাহাতে মুখ ঢুকাইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, খবর কি?

আর খবর! নরহরি খানিক ঠায় বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া পালকি ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কি যে বলিবেন, কি করিতে হইবে, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

চাঁদ অস্ত গিয়া ইতিমধ্যে চারিদিকে ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে নরহরির মুখের ভাবটা ঠিক ঠাহর পাইল না, কিন্তু দাঁড়াইবার সেই নির্বাক ভঙ্গিতে রঘুনাথের বুকের মাঝখান অবধি মোচড় দিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, চৌধুরি মশায়, আমরা আছি কি করতে? বলুন কি করতে হবে?

কিছু না। বলিয়া নরহরি নিশ্বাস ফেলিলেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণের বউ মেয়েমানুষ হয়েও এমন তদ্বির করে রেখেছে—কিছু আর করবার নেই সর্দার। পরের ভরসায় লড়তে গিয়ে আমার এই দশা।

সামনে অন্তত পঞ্চাশ জোড়া চোখ নিঃশব্দে জ্বলিতেছে। মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া নরহরি বলিলেন, হাঁ—পরের ভরসা বই কি! লাঠি ছাড়া আর সব-কিছু আমার কাছে পর। আমায় ধরে নিয়ে গেল মামলা করতে। ওরা শিখিয়ে দিল, হলপ করে আদালতে বলে এলাম, আমরা চকের জমি বরাবর দখল করে আসছি—আমরাই আদায়-পত্তোর করছি—

ঢালির দল একসঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল, করছিই তো!

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন, তা করছি। কিন্তু কাছারি অবধি নেই। অথচ বলে আসা হল, চরের উপর মস্ত কাছারি-বাড়ি—

নেই, তা হতে কতক্ষণ?

নরহরি কহিলেন, কাল সকালে তদন্তে আসবে—এই রাতটুকু পোহালেই।

শ্যামকান্ত ম্লানভাবে কহিল, তদন্ত অন্তত একটা হপ্তা সবুর করাবার চেষ্টা করলাম—তা কিছুতে শুনল না।

রঘুনাথ পিছনে দলের দিকে একনজর তাকাইয়া বলিল, পুরো একটা রাত তো রয়েছে—কি বলিস তোরা? আচ্ছা চৌধুরি মশায়, আমরা চললাম।

তারা চলিল। পিছন হইতে নরহরি বলিতে লাগিলেন, অনেকদিনের কাছারি যে বাপু, রীতিমতো পুরাণো। ঝাড়ের টাটকা বাঁশের চাল, আর নতুন খড়ের ছাউনি হলে হবে না। অনর্থক খাটনি—ওসব করতে যাস নে তোরা। বলিতে বলিতে হঠাৎ কিন্তু এত উদ্বেগের মধ্যেও নরহরি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, মালাধর কাছারি পুরাণো করা যায় কেমন করে বলতে পার? দলিল-পত্তোর চালের কলসিতে রাখ, কাছারি-বাড়ি তো ঢুকবে না তোমার কলসির মধ্যে।

চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঢালিরা নরহরির কথা শুনিল। মুখ

ফিরাইয়া রঘুনাথ কহিল, চৌধুরি মশায়, মালাধর বলতে পারবে না, আমরা পারি—

নরহরি মুখ চাহিতে তার তীব্র চোখ দু'টার দিকে নজর পড়িল।

রঘুনাথ বলিতে লাগিল, ঐ যে গাবগাছের ধারে আটচালা ঘর দেখা যাচ্ছে—আমার ঠাকুরদাদা দক্ষিণের কারিগর এনে বড় শখ করে ও-ঘর তৈরি করেছিলেন। পল-তোলা সুন্দরির খুঁটি, রঙ-করা সাজ-পাত্তোর, সেকেলে কাজকর্ম—অমন আর হয় না আজকাল—

শ্যামকান্ত বলিল, সে সব শুনে আর লাভ কি হবে?

রঘুনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, পাঁচ-শ' ভূতে ঐ ঘর কাঁধে নিয়ে রাত্রের মধ্যে চরের উপর বসিয়ে দিয়ে আসবে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে নরহরি কহিলেন, তারপর?

ঘরের পুরাণো ছাউনি, চাই কি মেঝের উপর পুরাণো ভিটের মাটি আলগোছে বসিয়ে রেখে আসবে। হবে না তা হলে?

এতক্ষণে মালাধরের কথা ফুটিল। বলিল, হবে না কেন—খুব হবে। ধড়-ফড় করে তো বলে গেলে—সত্যি সত্যি পেরে উঠলে, নিশ্চয় হবে।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তোমার কি হবে?

ভালই হবে। সহজ প্রশান্ত হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, লাভ হবে আমার, পুরাণো দিয়ে নতুন পেয়ে যাব। আমার নতুন ঘর বানিয়ে দেবেন আপনারা।

শ্যামকান্ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে তো দেবই, নিশ্চয় দেব। তা ছাড়া বকশিশ দেব খুব ভালো রকম—

দেও দেও, না দেও না-ই দেও। ক্ষতি নেই বড়। হঠাৎ কেমন এক ধরনের অর্থহীন হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, কোন অসুবিধে নেই কর্তা। পরিবার মরেছে ও-বছর, একটা মেয়ে যমুনা—তা তোমাদের ওখানেই নিয়ে তুলব না হয়—

তাজ্জব কাণ্ড! সকালে পথ-চলতি লোকেরা দেখিয়া অবাক হয়, কবে কখন এত সব ব্যাপার হইল? হঠাৎ বিশ্বাস হইতে চায় না—চক্ষু কচলাইয়া দেখিতে

হয়, ব্যাপারটা স্বপ্ন কিনা। কাল দেখা গিয়াছে, দিগন্তবিসারী বালুক্ষেত্র—আজ সেখানে প্রকাণ্ড কাছারি-ঘর। চারিদিক ফিটফাট, মেজের আগাগোড়া সতরঞ্চি বিছানো, তার এক পাশে নিচু তক্তাপোষ, জাজিম পাতা—হাতবাক্স সেহা রোকড় খতিয়ান দাখিলার বহি···মালাধর এসব লইয়া মহাব্যস্ত। হুঁকাদানে সাজা-তামাক পুড়িয়া যাইতেছে, একটা টান দেওয়ার ফুরসৎ হইতেছে না। পৈঠার দক্ষিণে ডালপালা-মেলানো কামিনীফুলের গাছ। দু-এক করিয়া ক্রমে কৌতূহলী গ্রামের লোক চারিপাশে ভাঙিয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মাঠের মধ্যে পালকি।

কে আসে? হাকিম?

না না। হাঙরমুখো ডাণ্ডা ঐ যে। ও ঠিক চৌধুরি মশায়।

পালকি হইতে নামিয়া ধীর মন্থর পদে কামিনীতলা দিয়া নরহরি চৌধুরি ফরাসে আসিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন। নূতন করিয়া তাওয়া চড়িল। খানিকক্ষণ নিবিষ্ট মনে ধূমপান করিয়া গড়গড়ার নলটা নামাইয়া রাখিয়া চারিপাশের লোকজনের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া আবার তিনি পালকিতে চড়িলেন। পালকি এবার গ্রামের দিকে চলিল। তারপর আর এক কাণ্ড—বেলা প্রহরখানেক হইতে আর এক ধরনের মানুষ গ্রাম হইতে ঢালিপাড়ার দিক হইতে আসিতে লাগিল। ইহারা সব কাজের মানুষ। কেহ আসিয়াছে খাজনার টাকা লইয়া, কেহ জমির সীমানার গণ্ডগোল মিটাইতে। মুহুরি দাখিলা লেখে, মালাধর টাকা বাজাইয়া হাতবাক্সে ফেলিয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকা নামাইয়া তাদের হাতে দিয়া বলে, তারপর? মোড়লগাতির বকনাজোড়া নিয়ে এসেছ নাকি কৈলেস? বেয়াই আজকাল বলছে কি? মেয়ে পাঠাবে না পুজোর সময়?

নানা কথাবার্তা ও কাজকর্মে ঘর গমগম করিতে থাকে।

বা-রে কাছারি জমিয়েছে! পাতাল ফুঁড়ে ঘর উঠল নাকি?

যারা কাজকর্মে আসা-যাওয়া করিতেছে, পথের লোকের মন্তব্য শুনিয়া রাগিয়া ওঠে।

কোথাকার লোক হে তোমরা? তিনপুরুষ ধরে এখানে খাজনার লেনদেন হচ্ছে, আর বলে কি না—

বড় জোর দুপুর নাগাদ হাকিম মহাশয় পৌঁছিয়া যাইবেন, এই প্রকার আন্দাজ ছিল। শ্যামকান্ত সেই দুপুর হইতে বসিয়া আছে। হাকিমের পৌঁছিতে কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল। এবং সম্বর্ধনার প্রথম প্রস্থ শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর।

খুশীমুখে ডেপুটি বলিলেন, এ কি করেছেন শ্যামকান্ত বাবু? না না, এ ভারি অন্যায়। এত সবের কি দরকার ছিল বলুন তো!

কিছু না—কিছু না। শ্যামকান্ত বিনয়ে ঘাড় নাড়িল। বলিল, নানান অসুবিধে এ জায়গায়। মনে তো কত ইচ্ছে হয়, কিন্তু সে কি হবার জো আছে? মালাধর, আর দেরি কোরো না, কাগজপত্তোর বের করে ফেল—একটা একটা করে সমস্ত দেখিয়ে বুঝিয়ে দাও। আমি এখানে কিন্তু বেশি রাত করতে দেব না হুজুর, তা আগে থাকতে বলে রাখছি। পালকি-বেহারা ঠিক রয়েছে, হুকুম হলেই নীলগঞ্জের ডাকবাংলায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ডেপুটির মুখে হাসি ধরে না। বলিলেন, পালকিও রেখে দিয়েছেন নাকি? আপনার সকল দিকে লক্ষ্য শ্যামকান্ত বাবু। সত্যি বড় ভাবনা হয়েছিল, এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—ঘোড়ার পিঠে এই সময় অদ্দূর যাওয়া……আর রাস্তাঘাটের যা দশা দেখে এলাম—বড় মুশকিল হত তা হলে। ডাকবাংলায় গিয়ে একবার পৌঁছুতে পারলে আর কোন অসুবিধে নেই। লোকজন নিয়ে এসেছি।

শ্যামকান্ত বলিল, সে জানি। সমস্ত খবর এসেছে আমার কাছে। আপনার খানসামা-বেয়ারারা নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণ।

ঘুমুচ্ছে? তার মানে?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্যামকান্ত বলিল, বসে বসে কি আর করবে বলুন। ডাকবাংলাটা সরকারের—কিন্তু আশপাশের এলাকা যে আমার! আমার লোকজন গিয়ে শাসাতে লাগল—'পড়েছ যমনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' রান্নাঘর থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে, আমরাই সব দখল করে ফেলেছি। খানিকক্ষণ

বসে বসে অবাক হয়ে তারা কাণ্ড-কারখানা দেখল, শেষে হাই তুলতে লাগল। আমার লোক তাড়াতাড়ি বিছানা করে দিল। ওরা ক্ষিধে বাড়াবার জন্য একটু একটু আদা-জল খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

বলিয়া সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু মালাধর কাগজপত্রে হাত না দিয়া অকস্মাৎ ত্রস্তভাবে উঠিয়া বরকন্দাজদের হাঁকাহাঁকি লাগাইল।

হল কি ?

হুজুর এইবার কাজে বসবেন—এখনো মশালগুলো জ্বালাচ্ছে না। দেখুন দিকি বেটাদের কাজ।

কিন্তু কাজে বসিবে কি, হুজুর অবাক হইয়া দেখিতেছেন সমস্ত মাঠ আলো করিয়া একের পর এক বিশ-পঁচিশটা মশাল জ্বলিয়া উঠিল। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি শ্যামকান্ত বাবু ?

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া শ্যামকান্ত বলিতে লাগিল, ঐ যে বললাম একটু আগে, কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। জায়গাটা বড্ড খারাপ। রাত্তিরে বাদার যত কেউটে সাপ উঠে এসে ঐ মেজের উপর, খাটের পায়ার কাছে, দেয়ালের উপর—সব জায়গায় কিলবিল করে বেড়ায়। সেবার হল কি—নিবারণ মুহুরি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ঢ্যারস কুটছে—ঝুড়ির মধ্যে মা-মনসা। তরকারি বের করতে গেছে, অমনি দিয়েছে ঠুকে। সে বিষ মোটে সাহায্য হল না। সাবধানের মার নেই—তাই ঐসব আলোর ব্যবস্থা করেছি। না না হুজুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না—আলো দেখে ভয় পেয়ে সাপ বাদা থেকে না-ও উঠতে পারে।

হাকিম ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতে লাগিলেন। বলিলেন, পালকি ডাকুন। আজকে এসব থাক। কাল দিনমানে এসে তদারক করা যাবে।

মালাধর অতি সাবধানে আগে আগে আলো লইয়া চলিল। শ্যামকান্ত হাকিমকে বড় পালকিতে তুলিয়া নিজে ছোটটায় উঠিয়া বসিল। সে রাত্রি শ্যামকান্তও ডাকবাংলায় কাটাইল।

সকালবেলা মিনিট দশেকের মধ্যে তদন্ত হইয়া গেল। উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সাক্ষ্য লইয়া ডেপুটি ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছেন, শ্যামকান্ত আসিয়া নিবেদন করিল, পালকি রয়েছে—আর একবার সরেজমিনে কাছারি-বাড়ির দিকে গেলে হত না?

হাকিম বলিলেন, কেন, তদন্ত কাল তো সেরে এসেছি।

নমস্কার করিয়া তিনি ঘোড়া ছুটাইলেন। হাকিমের সাঙ্গোপাঙ্গরাও বিদায় হইল। শ্যামকান্ত ও মালাধরের মধ্যে চোখাচোখি হইল একবার। মালাধর বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে বড়বাবু, ষোল আনা তদ্বির হয়েছে। সৌদামিনী ঠাকরুন পেরে উঠবেন না এবার—

(১৩)

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কীর্তিনারায়ণের কানে অনেকগুলা ঢাকের আওয়াজ আসিতেছে। আওয়াজ স্পষ্ট নয়, ওপারে অনেক দূর হইতে আসিতেছে। খুশীতে মন ভরিয়া গেল, চড়ক আসিয়া গেল নাকি? সৌদামিনী একবার কি কাজে ঘরের ভিতর আসিলেন; তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, গাজনের বাজনার মতো লাগছে, হাজরাতলায় বাজাচ্ছে যেন—না?

ইহার জবাব না দিয়া সৌদামিনী ধমক দিলেন, রোদ চড়চড় করছে—এখনো শুয়ে পড়ে রয়েছ, ছিঃ!

কীর্তিনারায়ণ উঠিল কিনা, দেখিবার জন্য তা বলিয়া তিনি দাঁড়াইলেন না। যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি বাহির হইয়া গেলেন। গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ।

জানালার কাছে একটা নিমগাছের শাখাপ্রশাখা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। একটুকরা ডাল ভাঙিয়া দাঁতন করিবে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কীর্তিনারায়ণ নাগাল পাইল না। উঠানে নামিয়া গিয়া গাছে চড়িল। একেবারে মগডালে উঠিয়া বসিয়া বসিয়া সে দাঁতন করিতে লাগিল। দূরে—যেদিক দিয়া বাজনার শব্দ আসিতেছে সেই দিকে, নজর করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে। হাজরাতলায় সত্যই কি যেন একটা ব্যাপার হইতেছে, বোঝা গেল।

ঢালিপাড়ার মেয়ে-পুরুষ বহু লোক বাঁধের উপর দিয়া ঐদিকে যাইতেছে। মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, চৈত্র-সংক্রান্তির অনেক দেরি, গাজনের বাজনা ইহা নয়।

নামিয়া সে চিন্তামণির খোঁজে গেল। খুঁজিতে খুঁজিতে দেউড়ি পার হইয়া নাটমণ্ডপের মধ্যে তাদের জন তিনেককে এক জায়গায় পাইল। কাঁধে লাঠি চুপি-চুপি কি বলাবলি করিতেছিল, কীর্তিনারায়ণকে দেখিয়া তারা চুপ করিল।

মুহূর্তকাল কীর্তিনারায়ণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। বসিবার জন্য কেহ না দিল একটা-কিছু আগাইয়া, না বলিল তাহার সঙ্গে কোন একটি কথা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কীর্তিনারায়ণ বলিয়া উঠিল, কি হয়েছে বল তো ওস্তাদ-দাদা? মা কিছু বলে না, তোমরাও না—

চিন্তামণি ভারি গলায় বলিল, মামলা ডিসমিস হয়ে গেছে কর্তাভাই।

গতরাত্রে খবরটা আসিয়াছে। এতক্ষণে উভয় তরফের সকলেই জানিতে পারিয়াছে। রায়ের মর্ম হইল, বরণডাঙার সৌদামিনী দেব্যা বউভাসি নামক একটা চক কিনিয়াছেন তাহা ঠিক, কিন্তু বিরোধীয় জমি ঐ চকের এলাকাভুক্ত নয়। নরহরি চৌধুরির দখলি সম্পত্তি মিথ্যা করিয়া ঐ চকের মধ্যে পুরিয়া যোগসাজসে তাঁরা নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকে হয়রানি করিতেছেন।

মামলায় হারিবার দুঃখ কীর্তিনারায়ণের বিশেষ উপলব্ধি হইল না, কিন্তু ওস্তাদের কণ্ঠে কান্নার আভাস তাহাকে আশ্চর্য করিয়া দিল। ব্যাপারটা ভালমতো না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, ডিসমিস হল কেন?

চৌধুরি আদালতে দাঁড়িয়ে ভাহা মিথ্যেকথা বলে এলেন বলে। ডাকাতি দাঙ্গাবাজি সে-ও যা হয় একরকম ছিল—বাঘা চৌধুরি বুড়ো বয়সে লাঠি-সড়কি ছেড়ে পুরোপুরি পাটোয়ারি হয়ে বসলেন এবার।

ঘৃণায় চিন্তামণির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। বলিতে লাগিল, দেখ কি কর্তা-ভাই, মালাধর সেন আর নরহরি চৌধুরিতে কিছু তফাৎ নেই। গিন্নি-ঠাকরুন অত টাকা দিয়ে চক খরিদ করলেন, সব ভুয়ো হয়ে গেল। আগে ছিল, জোর

যার মুল্লুক তার—এখন লোকে জুয়াচুরি করে জমি চুরি করে, মিথ্যে দলিল বানিয়ে ধাপ্পা দেয়। ঝাহু মানুষগুলোকে সনদ দিয়ে উকিল-মোক্তার বানিয়ে কোম্পানি বাহাদুর কসবায় বসিয়ে দিয়েছে। মিথ্যে বলবার জন্য তাদের ভাড়া করে লোকে মামলা চালায়।

ঢাক আবার জোরে বাজিয়া উঠিল। চিন্তামণি আর স্থির থাকিতে পারে না। মণ্ডপ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল।

বাজনা কিসের ওস্তাদ-দাদা?

মামলায় জিতেছে, জাঁক করে তাই হাজরাতলায় পূজো দিচ্ছে। খুব ধুম-ধাড়াক্কা—তিন দিন ধরে খাওয়া দাওয়া চলবে, শুনতে পেলাম।

কীর্তিনারায়ণের মুখে ভাব-বিকৃতি ঘটিল না, সহজ ভাবে সে হাসিতে লাগিল। বলিল, খাওয়া-দাওয়ায় আমাদের তো কই নেমন্তন্ন করল না। করবে কেন—দিদির বিয়েয় মা ওঁদের করেন নি, সে কি ভুলে গেছেন চৌধুরি মশায়?

অতিথিশালার সামনে অশ্বত্থতলায় চিন্তামণি আসিয়া দাঁড়াইল। ভক্ত বৈষ্ণব-সজ্জনেরা নয়—অনুগত লাঠিয়ালের দল এখন সেখানে থাকে। সকলে বাহির হইয়া আসিল।

খবর কি ওস্তাদ?

খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, তোয়াজে রয়েছিস—খাজনা দিয়েছিস কখনো? মালেকের মাল-খাজনা আদায় করতে এসেছি আজ।

এই খাজনা-আদায়ের অর্থ সবাই জানে। তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একজনে বলিল, এদ্দিনে এই তো প্রথম ডাকলে ওস্তাদ। আর কখনো কেউ আসে নি। ভুলে বসে আছি যে নিষ্কর-লাখেরাজ খাচ্ছি নে—খাজনা দিতে হয়।

মালকোঁচা আঁটিয়া লাঠিহাতে মরদেরা একের পর এক বাহির হইয়া আসিল। কাঁচাসোনার মতো সকালবেলার রোদ মন্দিরের চবুতরায় আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী চন্দন ঘসিতেছিল। বিয়ের পর বছর তিনেক স্বামীর ঘর

করিয়া এখন সে বরণডাঙায় আসিয়া আছে। স্বামীর ঘরে সুখী হইতে পারে নাই ; বাপের বাড়ি আসিয়া পূজা-অর্চনায় মাতিয়া আছে।

চমকিয়া উঠিল মালতী। এত লাঠি? বিগ্রহের দিকে চাহিল। শ্যামঠাকুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। বরণডাঙা লাঠি তুলিয়া এতকাল পরে আত-তায়ীর উপর শোধ লইতে চলিয়াছে—কষ্টিপাথরে খোদাই-করা ঠাকুরের অগ্নিদগ্ধ কালো মুখে বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে যেন। অথবা তার নিজেরই হয়তো পরিবর্তন আসিয়াছে, চোখের দৃষ্টি বদলাইয়া গিয়াছে। নিজের দুঃখ ও অপমান এই বয়সে তার চিত্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। বেদীর উপর শ্যামসুন্দরের হাতে মোহন মুরলী ঠিকই রহিয়াছে—কিন্তু ঠাকুরের সামনে চোখ বুজিয়া মালতী ইদানীং যখন ধ্যানে বসে, তার মনের পটে চক্রধারী চতুর্ভুজের চিত্রটাই প্রখর হইয়া উঠে।

ঠাকুর-প্রণাম করিয়া চিন্তামণির দল ভিতর-উঠানে গেল। কোথায় ছিল কীর্তিনারায়ণ—ছুটিয়া ইহাদের মধ্যে আসিল। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিতে দিল না চিন্তামণি—আড়কোলা করিয়া রোয়াকে যে একখানা জলচৌকি ছিল, তার উপর বসাইয়া দিল। হাঁক দিয়া উঠিল, মা-জননী কই গো?

সৌদামিনী আসিলে বলিল, আশীর্বাদ নিতে এসেছি মা। এবার রওনা হব।

লাঠি উঁচাইয়া সকলে মাথা নোয়াইল। তারপর কীর্তিনারায়ণকে দেখাইয়া চিন্তামণি হাসিমুখে বলিল, কর্তাভাইকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি কাঁধের উপর তুলে নিয়ে।

মালতী বলিল, হাঙ্গামার মধ্যে ওকে আবার কেন ওস্তাদ-দাদা?

নইলে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুমটা কে দেবে শুনি? হুকুম পেলে তখন দেখো এই বুড়ো হাড়ে ভেলকি খেলিয়ে দেব।

মালতী বলে, ঐ একফোঁটা মানুষ—ও যাবে তোমাদের হুকুম দিতে! কি যে বল!

চিন্তামণি বলে, জাত-গোখরোর বাচ্চা দেখতে ছোট হলে কি হয়, বিষ তার কম থাকে না। তুলতুলে গা-হাত-পা—তা বলে ভেব না, কর্তাভাই

আমাদের তুল্যের মানুষ। লাঠি নিয়ে দু-ভায়ে সেদিন একটুখানি পাল্লাপাল্লি হচ্ছিল, পালটা মেরে ভাই আমার কাঁধের উপর এমন বাড়ি কষলেন যে চোখে তারা কাটল, মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, বসে পড়তে হল আমায়।

এই প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় কীর্তিনারায়ণ লজ্জায় মুখ নিচু করিল। এক নজরে সেদিকে চাহিয়া চিন্তামণি স্নেহকণ্ঠে মালতীকে প্রবোধ দিতে লাগিল, কোন ভয় নেই। কর্তাভাই খালের এপারে থাকবেন, এপার থেকে ছুটো-একটা হাঁক ছাড়বেন, এইমাত্তোর। চেহারা দেখি না দেখি, গলার একটু আমেজ পেলেই হল। ঘোষকর্তা মশায়ের ছেলে, আমাদের অন্নদাতা দাঁড়িয়ে আদেশ করছেন— এতে বুকে কত জোর আসে, ভাবতে পারছ না দিদি। শুধু এতেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিয়া চিন্তামণি বলিল, মন খুঁত-খুঁত করে তো স্পষ্ট করে বল মা জননী। কাজ নেই—মনে মনেই আমরা কর্তা-ভাইয়ের মুখখানা ভেবে নেব।

চিঁড়া নারিকেল-সন্দেশ আর বাতাসা সৌদামিনী সকলের কোঁচড় ভরিয়া দিলেন। বসিয়া বসিয়া তারা খাইল। চিঁড়া খাইয়া ডাব খাইয়া পান-তামাক খাইয়া প্রহরখানেক বেলায় সকলে রওনা হইল। কিন্তু কীর্তিনারায়ণ তো সে অঞ্চলেই নাই, কখন সরিয়া পড়িয়াছে। চিৎকার করিয়া ডাকিয়া সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া তাকে পাওয়া গেল না।

লাঠিয়ালদের কয়েক জন হাসিয়া কি বলাবলি করিতেছে। সৌদামিনীর মুখ রাঙা হইয়া গেল। চিন্তামণি ঘাড় নাড়িয়া বলে, না মা, যা ভাবছ কক্ষণো তা নয়। হতেই পারে না। কর্তামশাই যে বিদ্যেটুকু গচ্ছিত রেখে গেছেন, তার একটু-আধটু দেবার চেষ্টা করছি তো কর্তাভাইকে—ওঁর বুকের ভিতরটা অবধি আমি দেখতে পাই। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি মা, ভয়ে পালাবার ছেলে উনি নন। কি মতলব মাথায় এসেছে—কোথায় চলে গেলেন, এই যা একটু ভাবনা। কিন্তু কর্তামশায়ের নাম কোন দিন মা খাটো হবে না কর্তাভায়ের হাতে—এ তোমরা নিশ্চিত জেনে রেখ।

এমন একটা রোমাঞ্চক ব্যাপার এতকাল পরে ঘটিতে যাইতেছে, আর কীর্তিনারায়ণ কি না খালের এপারে দর্শক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে! এ প্রস্তাব মোটেই তার ভাল লাগে নাই। ঘাটে এক জেলে-ডিঙি ছিল, কারো অপেক্ষা না রাখিয়া আগে ভাগে সে পারে চলিয়া গেল। পারে গিয়া ভাবিতেছে, চিন্তা-মণির দলবল লইয়া পৌছিতে অনেক এখনো দেরি আছে, খাল বাহিয়া ডাকাতের বিলের দিকেই আগাইয়া যাওয়া যাক না! বিলে নৌকা-ডোঙা চালাইবার যে দাড়া পড়িয়াছে তার দু-ধারে পদ্মফুল আর পদ্মের চাক তুলিবার নেশায় তাকে পাইয়া বসিল।

আর একবার—তখন সে অনেক ছোট—এই বিলের মধ্যে এমনি পদ্ম তুলিতে গিয়া মারা পড়িবার দাখিল হইয়াছিল। ভানুচাঁদ আর সে সকলের অজ্ঞাতে চুরি করিয়া তালের ডোঙায় করিয়া আসিয়াছিল। এক জায়গায় অনেক পদ্ম দেখিয়া উৎসাহের বসে দু-জনেই একদিকে আসিয়া হাত বাড়ায়। জল উঠিয়া চক্ষের পলকে ডোঙা ডুবিল। ভানুচাঁদ কোন গতিকে টাল সামলাইয়া ডুবন্ত ডোঙায় রহিয়া গেল, কীর্তিনারায়ণ ছিটকাইয়া জলে পড়িল। জল নয়—জল ছিল বিঘৎখানেক মাত্র—জল থাকিলে তো ভাবনার কিছু ছিল না, সাঁতার দিয়া ভাসিয়া থাকা যাইত। বিপদ হইল জল না থাকার জন্য। পচা-পাঁকের মধ্যে কীর্তিনারায়ণ আটকাইয়া গেল। যত ভাসিবার চেষ্টা করে, ততই আরও বেশি তলাইয়া যায় হাঁটু হইতে ক্রমে কোমর অবধি ডুবিয়া গেল। রক্ষা, ভানুচাঁদ ইতিমধ্যে ডোঙার জল প্রাণপণে সেঁচিয়া ফেলিয়াছিল—অনেক টানাটানি করিয়া সে কীর্তিনারায়ণকে উদ্ধার করে।

এবারে ভানুচাঁদ নাই, সে একা। আপন মনে ফুল তুলিতেছে, আর সামনে যেখানটায় অনেক ফুটিয়া আছে লগি ঠেলিয়া সেদিকে আগাইতেছে। ডিঙির খোলে স্তূপীকৃত পদ্ম জমিয়া উঠিল। এক সময় খেয়াল হইল, একেবারে নাক-কাটির খালের মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে, অনতিদূরে চৌধুরিদের রান্নাবাড়ি। ভিতর-বাড়িতেই বা বিজয়োৎসবের বহরটা কি—একটু জানিয়া লইবার ইচ্ছা হইল। সুবিধা আছে—কসাড় হোগলা-বন, বাদামের ডাল জলের উপর

ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ইহার ভিতরে ছোট্ট এই জেলে-ডিঙি কারও নজরে পড়িবার কথা নয়। এমন কি কূলে নামিয়া বাদানতলায় রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া যদি এক নজর উঁকিঝুঁকিও দিয়া আসে, তাহা কেহ টের পাইবে না।

কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, টের পাইয়া গেল স্বর্ণলতা। সকাল হইতে স্বর্ণর মন ভাল নাই, মামলায় জয়লাভের খবর শুনিয়া অবধি জেঠাই-মার কথা মনে পড়িয়া বড় কষ্ট হইতেছে। আজিকার এই অপমানের পর তাঁর মুখভাব আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কি করিতেছেন এখন তিনি? কীর্তিনারায়ণই বা কি করিতেছে? এখানকার এই পরিপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া সেই যে চলিয়া গেলেন—তারপর তাঁরা কি রকম আছেন, ইহাদের কথা বলাবলি করেন কি না, এই সব জানিতে বড় ইচ্ছা করে। স্বর্ণ এখন বাহিরের ব্যাপারও বুঝিতে শিখিয়াছে। বড় রাগ হয় শ্যামকান্ত ও মালাধরের উপর। লাঠি শেখানোর উপলক্ষে নরহরিকে কাছাকাছি পাইয়াছিল, বড় ভাল লাগিত ঐ সময়টা। নরহরি একেবারে শিশু হইয়া তার কাছে আসিতেন লাঠি-খেলার ব্যাপারে। কিন্তু মালাধর সেন আর তার দাদা চক্রান্ত করিয়া বাপকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ধকার কুটিল পথে লইয়া চলিয়াছে। মামলা-মোকদমার তুমুল আয়োজনের মধ্যে লাঠি অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে, নরহরিকে তাগাদা দিয়া দিয়া স্বর্ণ হয়রান হইয়া পড়িয়াছে। অভিমান করিয়া এখন আর কিছু বলে না।

হোগলাবন বিষম জোরে নড়িতেছে। হঠাৎ নজর পড়িয়া স্বর্ণলতা চমকিয়া উঠিল। এত অগভীর জলে কুমীর আসিবার কথা নয়। বাদামবনের ঘন পত্র-পুঞ্জের মধ্য দিয়া দৃষ্টি প্রাণপণে বিসারিত করিয়া রহিল। রোদ ঢুকিবার ফাঁক নাই, দিন দুপুরেই রহস্যাচ্ছন্ন দুপুর-রাত্রি বলিয়া মনে হয় নাককাটির খালের প্রান্তবর্তী এই বাদামবনে গিয়া দাঁড়াইলে। সত্য-মিথ্যা যে সব কাহিনী ডাকাতের বিল ও এই খালের সম্পর্কে প্রচলিত, সমস্ত চকিতে স্বর্ণলতার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। কে আসে—কবন্ধ ঘোড়-সওয়ার, শ্যামশরণ একদা যে অনুচরটির মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন অবাধ্যপনা করিয়াছিল বলিয়া? মুচে ভূত—খালের ধারে ধারে যারা নিচু হইয়া ভাগাড় হাতড়াইয়া বেড়ায়,

মরা গরু-ছাগল কোথাও পড়িয়া আছে কিনা? কিম্বা সে আমলের ডাকাতের বিলের কোন ডাকাত-দল—যারা এখানে-ওখানে ঘাপটি মারিয়া থাকিত, সুযোগ বুঝিলে তে-রে-রে-রে করিয়া আসিত?

ভাল করিয়া দেখিবার জন্য স্বর্ণলতা নিচে নামিয়া গেল।

বড় জেদের মোকর্দমা, বিজয়োৎসবের আয়োজনও তাই অতি বিপুল। শ্যামগঞ্জ ছাড়াও পাশাপাশি দু-তিনটা গ্রামের ইতর-ভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়াছে। কসবা হইতে শশিশেখরেরও আসিবার কথা। মালাধরের ফূর্তির অবধি নাই, চরকির মতো সে ঘর-বাহির করিতেছে, সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনের ভার নিজে সে যাচিয়া কাঁধে লইয়াছে। শ্যামকান্ত যে ঘরে ওঠা-বসা করে, তার দরজা-জানলায় পর্দা ঝোলানো হইয়াছে, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ বসিয়াছেন সেখানে। মাঝে মাঝে সেখান হইতে উচ্চ হাসির রোল উঠিতেছে।

এত বড় ব্যাপারের মধ্যে নরহরি চৌধুরি নাই। দোতলার অলিন্দে বসিয়া একাকী নিঃশব্দে গড়গড়া টানিতেছেন—এই উৎসবের নির্লিপ্ত নিরাসক্ত দর্শক-তিনি যেন।

শশিশেখর আসিয়া পৌঁছিতে নরহরির খোঁজ পড়িল; তাঁকে প্রণাম করিবে। নরহরি নিচে নামিয়া আসিলেন। নূতন করিয়া আবার মামলার আলোচনা উঠিল। তাঁর প্রশংসায় শশিশেখর পঞ্চমুখ—নরহরির ঐ রকম জোরালো সাক্ষ্যেই এমন আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হইয়াছে। মালাধরেরা পেশাদার সাক্ষি—হাকিম দু-এক কথায় তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু নরহরি সর্বপ্রথম এই আদালতের কাঠগড়ায় উঠিয়াছেন, প্রতিপক্ষের সামান্য মন্তব্যে চটিয়া আগুন হন—ইহাতে যে কেহ বুঝিতে পারে, তিনি নিতান্ত আনাড়ি এই ব্যাপারে। তাই সাক্ষ্যের প্রতিটি বর্ণ হাকিম বিশ্বাস করিয়াছেন। নহিলে বরগডাঙা দলিলপত্র যা দেখাইয়াছে—মামলা সঙ্গে সঙ্গে খতম হইয়া যাওয়ার কথা। নরহরির সাক্ষ্যের জোরেই সরেজমিন তদন্তের হুকুম হইল।

নরহরি বলিলেন, রঘুনাথ সর্দার আর ঐ ঢালিদের কথা কিন্তু ভুলে যেও না

বাপু। বসতবাড়ি তুলে এনে কাছারি গড়ে দিল। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, পাকাপাকি রকমের ভালো ব্যবস্থা করে দিতে হবে ওদের।

আর প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল শ্যামকান্তর সম্পর্কে। তরুণ বয়সে আশ্চর্য তার বিষয়-বুদ্ধি। কৌশলে যেন রাত্রিকে একেবারে দিন বানাইয়া দিল। কসবার পদস্থদের কেমন অবলীলাক্রমে সে বাগাইয়া ফেলিয়াছে। এ যুগে শ্যাম-কান্ত হেন মানুষই দেখিতে দেখিতে সকলের উপর মাথা ছাড়াইয়া উঠে। মনিবের সম্পর্কে মালাধরও পরমোৎসাহিত। অসুবিধা অবশ্য আছে—বরিশালের মনিব চোখ মেলিয়া কিছু দেখিতেন না, শেষাশেষি হরিচরণ চাটুজ্জে কিছু গণ্ড-গোল বাধাইয়াছিল এই মাত্র। সেই কণ্টকের উচ্ছেদ করিতে গিয়াই তো বউভাসির চক পুরাণো মনিবের হাত ফসকাইয়া নানা টানা-পোড়েনের ভিতর দিয়া চৌধুরি-বাড়ি আসিয়া স্থিত হইয়াছে। এ মনিবের কাছে এক তিল ফাঁকি চলিবার উপায় নাই—ক্ষুরধার বুদ্ধি, চোখে কিছু না দেখিয়াও সমস্ত ধরিয়া ফেলে। তবে সুখের বিষয়, নিতান্ত অসম্ভব রকমের না হইলে মালাধরের উপরি পাওনা-গণ্ডায় তার কোন আপত্তি নাই। সেরেস্তার উপর হাত না পড়িলেই হইল—প্রজাদের নিকট হইতে যতদূর পার আদায়-উশুল করিয়া খাও। সাহস আছে, চতুরতা আছে—কাজ হাসিল করিবার জন্য ন্যায়-অন্যায় কোন পন্থায় আপত্তি নাই। ফাঁকিবাজি না চলুক—এই মনিবের ফাই-ফরমায়েস খাটিয়া এবং ইহাকে পরামর্শ দিয়া সুখ পাওয়া যায়।

দুই-চারিটা কথা বলিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিয়া নরহরি আবার উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। ইহাদের চোখের আড়াল হইয়া যেন তিনি রক্ষা পাইলেন। যতক্ষণ ছিলেন, লজ্জায় ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন। সাক্ষ্য দিয়া আসিবার পর মনে কেমন আচ্ছন্ন ভাব আসিয়াছে। তিনি উঁহাদের কেহ নন, উঁহাদের সঙ্গে কোনদিন তিনি মিলিতে পারিবেন না, ঐ দলে মিশিতে গিয়া নিজের অবমাননা ঘটাইয়াছেন—এমনি এক অনুশোচনা অহরহ তাঁকে বিদ্ধ করিতেছে।

মেঘ করিয়াছে। মেঘের আবরণে রোদ স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই। অন্যমনস্ক ভাবে নরহরি মুক্ত অলিন্দে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দেখিতেছেন। মাঝে মাঝে মেঘমুক্ত

এক ঝলক রোদ পড়িয়া রূপার পাতের মতো মালঞ্চের সুবিস্তৃত জলধারা ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে। চিতলমারি খালের দিকে চাহিয়া নরহরি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। মোহনার প্রান্ত হইতে চর দীর্ঘতর হইয়া খালের ভিতর অনেক দূর অবধি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, চিতলমারি মজিয়া আসিতেছে। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের দিকে একবার চাহিলেন। কপালের দু-দিক দিয়া টাক মস্তিষ্ক অবধি অগ্রসর হইয়াছে, সমস্ত মুখে বলিরেখা অবোধ্য অক্ষরে জীবনের কত কি বিচিত্র কথা যেন লিখিয়া দিয়াছে। তাঁদের দিন বিগত হইয়া আসিল। একদা মালঞ্চের উপর কোলাকুলি করিয়া যাহাদের বন্ধুত্ব মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তারা আজ পরম শত্রু। কিন্তু মনিব সাজিয়া যে বাড়িতে তিনি বর্তমান আছেন, তাদের সঙ্গেই বা তাঁর সংযোগ ও হৃদ্যতা কতটুকু?

স্বর্ণলতা ছুটিয়া আসিল।

বাবা! বাবা!

হাঁপাইতেছে। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, কে এসেছে দেখে যাও বাবা—

কে?

তার আগেই কীর্তিনারায়ণ উঠিয়া আসিল। নরহরির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এস বাবা, এস—

কি অদ্ভুত কঠোরতা কিশোর কচি মুখখানার উপর। নরহরি বলিলেন, বোসো—

তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া কীর্তিনারায়ণ দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, নেমন্তন্ন খেতে আসি নি চৌধুরি মশায়। আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

নরহরি চমকিয়া চাহিলেন। বউভাসির চকের দিক দিয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে। কীর্তিনারায়ণ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আমাদের লোকজন পৌঁছে গেছে তা হলে। চুরি করে রাতারাতি যে কাছারিঘর বেঁধেছিলেন দিনের বেলা সকলের মুকাবেলা ঐ দেখুন তা পোড়ানো হচ্ছে।

নরহরি কীর্তিনারায়ণের দিকে ভ্রূকুটি করিলেন।

বিশ্বাস করি না। আবার একনজর অগ্নিকাণ্ডের অভিমুখে চাহিয়া ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলিলেন, বরণডাঙার দল খোলে হয়েকৃষ্ট আওয়াজ তুলতে পারে—এই তো জানি। সেই হাতে ঘরে আগুন দিচ্ছে, এ আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না বাবা। আগে টের পেলে জায়গায় গিয়ে দেখে আসতাম, সত্যি হলে ঘোষ-গিন্নির উদ্দেশে নমস্কার করে আসতাম খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে।

কীর্তিনারায়ণ বলে, দেখবার অনেক আছে এখনো। একলা নয়—ঢালিদের সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে দু-চোখ ভরে দেখুন গে। বউভাসির চকের বাঁধ কাটবে এইবার আমাদের লোকেরা। জোয়ারের জন্য দেরি করছে, কোদাল হাতে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

স্তম্ভিত নরহরি বলিলেন, বাঁধ কেটে চক ভাসিয়ে দেবে আর অত ক্ষতি-লোকসান চোখ মেলে শুধুই আমরা দেখে আসব, এই মনে করেছ নাকি?

কীর্তিনারায়ণ বলিল, ক্ষতি-লোকসান অনেক হবে, তা ঠিক। কিন্তু ধান রোওয়ার মুখেই এই ব্যাপার, কাটবার সময়ও না জানি আরও কত নতুন নতুন উৎপাত আমদানি করবেন! ভেবে চিন্তে এবারের মতো তাই চক ভাসিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করা গেল। আপনার ঢালিরা গিয়ে গায়ে দু-একটা আঁচড় দিয়ে আসতে পারে, কিন্তু কি করা যাবে—আমরাও তো চোখ বুঁজে ভূতের নৃত্য দেখতে পারি নে।

এমন ভঙ্গিতে কথা বলিতেছে যেন সে নরহরিরই প্রায় একবয়সি সমান প্রতিপক্ষ। রাগের চেয়ে কৌতুকই বেশি লাগিতেছে নরহরির। বলিলেন, চকটা কি তোমাদের?

আপনি কি জানেন না চৌধুরি মশায়?

আমি জানলে হবে কি? আদালত কি বলেছে?

আপনারা যেমন বলে এসেছেন, সেই সব শুনেই তো আদালতের বলা। আদালত যা খুশি বলুক গে, আমাদের যা বলবার বাঁধের উপর দশগ্রামের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাব। নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি, উৎসবের হৈ-চৈর মধ্যে ঠিক সময়ে পাছে খবরটা না পৌঁছয়।

বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই নরহরি বাহির হইয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিলেন।

কীর্তিনারায়ণ দরজায় লাথি দিয়া বলিল, কায়দায় পেয়ে আটকালেন ?

নরহরি বাহির হইতে বলিলেন, পুরানো অভ্যাস বাবা। তোমার বাপকে আটকে রেখেছিলাম, শোন নি ?

কেমন এক ধরনের হাসি হাসিয়া পুনশ্চ বলিলেন, দলিল-দস্তাবেজ জাল করে হলপ পড়ে মিথ্যে বলে এসে যারা ডঙ্কা মেরে বেড়াচ্ছে, তাদের গহ্বরে পা দিতে এলে তুমি কোন বিবেচনায় ?

মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল—বাঘের গহ্বরে। কথাটা ব্যঙ্গের মতো শোনাইবে বলিয়া নরহরি সামলাইয়া লইলেন।

সুবর্ণকে নরহরি চুপিচুপি বলিলেন, বাঁধে চললাম। দরজা খুলে দিস না কিন্তু, খবরদার ! লাঠির আগে মাথা বাড়িয়ে দেবে ও-ছেলে—মারা পড়বে।

সুবর্ণলতা কোন সময়ে নামিয়া গিয়া ডিঙ্গা হইতে একরাশ পদ্ম লইয়া আসিয়াছে, অলিন্দে বসিয়া তাহারই মালা গাঁথিতেছিল। সে ঘাড় নাড়িল।

কাছারিঘর জ্বালাইয়া দিয়া চিন্তামণির দল খাল-ধারে বাবলা-ছায়ায় বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। কোদালিরা বাঁধের উপর। সেখানে গাছপালা নাই—রোদ আজ প্রখর নয়, তাই রক্ষা। জোয়ার আসিয়া গেল, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে চিন্তামণিরা। ক্ষণে ক্ষণে তারা হুঙ্কার ছাড়িতেছে। ছোকরাদের মধ্যে বেশি উৎসাহী কয়েক জন বারম্বার উঠিয়া একরাশ দু-রশি আগাইয়া উঁকি-ঝুঁকি দিয়া দেখিতেছে। কিন্তু শ্যামগঞ্জের জনপ্রাণী কেহ এখনো নজরে পড়িল না।

পুরাণে সেকালের যুদ্ধ-কাহিনী পড়িয়া একটা ছবি চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। সামনাসামনি উভয় পক্ষের শিবির—অন্তঃপুরিকারাও সঙ্গে আসিয়াছেন,

পিছনের অন্দর-অংশে যথারীতি তাঁদের বাটনা-বাটা কুটনা-কোটা ইত্যাদি চলিতেছে। সকালবেলা যুদ্ধযাত্রার মুখে বীরবৃন্দের পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে আহার-বর্ণনা কোথাও অবশ্য পড়ি নাই; তাহা হইলেও অনুমান করা যায়, মেয়েরা কখনও স্বামীপুত্রকে বাসিমুখে মহাহবে ছাড়িয়া দিতেন না। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষান্তি ঘোষণা হইলে দেখা গেল, শত্রু-মিত্র পরস্পরের শিবিরে যাতায়াত করিতেছে। কতকটা পাশাখেলা অথবা আদালতে দু-পক্ষের উকিলদের মামলা লড়িবার মতো। অনুষ্ঠানটা যতক্ষণ চলিতেছে, আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ ততক্ষণই; তার পরেই মন থেকে ও-সমস্ত একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল। সম্মুখ-সমর—ছল-চাতুরীর ব্যাপার একেবারেই ইহাতে চলে না। এরকম যুদ্ধে মরিলে অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা পাকা হইয়া যায়।

সে যুগের সেই মনোভাব অতিক্রম করিয়া এই লাঠিয়ালেরাও বেশি দূর আগাইতে পারে নাই। দেখ না—বাঁধ কাটিবে বলিয়া দলবল সহ সেই কখন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। তিন-চার ছিলিম তামাক পুড়িল—বিনা কাজে কতক্ষণ এমনভাবে বসিয়া থাকা চলে। কিন্তু প্রতিপক্ষ না আসিয়া পৌছানো পর্যন্ত বাঁধের উপর কোদালের একটা কোপ দিবার উপায় নাই। নরহরি চৌধুরির লোক হইলে এতক্ষণ নিশ্চয় চুপ করিয়া থাকিত না। কিন্তু ডাকাত আর লাঠিয়ালে তফাত রহিয়াছে যে! শিবনারায়ণের শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্যে কেউ গোপনে কিছু করিলে গুরু-দত্ত বিদ্যার অপমান হইবে। কাছারি জ্বালাইয়া এবং ঘন ঘন হুঙ্কার দিয়া প্রতিপক্ষকে তারা তাই এমন করিয়া বারম্বার আহ্বান জানাইতেছে।

আসিতেছে এতক্ষণে, অবশেষে আসিয়া পৌছিল। বাঁধের পথে নয়—জলপথে, খালের উপর দিয়া। প্রবল জোয়ারের বেগে পাঁচখানা বড় ডিঙি চকের বাঁধের গায়ে লাগিতে না লাগিতে ঢালিরা হৈ-হৈ করিয়া নরম কাদায় লাফাইয়া পড়িল। চিন্তামণির দলও লাঠি উঁচাইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝপ্‌ঝাপ করিয়া বাঁধে একসঙ্গে দশখানা কোদাল পড়িল। এই সময় রোদ ফুটিল, উদ্যত বল্লমের ফলায় রোদ পড়িয়া ঝকমক করিয়া উঠিল। তীরের মতো ঘোড়া ছুটাইয়া

নরহরি চৌধুরি ওদিক দিয়া আসিয়া পড়িলেন। অনেকদিন পরে আজ আবার রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। বুড়া হইয়াছেন, এবং এক চিন্তামণি ছাড়া লাঠি-সড়কিতে জেলার মধ্যে তাঁর জুড়ি নাই। কিন্তু যৌবনের গতিবিধি নিগূঢ় অন্ধকার পথে চলিয়াছিল, উন্মুক্ত আলোয় প্রকাশ্য সংগ্রামের এই অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে নূতন বলিলেই হয়। শিবনারায়ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইলে বড় আশা হইয়াছিল, এই বিষয়ে নব দীক্ষা লইবেন—দুই বন্ধু কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সারা অঞ্চল তোলপাড় করিয়া তুলিবেন। কিন্তু শিবনারায়ণের তখন মত ঘুরিয়া গেছে। এতকাল পরে চিরদিনের মতো চোখ বুঁজিবার আগে বোধকরি আজ এই একটি দিনের জন্য—বন্ধু এখন আর নয়—শত্রুপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াইবার সুযোগ হইল। পাশাপাশি দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, শেষ অবধি মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইল।

শ্যামগঞ্জের তুলনায় বরণডাঙার দল সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু কোদালিদের আগলাইয়া চিন্তামণি ও তার সাকরেদরা লোহার প্রাচীরের মতো দাঁড়াইয়াছে। ইহার সামনে শ্যামগঞ্জের ঢালিরা থমকিয়া দাঁড়াইল। ঝপাঝপ কোদাল পড়িতেছে, খালের জল চকে ঢুকিবার একটুকু পথ পাইয়া গেলে রক্ষা থাকিবে না। নরহরি গর্জন করিয়া উঠিলেন, রঘুনাথ সর্দার!

রঘুনাথ পিছন ফিরিয়া তাঁর দিকে চাহিল। সে মুখে কি দেখিতে পাইল সে-ই জানে—ইহাদের প্রথা মতো লাঠি উঁচাইয়া সম্ভাষণ করিল ওস্তাদ চিন্তা-মণিকে। চিন্তামণিও প্রত্যুত্তর দিল। তারপর বাঘের মতো দু-পক্ষ পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। চিন্তামণির হাতের লাঠি দুই খণ্ড হইয়া গেল। অনেক কালের অব্যবহার—ঘুন ধরিয়া গিয়াছিল বোধ হয়। লাঠির টুকরা চিত্তলমারির স্রোতে মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। ক্ষতবিক্ষত চিন্তামণিও ঝোঁক সামলাইতে পারিল না, জলে পড়িল।

আহা-হা!

হাতের বল্লম ফেলিয়া দিয়া রঘুনাথ ওস্তাদকে ধরিতে গেল। বরণডাঙার লোক ইতিমধ্যে এদিকটা একেবারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, রঘুনাথেরই বল্লম কে-

একজন ছুঁড়িয়া মারিল। ফলার অর্ধেকখানি হাঁটুর নিচে গেল বিঁধিয়া। রক্তচক্ষে তীরবর্তী মানুষগুলার দিকে চাহিয়া রঘুনাথ বল্লম টানিয়া উপড়াইল। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়াছে। তীব্র স্রোতে চিন্তামণির অসাড় দেহ পাক খাইয়া ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রঘুনাথ সাঁতরাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ক্ষমতা নাই। যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে অবশেষে খালের ধারে জলকাদার উপর সে বসিয়া পড়িল।

লাঠির টুকরার সঙ্গে চিন্তামণিও কোন দিকে ভাসিয়া গিয়াছে। বরণডাঙার দশ-বারো জন খালের জল তোলপাড় করিয়া তার খোঁজ করিতেছে। নরহরি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আটকাও ওদের—একটা প্রাণী ও-পারে ফিরে যেতে না পারে!

কিন্তু কণ্ঠস্বরে নিজেরই লজ্জা হইল। গলার জোর নাই। ঢালিরা হতভম্ব হইয়া তাঁর দিকে তাকাইয়া আছে। ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বিপক্ষ-দলের লাঠিয়ালদের ধরিয়া ফেলিবার উৎসাহ নাই কারও। নরহরির কণ্ঠে যেন ভাঙা-কাঁসরের আওয়াজ বাহির হইতেছে—আগেকার গাম্ভীর্য, লোকের মনে ত্রাস জাগাইবার সে সামর্থ্য আর নাই। বউভাসির চকের ভিতর কলকল্লোলে জোয়ারের লোনা জল ঢুকিতেছে। বাঁধের উপর যে নালা কাটিয়া দিয়াছে, ভাঙিয়া চুরিয়া দেখিতে দেখিতে তাহা সুপ্রশস্ত হইয়া গেল। নরহরি দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একজনের নজরে পড়িল, দুই বাঁক দূরে কেয়াঝাড়ের শিকড়ের জালে চিন্তামণি আটকাইয়া আছে। সন্তর্পণে শবদেহ তুলিয়া ধরিয়া সাঁতার কাটিয়া সাকরেদরা বরণডাঙার পারে নামাইল। চক্ষু মুদ্রিত, ক্লান্ত বৃদ্ধ যেন ঘুমাইয়া আছে। দু-চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া নরহরি এপার হইতে দেখিতে লাগিলেন।

আর সেই সময় শ্যামগঞ্জের পাষাণ-কক্ষের ভিতর কীর্তিনারায়ণ ছটফট করিতেছে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে প্রথম লড়াইয়ের মুখেই নিজের বোকামির জন্য সে বন্দী হইয়া রহিল—দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখে দেখিবার যে ব্যবস্থা চিন্তামণি

করিয়াছিল, তারও সুযোগ হইল না। নরহরি ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিলেন, তখন দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার বৃত্তান্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উৎসব-কোলাহল স্তব্ধ হইয়াছে। কীর্তিনারায়ণ কিছু জানে না। বাহিরে আসিয়া দেখিল, তার জন্য স্নানের জল তুলিয়া রাখিয়াছে—সুবর্ণলতা তাড়াতাড়ি তেল-গামছা আগাইয়া আনিল। সে দাঁড়াইল না, ধাক্কা দিয়া সুবর্ণকে সরাইয়া দিয়া দ্রুতপায়ে চলিয়া গেল।

আবার নূতন মামলা দায়ের হইল—ফৌজদারি। দাঙ্গা ও খুনজখমের ব্যাপার—সরকার-পক্ষ বাদী এবার। অনেক তদ্বির হইল, জলের মতো অর্থব্যয় হইল। বোধকরি তারই ফলে আসামীদের তেমন গুরুতর দণ্ড হইল না—তিন মাস হইতে তিন বৎসর অবধি জেল। নরহরিরই কেবল সাত বৎসর। ক'জনে ছাড়াও পাইয়া গেল। খোঁড়া পা লইয়া মনিবের পিছু পিছু রঘুনাথ জেলে ঢুকিল। বাঘা চৌধুরিকে জেলে পুরিবে, এ অঞ্চলের কেউ কোনদিন ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

(১)

আবার একদিন নরহরি জেলের বাহিরে আসিলেন। শ্যামকান্ত ও শশি-শেখর ফটকে অপেক্ষা করিতেছিল। বিশীর্ণ চেহারা, অন্ধকার মুখ, চলিতে গিয়া পা টলে—কে বলিবে, এই বাঘা চৌধুরির নামে একদা মালঞ্চের তীরবর্তী অঞ্চল সন্ত্রস্ত থাকিত।

শশিশেখরের খুব পশার বাড়িয়াছে ইতিমধ্যে, কসবার মধ্যে এখন সে বড় উকিল। নিজের বাড়ি তৈয়ারি হইতেছে। আর একটা বড় আনন্দের সংবাদ নরহরিকে দিল—যা লইয়া এত বিরোধ, সেই বউভাসির চক এখন পুরোপুরি শ্যামগঞ্জের কবলে। বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়াছিল, নিলাম খরিদ করিয়া চৌধুরি তরফ এখন নির্ব্যূঢ় স্বত্বে ষোল আনার দখলিকার। কি কৌশলে যে ইহা সম্ভব হইল, ইহার মধ্যে মালাধর শশিশেখর আর শ্যামকান্ত কার কতখানি হাত আছে, তার বিস্তারিত আলোচনা এ জায়গায় চলিতে পারে না—এত অল্প সময়ে সম্ভবও নয়। তবে আর একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়াছে—নিলাম হইয়া যাওয়ার সময় ঘোষ-গিন্নি এত জেদাজেদির সম্পত্তি ঠেকাইবার জন্য নিলাম-রদের চেষ্টা মাত্র করেন নাই। হয়তো এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, একা স্ত্রীলোক গণ্ডমূর্খ লাঠিবাজ এক ছেলের ভরসা করিয়া এত বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে টক্কর দিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন না, শুধু অর্থব্যয়ই সার হইবে। আর বখরার সময় শিবনারায়ণ টাকাকড়ি যা পাইয়াছিলেন, তা-ও নিশ্চয় ফুরাইয়া আসিল এতদিনে। ঘোষ-গিন্নির তাই সুমতি হইয়াছে, নিলামের পর আর উচ্চবাচ্য করেন নাই।

শশিশেখরের বাড়িতে তাঁকে কিছুতে লওয়া গেল না—শহরের লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে গ্রামে ফিরিতে পারিলে নরহরি যেন বাঁচিয়া যান। তিলার্ধ কোথাও বিশ্রাম করিলেন না, সোজা নদীর ঘাটে আসিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিলেন।

বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া নরহরি চিনিতে পারেন না, বছর সাতেকের মধ্যে এমন পরিবর্তন! সে আমলের সদর-বাড়ি এখন পিছনে পড়িয়াছে, বাড়ির মুখ অন্যদিকে। নাককাটির খালের পাশ দিয়া নূতন এক পাকা-রাস্তা মালঞ্চের খেয়াঘাটে গিয়াছে, নদীর ওপার হইতে সেই রাস্তা চলিয়া গিয়াছে একেবারে কসবা অবধি। রান্নাবাড়ি ভাঙিয়া দিয়া বাদামবন কাটিয়া পাকা-রাস্তার ধারে সদর হইয়াছে এখন। হাল আমলের হালকা দালান-কোঠা উঠিয়াছে—নূতন পাঁজার পুরু ইটে গাঁথা পাতলা দেয়াল। একদিকের দু-তিনটা কামরা শ্যামকান্তর অফিস ও খাস-কামরা—চেয়ার টেবিল শৌখিন দেয়ালগিরি আর টানা-পাখায় কেতাদুরস্ত ভাবে সাজানো। অপর দিককার ঘরগুলায় জমিদারি সেরেস্তা। সেখানে সাবেক রীতিতে ফরাসের উপর হাতবাক্স সামনে লইয়া আমলারা কাজকর্ম করিতেছে বটে, তবে কাছারি সকাল-বিকাল না হইয়া দশটা-পাঁচটায় বসিয়া থাকে। মালাধরই সর্বেসর্বা। কিন্তু গা এলাইয়া কাজ করিবার দিন আর নাই। যতক্ষণ অফিস চলে, নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ কারও হয় না। খুব করিৎকর্মা লোক শ্যামকান্ত; এত প্রজাপাটক বিষয়-সম্পত্তি—ইতিমধ্যেই সমস্ত একেবারে যেন মুঠায় পুরিয়া ফেলিয়াছে।

বাড়ি আসিয়া অবধি নরহরি মোটে সোয়াস্তি পাইতেছেন না। মনে হইতেছে, কোন জায়গা হইতে একদিন বিদায় লইয়াছিলেন—আর এ কোথায় ফিরিয়া আসিলেন? নিজের বাড়ি জেলের বেশি হইয়া উঠিয়াছে তাঁর পক্ষে। ঘড়ি-ধরা কাজকর্ম-নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া—একটু দেরি হইলে সরস্বতী আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মুখে কিছু বলে না, দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসে—নরহরি উহাতে বিষম অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। সরস্বতী ইতিমধ্যে পুরাদস্তর গৃহিণী হইয়া পড়িয়াছে এ বাড়ির, বয়সের তুলনায় অনেক ভারিক্কি হইয়াছে। একটি মেয়ে হইয়াছে,

মা হইয়া গৌরব আর অহঙ্কারে যেন সে ফাটিয়া পড়িতেছে। ঠিক ঐ শিশু মেয়েটির মতোই নরহরিকে সে ভাবিতে চায়, তেমনিই তাঁর খবরদারি করিয়া বেড়ায়। নরহরির ধরন-ধারণ ও কথাবার্তা কচি ছেলের মতো মূল্যহীন জানিয়াই সে প্রশ্রয় দিয়া থাকে।

আর মুশকিল স্বর্ণলতার। নরহরি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বাড়ির মধ্যে সে একরূপ একা হইয়া ছিল। সরস্বতী গৃহস্থালিতে মাতিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সখিত্বের বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল তার আর স্বর্ণলতার মধ্যে। নরহরি লাঠি শিখাইতেন—রঘুনাথ ছাড়া পাইয়া আসিয়া মনিবের সেই কাজের ভার লইল। রোজ বিকালে আসিয়া লাঠি শেখায়। শ্যামকান্ত আপত্তি করে নাই, স্বর্ণলতার সম্পর্কে নরহরির যেরূপ অভিপ্রায়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সে ভরসা পায় না। প্রয়োজনও বোধ করে না। হাতে খড়ি নয়—হাতে লাঠি লইয়া এই নরহরিদের শিক্ষা শুরু হইয়াছিল। শ্যামকান্তর বিষয়ে নরহরি নিজের মতলব খাটাইতে পারেন নাই—কতকটা ঐ সময়ে নৌকাবক্ষে খালে বিলে ঘোরাঘুরি করিতে হইত বলিয়া আর কতকটা শিবনারায়ণের প্রভাবে পড়িয়া। মেয়ের বেলা ঐ সব অসুবিধা আর ছিল না।

জেলার বিশিষ্ট লোক বলিয়া জেলের মধ্যেও নরহরি খাতির পাইতেন। প্রচুর অবসর ছিল—সেই সময় বসিয়া বসিয়া এক মহাভারতের পুঁথি নকল করিয়াছেন। নিজের রচনাও কিছু কিছু আছে তার ভিতর। তুলট কাগজে গোটা গোটা পরিচ্ছন্ন অক্ষরে লেখা—পাতার উপর পাতা জমিয়া পুঁথি বিপুলায়তন হইয়াছে। উপরে ও নিচে মলাটের মতো পাতলা চন্দনকাঠের পাটা—পাটা দু-খানিতে দু'টি ছবি আঁকা—সপ্তরথীর অন্যায়-সমরে অভিমন্যু-বধ আর দুর্গম পার্বত্য পথে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান। প্রতি সন্ধ্যায় পুঁথিপাঠের পর নরহরি প্রণাম করিয়া সযত্নে পুঁথি রেশমি সুতায় জড়াইয়া তুলিয়া রাখিয়া দেন।

অপরাহ্নে বসিয়া বসিয়া তিনি স্বর্ণলতার লাঠিখেলা দেখিতেছিলেন। খোঁড়া রঘুনাথ, সে লড়িতে পারে না—কেবলমাত্র কায়দাটা দেখাইয়া দেয় আর মুখে মুখে নির্দেশ দান করে। খেলা করে যমুনা আর স্বর্ণলতা। দেখিয়া দেখিয়া

নরহরির কৌতুক লাগে ; মনের গ্লানি মুছিয়া যায়। এতক্ষণে শ্যামগঞ্জের ভিতর একটুখানি যেন নিজের জায়গা খুঁজিয়া পান। খেলার পরই সন্ধ্যার আগে অন্যান্য দিন রঘুনাথ যমুনার হাত ধরিয়া ঢালিপাড়ায় চলিয়া যায়। সেই যে ঘর ভাঙিয়া বউভাসির কাছারি গড়িয়া দিয়াছিল, সে ঘর অদ্যাপি বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। রঘুনাথ শ্যামকান্তকে কিছু বলেও নাই এ সম্বন্ধে। বাপে মেয়ে ক-বছর ধরিয়া খুড়তুতো ভাই ত্রিলোচনের বাড়ি আছে।

আজ খেলার পর তারা চলিয়া যাইতে পারিল না, নরহরি সকলকে লইয়া মহাকালীর মন্দিরে আরতি দেখিতে গেলেন। দীর্ঘ ঘাস জমিয়াছে উঠানে; তাহার মধ্য দিয়া সরু একপেয়ে পথ সিঁড়ি অবধি গিয়াছে। আমের ডাল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে মন্দিরের চূড়ার উপর ; ডাল হইতে গুলঞ্চলতা নামিয়া আসিয়াছে। হতশ্রী চেহারা। দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, মানুষজন এদিকে বড় একটা আসে না—সেরেস্তার ব্যবস্থা মতো পুরোহিত আসিয়া কোনরকমে পূজার নিয়ম-রক্ষা করিয়া যান।

তারপর নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া নরহরি রেড়ির তেলের দীপের সামনে তাঁর সেই হাতে-লেখা পুঁথি পড়িতে লাগিলেন। রঘুনাথ অন্ধকার কোণটায় দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া থাকে, সে ইহাতে কোন রস পায় না। অস্পষ্ট আলোয় তার অচঞ্চল দেহ-ছায়া প্রাচীন যুগের বিলুপ্তাবশেষ অতিকায় কঙ্কালের মতো দেখায়।

অম্বুবাচী লাগিয়াছে, নরহরির খেয়াল ছিল না। দৈবাৎ জানিতে পারিলেন। কি কাজে কাছারিঘরের দিক দিয়া যাইতেছিলেন, বারাণ্ডায় চাষী-প্রজাদের ভিড়। সেরেস্তা ছাড়িয়া মালাধর বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাকে ঘিরিয়া প্রজারা বলিতেছিল, অম্বুবাচীতে চাষ বন্ধ—তাই এত লোক তারা একত্র হইয়া আসিতে পারিয়াছে ; মালাধর আজকেই যেন দয়া করিয়া হুজুরে হাজির হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। দয়াটা যে নিতান্ত অহৈতুকী হইবে না, মালাধরের চাপা কথাবার্তার মধ্যে তাহা বেশ প্রকট হইতেছে।

লোনা লাগিয়া গত বৎসর ফসল হয় নাই, লোকগুলা কিছু পরিমাণ খাজনা

মক্কুবের দরবারে আসিয়াছে। নরহরি উদাসীন তৃতীয় পক্ষের মতো পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিয়া আসিলেন।

রঘুনাথ তখন আসিয়া গিয়াছে, লাঠি শুরু হইবে এবার। নরহরি বলিলেন, অম্বুবাচীর খবর রাখ সর্দার?

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িল।

কই, টের পাচ্ছি না তো তোমাদের ভাবগতিক দেখে—

ভারি গলায় রঘুনাথ বলিল, সে সব রেওয়াজ উঠে গেছে চৌধুরি মশায়। কেউ আসে না, কারও আর ওসব দিকে ঝোঁক নেই। নইলে কি উঠোনের উপর পায়তারা ভাঁজতাম—বোঠে বাইতে বাইতে হাত পাথা হয়ে যেত না এতক্ষণ?

সেই সব দিনের কথা নরহরির মনে পড়ে—যেন গত জন্মের কথা। অম্বুবাচীর প্রথম দিন নৌকা-বাইচ হইত। এক এক গ্রামের এক এক নৌকা—আট-দশ ক্রোশ দূর হইতেও নৌকা আসিত। পাল্লার নৌকা ছাড়া বাইচ দেখিবার জন্য অনেকে আসিত, নৌকায় নৌকায় মালঞ্চের জল দেখিবার জো থাকিত না। নদীর দু-পারে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। চিত্রমারির মোহানা হইতে পাল্লা শুরু হইত। নাককাটির খালের মুখ ছাড়িয়া আরও প্রায় ক্রোশখানেক আগাইয়া গরিব-কালিবাড়ি নামক এক জায়গা—বিচারকেরা সেইখানে বড় বড় বাচাড়ি-নৌকা নোঙর করিয়া এ-নৌকা ও-নৌকার মধ্যে কাছি টাঙাইয়া অপেক্ষা করিতেন—কারা আগে আসিয়া বৈঠা দিয়া সেই কাছি স্পর্শ করিতে পারে!

শ্যামগঞ্জের বাইচ-ডিঙিতে নরহরি নিজে উঠিয়া বসিতেন। বৈঠা ধরিতেন না—মাঝখানে দাঁড়াইয়া দু-হাত আন্দোলিত করিয়া জোরে বৈঠা বাহিতে সকলকে উৎসাহ দিতেন। সেদিন তিনি নূতন কাপড়চাদর পরিয়া আসিতেন—সেই কাপড়-চাদর মাঝি বখশিশ পাইত। আর সকলে পাইত একখানি করিয়া গামছা। বাইচে হারুক কিম্বা জিতুক, চৌধুরির এ বখশিশ তারা পাইবেই। এ ছাড়া বিজয়ী দলের জন্য থাকিত সুবৃহৎ একটি পিতলের ঘড়া, আর দলের প্রত্যেকের জন্য একখানি নূতন উড়ানি।

·দ্বিতীয় দিন চরের উপর ঢালিরা কুস্তি লড়িত, ঢালিখেলা ও লাঠিখেলা করিত। নরহরি তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। সে একদিন গিয়াছে!

নরহরি প্রশ্ন করিলেন, কালকেও এমনি ঘরকুনো হয়ে থাকতে হবে নাকি? না—না—না, এক্ষুণি তুমি চলে যাও সর্দার, পাড়ায় যারা আছে তাদের বল গিয়ে। গাঙ-পারে লোক পাঠিয়ে দাও। চণ্ডীদ'র চরে সবাই এসে কাল যেন জমায়েত হয়।

আপনি চরে যাবেন চৌধুরি মশায়?

হ্যাঁ—

লাঠি ধরবেন আপনি?

নরহরি ঘাড় নাড়িলেন। হাসিতে রঘুনাথের মুখ ভরিয়া গেল। তা হলে মানুষ-জন দেখবেন কি রকম ভেঙে এসে পড়ে! এবারে বরণডাঙা কানা হয়ে যাবে।

নরহরির চমক লাগিল। ঘোষ-গিন্নি এই দিকে ঝুঁকিয়াছেন নাকি? শিবনারায়ণের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সুমতি হইয়াছে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের?

তারপর যেন অনেকটা নিজের মনেই বলিলেন, তবে আর বউভাসি ছেড়ে দিল কেন এত সহজে?

কিন্তু সৌদামিনী নহেন। কীর্তিনারায়ণ বড় হইবার পর তিনি ধর্মকর্মে মন দিয়াছেন, সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক এখন নিতান্ত যেটুকু নহিলে নয়। বিষয়-আশয় যে ক্রমশ হস্তচ্যুত হইতেছে, তা অনেকটা ঐ উদাসীনতার জন্যই। লাঠিখেলার উদ্যোগ-আয়োজন সমস্ত কীর্তিনারায়ণের। ভানুচাঁদটা আবার ওপারে গিয়া জুটিয়াছে, দু-জনে বড় মিলিয়াছে, অহরহ তারা এইসব লইয়াই আছে।

মাটিতে থুতু ফেলিয়া রঘুনাথ বলিল, দল ছেড়ে ভানু ওপারে গিয়ে উঠেছে। আমরা ফিরে আসব, সে ক'টা দিনও সবুর করল না হতভাগা।

কিন্তু আশ্চর্য, নিজ দলের ঢালির এমন দুষ্কার্যে নরহরি রাগ করিলেন না। বলিলেন, দল আর রয়েছে কোথায়—যে দল ছাড়বার কথা উঠবে? এপারে পড়ে থাকলে শুধু লাঠি নয়, হাতেও ঘুন ধরে যেত। কাঁচা বয়স—পারবে কেন টিকে থাকতে?

একটু হাসিয়া কৌতূহলের স্বরে প্রশ্ন করিলেন, ভানুচাঁদ খুব আজকাল মাতব্বরি করে বেড়ায় বুঝি? বন-গাঁয়ে শিয়াল রাজা হয়েছে?

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলে, কার কাছে মাতব্বরি করবে, কে মানতে যাচ্ছে ওকে? বাপের বেটা কীর্তিনারায়ণ। সাকরেদের হাতে সার্থক লাঠি তুলে দিয়েছিল চিন্তামণি-ওস্তাদ। এক একদিন ভানুচাঁদকে উনি নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেন। আমি এপার থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, দেখে আর পলক ফেলতে ইচ্ছে করে না।

সাবেক কালের মতো ঢালিদের মধ্যে বাঘা চৌধুরি নিজে লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইবেন—বার্তা লইয়া রঘুনাথ পরমোৎসাহে ছুটিল। ঢালিপাড়া হইতে নানা দিকে দলবল পাঠাইয়া দিল। কিন্তু পরদিন যথাকালে চরে আসিয়া দেখা গেল, লোকজন সামান্যই আসিয়াছে। লাঠি খেলিবার জন্য রঘুনাথ যাদের জোগাড় করিয়া আনিয়াছে, লাঠি ভর দিয়া আছে তাই রক্ষা—লাঠি কাঁধে তুলিতে গেলে সেই ভারেই বোধকরি মাটিতে পড়িয়া যাইবে। যারা দেখিতে আসিয়াছে, তারাই এইসব বলিয়া হাসাহাসি করিতে লাগিল।

ওপারে বড় জমজমাট। পিঁপড়ার সারির মতো বাঁধ ধরিয়া মানুষ গিয়া জমিতেছে। নরহরি এপারের দর্শক ক'টির উদ্দেশে বলিলেন, তোমরাও চলে যাও বাপসকল, সাঁকো পার হয়ে তাড়াতাড়ি জায়গা নাওগে। আমরা চেষ্টা করে দেখলাম, পেরে উঠলাম না। কেউ চায় না আমাদের, দেখতেই পাচ্ছ।

রঘুনাথ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। নরহরি হাসিলেন—কান্নার মতো করুণ হাসি। বলিলেন, নদীর এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়ে—নিশ্বাস ফেলে কি হবে? ভাঙা-কূল আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে আমারও ভাল লাগছে না রঘুনাথ। যদি বয়স থাকত, তা হলে ওদের ঐ নতুন কূলে ভানুচাঁদের মতোই গিয়ে নতুন ঘর বাঁধতাম।

সন্ধ্যারতি হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর-দালানে ভিড় নাই। ম্লান ঘৃতের দীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোয় মালতী একা—খেলনার মতো ছোট খাটখানিতে

শ্যামঠাকুরের শয্যা রচনা করিতেছে, মশারি খাটাইতেছে। সহসা সে চমকিয়া উঠিল। থামের ছায়ায় দাঁড়াইয়া একজন নিস্পন্দ কাঠের পুতুলের মতো বিগ্রহের দিকে চাহিয়া আছে। মুখ দেখা যাইতেছে না—সুবিশাল দীর্ঘদেহ।

কে ?

নরহরি মুখ ফিরাইলেন।

মালতী আশ্চর্য হইয়া গেল! চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস হইতে চায় না।

খুড়োমশায় ?

নরহরি বলিলেন, হ্যাঁ মা, আমিই এসেছি।

মালতী সাগ্রহে হাত জড়াইয়া ধরে। বাড়ির ভিতর চলুন আপনি।

এতক্ষণে নরহরি ভাল করিয়া তার দিকে তাকাইলেন, তাকাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেছে, এ খবর ইতিপূর্বেই কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। কচি মুখখানির উপর বিষাদের কথা যেন কঠিন অক্ষরে লেখা হইয়া রহিয়াছে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়, পরে জানা গেল—আগে একবার তার বিয়ে হইয়াছিল, সে পক্ষের এক ছেলে বর্তমান। যে প্রাসাদ দেখাইয়া দিয়াছিল, সেটা বরের নয়—তার জ্ঞাতি সম্পর্কীয় একজনের। ঘোষ-গিন্নি নরহরিকে জানাইয়া ভাল করিয়া খোঁজ-খবর লইয়া যদি সম্বন্ধ করিতেন, তবে কি এমন হইতে পারিত ?

মালতী মাকে খবর দিতে ছুটিয়া গিয়াছে। পুরানো দিনের কথা নরহরির মনে আসে। মহাকালী-মন্দিরে যে কথা জোর করিয়া আদায় করিয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি—হ্যাঁ, তিনিই ভাঙিয়াছেন। ঘোষ-গিন্নি আর কি বিশ্বাস করিবেন তাঁকে ?

সৌদামিনী আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, বাড়ি ঢুকলে না, অতিথি-অভ্যাগতের মতো মন্দিরের চাতালে বসে পড়েছ। রাগ পুষে রেখেছ এখনো এদ্দিন পরে ?

নরহরি বলিলেন, রাগ-অভিমানের ও-পারে আজকে আমি বউঠান্ সন্দেহ হচ্ছে, আমার মৃত্যু হয়ে গেছে।

একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, জেলে গিয়েছিলাম—সে অপমান দু-দিনে জুড়িয়ে যেত। কিন্তু বেরিয়ে এসে দেখছি, গ্রামগঞ্জ আলাদা রকমের হয়ে গেছে। সারা জীবন কাটিয়ে সাত বছরের ফাঁকে সমস্ত আনকোরা নতুন লাগছে। বিকালবেলা খাল-পার থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনার কীর্তিকে দেখছিলাম। কি হাত খুলেছে, মরি মরি! আমার চেনা মানুষ, চেনা জলবল আবার যেন দেখতে পেলাম আজ চারদিন পরে। স্থির থাকতে পারলাম না বউঠান, সাঁকো পেরিয়ে পায়ে পায়ে আপনার বাড়ি চলে এসেছি।

সেই রাতে নরহরি বরণডাঙায় থাকিয়া গেলেন সৌদামিনীর আগ্রহাতিশয্যে। পুরানো দিনের অনেক কথাবার্তা হইল। খাল মজিয়া আসিতেছে। এখন আর খেয়ানৌকার প্রয়োজন হয় না, বাঁশের সাঁকোয় পারাপার চলিয়া থাকে। প্রহরখানেক রাত্রে মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠিল। চারিদিককার মাঠ, গাছপালা, নিষুপ্ত খোড়োঘর, রূপার পাতের মতো দূর-বিস্তৃত মালঞ্চের জলধারা বড় অপরূপ দেখাইতে লাগিল। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা গেল, অতিথিশালার দাওয়ায় মানুষগুলা শুইয়া বসিয়া অলস বিশ্রামে গল্পগুজব করিতেছে। অনেক দিন আগেকার সুপরিচিত দৃশ্যগুলি—নরহরির অন্তরতল অবধি আনন্দে আলোড়িত হইয়া উঠিল। মৃত্যুলোক হইতে জীবন-রাজ্যে ফিরিয়া আসার আনন্দ।

আহারের জায়গা হইয়াছে। নরহরি বলিলেন, খেতে বসব বউঠান, তার আগে একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হবে। নিতান্ত বেহায়া বলেই মুখ ফুটে বলতে পারছি। অনুমতি দিন—কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে আপনার পাদপদ্মে এনে রেখে যাই।

সুবর্ণলতা? সৌদামিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, বলেন কি চৌধুরি ঠাকুরপো? আমার ছেলে লেখাপড়া করল না, কত গরিব আমরা আপনার তুলনায়। বিরোধ কারও সঙ্গে আর রাখব না, স্থির করেছি। কিন্তু এই সম্বন্ধ নিয়ে আবার যে মন-কষাকষি শুরু হবে।

আমিই তো উপযাচক হয়ে এলাম।

শ্যামকান্তর নিশ্চয় আপত্তি হবে।

নরহরি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, তা হবে হয়তো। ওদের পথ আলাদা। বললাম তো, ওদের ঐ দল আমি চিনতে পারি নে। কিন্তু তাকে খুশী করতে গিয়ে অচেনা ঘরে অজানা পাত্রের হাতে মা-মরা মেয়ে আমিই বা কেমন করে বিসর্জন দিই বলুন বউঠান?

হাতজোড় করিলেন নরহরি। বুড়া হইয়া একি অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাঘা চৌধুরির?

সৌদামিনী বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন, পায়ে রেখে যাবার কথা-টথা খবরদার আর মুখ দিয়ে বের করবেন না ঠাকুরপো। স্বর্ণ আমার হেলাফেলার ধন? সত্যি সত্যি যদি এত বড় অনুগ্রহ করেন, মালতীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে বুকখানা জুড়ে থাকবে আমার মা-লক্ষ্মী।

সেদিন ঘড়িতে দশটা বাজিতেই নরহরি সেরেস্তায় ফরাসের উপর চাপিয়া বসিলেন। মালাধর ও আমলারা তাজ্জব হইয়াছে—নরহরির এই মূর্তি কেউই প্রায় দেখে নাই। সাবেক আমলে কখনো কখনো তিনি এইরূপ আসিয়া কাছারি গরম করিতেন। কিন্তু সে শিবনারায়ণ আসিবার পূর্বে—সেই সময়ের কর্মচারী বড় কেউ আর বাঁচিয়া নাই। বসিয়া প্রথমটা নানা খবরাখবর লইলেন, খুব হুকুম ছাড়িতে লাগিলেন। ঢালিপাড়ায় তিনজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিলেন, পাড়ার সকলকে এখনই ডাকিয়া আনিতে হইবে।

ঢালিরা আসিয়া পৌঁছিলে নরহরি শ্যামকান্তকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইঙ্গিতে ঢালিদের কাছে আসিয়া বসিতে বলিলেন। জীবন-মরণ সঙ্কিপথে অনেক কালের সহযাত্রী শিথিল ন্যুব্জদেহ এই মানুষগুলিকে গভীর দৃষ্টিতে তিনি দেখিতে লাগিলেন। পরমাত্মীয়দের কতদিন এমনভাবে দেখেন নাই! সহসা প্রশ্ন করিলেন, ইনাম পাস নি তো তোরা?

নরহরি কি বলিতে চান, না বুঝিয়া তারা ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইল। নরহরি হাসিয়া বলিলেন, তোরা বেকুব—মুখ ফুটে কোনোদিন কিছু চাইতে

শিখলি নে। কিন্তু আমারই কর্তব্য এটা—তোরা না চাইলেও আমাকে গছিয়ে দিতে হবে।

শ্যামকান্ত আসিলে বলিলেন, বসতঘর ভেঙে এনে দিয়েছিল রঘুনাথ। সবাই এরা লাঠি খেয়েছে, হাত-পা ভেঙেছে, জেলে পচেছে—এদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কি করেছ শ্যামকান্ত?

শ্যামকান্ত মুখ নিচু করিল। এত মানুষ—সবাই চুপচাপ, নরহরির মুখের দিকে চাহিয়া বাক্‌শক্তি হঠাৎ যেন বিলুপ্ত হইয়া গেছে।

নরহরি উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, বউভাসির চকের সমস্ত জমি আমি তোদের দিয়ে দিলাম।

সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চকের ভিতর জমি দু-হাজার বিঘার কম নয়। উহার জন্য এত দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনজখম—নরহরিকে জেলে পর্যন্ত যাইতে হইল। জেল হইতে নরহরি মাথা খারাপ হইয়া ফিরিয়াছেন নাকি?

শ্যামকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, যত জমি—সমস্ত দিলেন?

সমস্ত। ওরা অনেক দিয়ে এসেছে আমাদের—এই বাড়ি যেদিন এসে দখল করলাম, সেই তখন থেকে। জন প্রতি দশ-পনের বিঘা না হলে কাচ্চা-বাচ্চা মা-বউর পেট ভরাবে কিসে? আর পেটও ওদের এক একটা ঢাকাই জালা—খাইয়ে দেখলে না তো কোন দিন! আমি দেখেছি।

নরহরি হাসিয়া উঠিলেন। ঢালিদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কাজ থাকল না তোদের আর কারও। আর কোন দিন চৌধুরি-বাড়ি ডাক পড়বে না। আমি হেরেছি, হেরে গিয়ে এতকাল জেলে পচে এলাম সাকোপাঙ্গ নিয়ে—

হাসিয়া অনেকটা যেন নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণ আমাদের গালি দিত, ব্রতচ্যুত আমরা। কে কানে নিল তার কথা? সেই তো হারল সকলের আগে। এবার আমরাও সরে যাচ্ছি। শ্যামকান্তর জিত—ওদের কাল, ওরাই জিতুক। শুনলি তো? তোরা এখন সব শিষ্টশান্ত হয়ে চকের জমি চষবি, খাবি-দাবি, থাকবি—

প্রজাপাটক এবং বাহিরের যত লোক উপস্থিত ছিল, সকলে নরহরির আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

গোলমাল থামিলে আবার নরহরি বলিতে লাগিলেন, দিনকাল বদলে গেছে রে, আইন বড্ড কড়া। গাঙে গাঙে বেড়ানো কি দাঙ্গা-ফ্যাসাদে ঝাঁপিয়ে পড়া আর চলবে না। ভালমানুষ হতে হবে, মালাধর আর শ্যামকান্তর পরামর্শ নিয়ে প্রতি পদ খুব সামাল হয়ে চলতে হবে।

ঢালিরা বলে, গোলা থেকে ধান পাঠানো বন্ধ হল তা হলে চৌধুরি মশায় ?

নরহরি ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন, এখনই কি পেয়ে থাকিস নিয়মমতো ?

ছিলাম ঢালি, আমাদের পুরোপুরি চাষা বানিয়ে দিলে ?

এমন হইল, কেহ আর চোখের জল রাখতে পারে না। সকলের হইয়া গেলে নরহরি রঘুনাথকে ডাকিলেন, শোন সর্দার, কাছে এস—

ডুবন্ত মানুষ তীরের তৃণমুষ্টি যেভাবে চাপিয়া ধরে, নরহরি তেমন ভাবে রঘুনাথকে বুকে টানিয়া লইলেন।

তুমি হলে সর্দার, বন্দোবস্ত আলাদা তোমার সঙ্গে। লাঠি ধরে একলা বিশ-জনের মহড়া নিতে পার, ঢাল-সড়কি নিয়ে দু-শ লোকের ব্যূহ ফুঁড়ে বেরোও, জোয়ারের মালঞ্চ হাসতে হাসতে সাঁতরে পার হয়ে যাও, রাতের মধ্যে আটচালা কাছারিঘর উড়িয়ে এনে চকে বসাও—জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি তোমায় কয়েদ করে রাখলাম।

ম্লান হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, আমার নতুন ঘর-দুয়োর আর হল না তা হলে ?

ছাড়বই না মোটে, ঘরের গরজটা কি ? দু-জন আমরা সেকালের সাথী একসঙ্গে থাকব। আমি যা খাব, তুমি তাই খাবে। যদি কোথাও যাই, তুমি থাকবে সঙ্গে। যেদিন চোখ বুঁজব, ছুটি সেই দিন—তার আগে নয়। একেবারে একা পড়ে গেছি, একজন কাউকে না পেলে থাকি কি করে ভাই ?

বলিতে বলিতে কেউ যাহা কোন দিন দেখে নাই—দু-ফোঁটা অশ্রু বাধা চৌধুরির কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

রঘুনাথ বলিল, ব্যবস্থা মন্দ নয়। ওরা তবু চাষী হয়ে থাকল, আমি গোলাম।

ইতিমধ্যে জনতা বাড়িয়াছে। লোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রঘুনাথের কথা ডুবিয়া গেল তার মধ্যে।

নরহরি উঠিলেন, এবার বাড়ির ভিতর যাইবেন। রঘুনাথ বলিল, আজকের দিনটা আমার ছুটি চৌধুরি মশায়। যমুনার যা হোক একটা ব্যবস্থা করে আসি। আর—

প্রাচীন ঢালি-সর্দারেরও চোখদু'টা চকচক করিয়া উঠিল, মুহূর্তকাল কথা বলিতে পারিল না। শেষে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আর আমাদের লাঠিগুলো বোঝা বেঁধে তুলে রেখে দিয়েছিলাম—আপনার হুকুম নিয়ে বোঝা আবার খুলব, এই মনে করে। সেগুলো মালকে ভাসিয়ে দিয়ে আসিগে।

নরহরি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

আজকে নয় সর্দার। আর একদিন একটিবার শুধু লাঠির দরকার হবে। বরঞ্চ বোঝা খুলে ওদের তেল মাখাতে বলে এস।

শ্যামকান্ত শিহরিয়া উঠে। মালাধরও প্রমাদ গণিল। বউভাসির চকের মতো কোনখানে আবার একটা ধুন্ধুমার বাধাইবার মতলব আছে নাকি?

(২)

সাবেক আমলে যেটা সদর ছিল, এখন অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, নরহরি সেই দিকটায় নূতন চুনকাম করাইলেন। বিয়ে-থাওয়া এই প্রান্তে হইবে। সদরের মাঠে শ-খানেক খড়ের চালা হইল, আবার তার পাশের উলু-ক্ষেতটাও সাফ করিতে লোক লাগাইয়া দিলেন। ঢালির দল সড়কি-লাঠি ফেলিয়া আপাতত ঘর বাঁধিতে লাগিয়াছে। অবাক হইয়া সকলে জিজ্ঞাসা করে, দুটো জায়গা কি হবে চৌধুরি মশায়?

চৌধুরি হাসিয়া বলিলেন, একটায় থাকবে মানুষ, আর একটায় হাতি। বাবাজীবনের দলটা নেহাৎ ছোট নয় তো! আর ওর একজনকেও কি ছেড়ে আসবেন, ভেবেছিস? তোরা ভাল রকম তৈরি থাকবি কিন্তু বাপধনেরা।

আর যাইবে কোথায়! বিয়ের দিন দশেক বাকি, ঢালিরা উৎসাহের প্রাবল্যে এখন হইতে লাফাইতে শুরু করিল। কীর্তিনারায়ণের দলের নামডাক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রঘুনাথের পুরানো দল একটা দিনের জন্য অন্তত ঐ নূতন দলের সঙ্গে মোকাবিলার সুযোগ পাইবে! ক্রমশ এমন হইয়া উঠিল, একটি লোক আর নরহরি ডাকিয়া পান না। কাজকর্ম ফেলিয়া সকলে খালধারে গিয়া লাঠি ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া হাত চোস্ত করিতেছে।

যেন আকাশের চাঁদ ধরা দিয়াছে। মেয়ের বিয়ে দিতে বসিয়া নরহরি মনের আনন্দে দু-হাতে খরচপত্র করিতেছেন। কোন কিছুতে ত্রুটি রাখিবেন না।

সেদিন পূর্ণিমা রাত। আর এমনি দৈবচক্র, বর্ষাকালের আকাশে একখানিও মেঘ নাই, ফুটফুটে জ্যোৎস্না হাসিতেছে। মশাল জ্বালিয়া বাজনা বাজাইয়া মুহুর্মুহু তোপ দাগিয়া বরপক্ষ ফটকের সামনে আসিল। আগে পিছে কীর্তি-নারায়ণের লাঠিয়ালেরা লাঠি উঁচাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া চলিয়াছে। এমন সময়ে বজ্রকণ্ঠের হুকুম আসিল। ডকার থামাও—এটা চৌধুরি-বাড়ি।

ভানুচাঁদ বরের পালকির মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করব?

কীর্তিনারায়ণ চোখ পাকাইয়া বলিল, খোকা হয়ে গেলে ভানু? আমরা কবে কার হুকুম মেনে চলে থাকি?

মানে, বিয়ে কিনা—এটা হল গিয়ে শ্বশুরবাড়ি। ভানুচাঁদ অপ্রতিভ মুখে আমতা-আমতা করিয়া সরিয়া গেল। আরও শতগুণ চিৎকার উঠিল।

শ্যামগঞ্জের ঢালিরা ওদিকে বুক ফুলাইয়া ফটক আটকাইয়া দাঁড়াইয়াছে। খবরদার!

কথাবার্তা আর কিছু নয়—লাঠির পরে লাঠি। তেল-চকচকে পাঁচ-হাতি লাঠি। লাঠির প্রতি গিরায় লোহার আংটা-মারা। সেই লোহায় লোহায় আগুন ছুটিতেছে। মরদ-জোয়ানের তাজা রক্তে বাঁশের লাঠি লাল হইয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ, বাবা গো!—ভানুচাঁদ ভূমি লইয়াছে। চৌধুরি-পক্ষের ক'জন

অমনি ছোঁ মারিয়া আহতকে তুলিয়া লইয়া চলিল সদর-মাঠের খড়ের চালার একটিতে। সহসা দৈববাণীর মতো উপর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে ভাসিয়া আসিল, ওগো কুটুম্বর দল, কেন মারামারি করছ? পেরে উঠবে না। তার চেয়ে চুপচাপ ঢুকে পড়। চৌধুরি-বাড়িতে জকার দিয়ে কেউ ঢুকতে পায় না।

মাথা তুলিয়া সকলে দেখিল, নরহরি চৌধুরি অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বরপক্ষ পিছাইতে পিছাইতে প্রায় এক রশি পিছাইয়া আসিয়াছে। কণ্ঠ নিস্তেজ। ভানুচাঁদ নাই, তাই কারও যেন আর বুকে বল নাই। আবার একজনে পালকির কাছে হুকুম লইতে গেল, কি হবে?

কাপুরুষ! বলিয়া বর রুখিয়া উঠিল। চোখ দিয়া আগুন ছুটিতেছে। দাঙ্গা-ক্ষেত্রের একধারে বোল বেহারা পালকি লইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। কীর্তিনারায়ণ স্থান-কাল ভুলিয়া গেল; একটা লাঠি ছিনাইয়া লইয়া হুঙ্কার দিয়া সে পালকির মধ্যে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। পালকির ছাউনি চড়-চড় করিয়া মাথার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠিল। লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক লাফে সে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবার আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি। সিংহ গর্জন করিতে করিতে ডাইনে বামে সামনে তীরগতিতে চতুর্মুখী খেলা খেলিয়া বেড়াইতেছে। বরের সজ্জায় আরও অপরূপ দেখাইতেছে তাকে। নরহরির সে আমলের নাম-করা ভাল ভাল ঢালি—সকলে ধূলায় লুটোপুটি খাইতে লাগিল। দুঃখে কি আনন্দে বুড়া চৌধুরির চোখের কোণ চক-চক করিয়া উঠিল, আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। অন্তঃপুরে কনে-চন্দন পরিয়া নানা অলঙ্কারে সাজিয়া মেয়ে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিয়া ছিল, গিয়া তার হাত ধরিয়া ডাকিলেন, স্বর্ণ, দেখসে মা, তোর বাবার বাবা এসেছে। উঃ, খেলোয়াড় বটে! দেখে যা—

স্বর্ণলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে চৌধুরি আবার অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বর তখন দলবল লইয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিয়াছে। কপাল কাটিয়া রক্ত দরদর করিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি। সেকেলে পুরাণো বড় বড় মকর-মুখো থাম, চক-মিলানো উঠান, বিপুলায়তন কক্ষগুলি···জয়ধ্বনি তার মধ্যে গমগম করিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রহত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

বিমুগ্ধ দৃষ্টি প্রাণপণে বিসারিত করিয়া নরহরি বলিলেন, যদি বয়স থাকত মা আজ জামাইয়ের সঙ্গে একহাত লড়ে দেখতাম। সার্থক লাঠি ধরা শিখেছে—

কিন্তু স্বর্ণলতার সোনার মতো মুখখানি আজ অন্ধকার। সহসা মেয়ের চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল। বলিল, তুমি লড়বে না বাবা, খোঁড়া রঘুনাথও গাড়ু-গামছা বয়ে বেড়াচ্ছে, চৌধুরি-উঠোনে তাই আজ অমন করে জকার দিয়ে বেড়াতে পারল।

তা হোক, তা হোক—জামাই আজ আমাদের হারিয়ে দিল। বলিতে বলিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া বুড়া চৌধুরির উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল। বলিলেন, তোর বুঝি অপমান হল? আ আমার কপাল!

মেয়ের চোখ মুছাইতে গিয়া হি-হি করিয়া তিনি হাসিয়া আকুল।

সদর-মাঠের সেই একশ' চালায় দু'পক্ষের ঢালি-লাঠিয়ালের বাসা। আর উলুক্ষেত মারিয়া তাদের ছাতা রাখিবার জায়গা হইয়াছে। তালপাতার ছাতা বন্ধ হয় না—মানুষের যা জায়গা লাগে, ছাতারও তাই। বরপক্ষের যারা আহত, চৌধুরির ঢালিরা তাদের রক্ত ধুইয়া দিতেছে, আবার চৌধুরির দলে যারা হাত-পা ভাঙিয়াছে তাদেরও সেবা দু-দলে মিলিয়া মিশিয়া হইতেছে। এখন লাঠালাঠি শেষ হইয়াছে, একই ঘরে এ-দলের ও-দলের একত্র বিছানা।

কিন্তু মুশকিল হইল বরের। মাথায় কাপড়ের পটি বাঁধিয়া বিয়ে হইয়া গেছে, তখন জয়ের আনন্দে মাথার চোট একটুও বাজে নাই। বাসর হইয়াছিল, কত কত মেয়েরা আসিয়াছিল, লাবণ্যমতীরা প্রশংসমান চোখে বার বার তার দিকে তাকাইতেছিল। এ বাসরে আজ লঘু হাসি-পরিহাস জমিতে পারে নাই—ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল ঐ একটি কথা। সবাই বলে—কি চমৎকার! এত সব ব্যাপারের মধ্যে কখন যে মাথা ফাটিয়া সামান্য ক-ফোঁটা রক্ত পড়িয়াছে—সে কথা মনে পড়িবার ফুরসৎ কোথায়?

কিন্তু এখনকার অবস্থা আর এক রকম। সে সব মানুষ-জন চলিয়া গেছে। কোণের দিকে মিটিমিটি একটি প্রদীপ। কীর্তিনারায়ণের মাথার

রগ ফাটিয়া যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল, অথচ মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার জো নাই—শত্রুপক্ষের মেয়েটি খাটের কোণে।

নিস্তব্ধ রাত্রি। দারুণ যন্ত্রণায় কপাল চাপিয়া ধরিয়া কীর্তিনারায়ণ জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না হাসিতেছে। ঝুপসি-ঝুপসি গাছগুলার মাথার উপরে জোনাকি উড়িয়া বেড়াইতেছে। তার উপরে—অনেক উপরে অনন্ত তারকাশ্রেণী। একটুও হাওয়া নাই। ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে, একটা কুয়োপাখী একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে।…কীর্তিনারায়ণ সন্তর্পণে তাকাইয়া দেখিল, শত্রুপক্ষের মেয়েটির একদম সাড়া-শব্দ নাই, জড়সড় হইয়া একই ভাবে পড়িয়া আছে। ঘুমাইতেছে বোধ হয়।

ছত্তোর! দেয় বলে, দিকগে—

বিরক্ত হইয়া কীর্তিনারায়ণ আসিয়া শুইয়া পড়িল। এক হাতে রগ চাপিয়া আর এক হাতে পাখা লইয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

তারপর কখন এক সময়ে তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে, হাতের পাখা খসিয়া পড়িয়াছে। ঘুমের মধ্যে কীর্তিনারায়ণের নাকে আসিল অতি-স্নিগ্ধ একটা গন্ধ, যেন ঝিনঝিন করিয়া ভারি মিষ্ট সুরে কঙ্কণ বাজিতেছে, বাজনার তালে তালে পাখীর পালক দিয়া বুঝি কে মধুর হাওয়া করিতেছে, কপালের কত জায়গায় অনেকগুলা গন্ধ-ভরা ফুল রাখিয়া দিয়াছে…খপ করিয়া সবল মুঠিতে সে ধরিয়া ফেলিল—ফুল নয়—একখানি হাত। চোখ খুলিতে না খুলিতে সুবর্ণলতা অতি অবহেলায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। এত সুন্দর হইয়াছে সুবর্ণলতা, এত বড় হইয়াছে, এমন কোমল মাদকতাময় তার স্পর্শ!

ঘুম ভাঙিয়া কীর্তিনারায়ণ এক মুহূর্তে সকল ব্যথা ভুলিয়া খাড়া হইয়া বসিল। বিস্ময়ে ক্ষণকাল কথা ফুটিল না। বলিল, আমার হাত থেকে তুমি হাত ছাড়িয়ে নিলে?

সুবর্ণলতা কথা কহে না।

কপালে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, এখানে চন্দন লাগিয়েছ তুমি?

শত্রুপক্ষের মেয়েটি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কীর্তিনারায়ণ বাধা দিয়া বলিল, যেও না। পরীক্ষা হোক। হাত দাও—আবার ধরি। আমি ঘুম-চোখে ধরেছিলাম, তাই ছাড়াতে পেরেছ।

সে ধরিতে গেলে স্বর্ণ ছোট্ট পাখীটির মতো যেন উড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেষরাতে অস্তগামী চাঁদের আলো বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ কীর্তিনারায়ণের ঘুম ভাঙিল। দেখে, স্বর্ণলতা ইতিমধ্যে আবার কখন আসিয়া ঘুমাইয়া আছে। পরের মেয়ে—অজানা অচেনা নয় যদিচ, তবু বিপক্ষ দলের লোক—গায়ে আর হাত দিল না। ডাকিল, ওগো কন্যে, শোন—শোন—

হাঁকাহাঁকিতে স্বর্ণ জাগিয়া চোখ মেলিল। কি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছিল, ক্ষীণ মধুর একটু হাসি মুখে লাগিয়া আছে। সন্ধ্যায় চৌধুরি-বাড়ির অপমানের ছায়া-মাত্র আর মুখে নাই। কীর্তিনারায়ণ বলিল, দেখ, একটা পরীক্ষা হওয়া দরকার—

বিয়ের পর এই প্রথম স্বর্ণলতা কথা বলিল, মৃদুস্বরে বলিল, আর একদিন—

ভয় পেয়ে গেলে? হো-হো করিয়া কক্ষ ফাটাইয়া পালোয়ান বর হাসিতে লাগিল। বলিল, এই যে শুনেছিলাম খুড়ো মশায় নিজে তোমায় কুস্তি-কসরৎ শেখাতেন, রঘুনাথও শেখাত। খালি হাত, লাঠি, সড়কি—যা তোমার খুশি। আমার কিছু আপত্তি নেই। আমার হাত যখন ছাড়িয়ে গেলে—ঘুমই হোক যা-ই হোক, একটু-কিছু আছে নিশ্চয়। এস—পরীক্ষা হয়ে যাক—

বধূ মধুর হাসিয়া বলিল, বেশ তো লোক! আমি ঘুমুব না বুঝি, আমার ঘুম পাচ্ছে।

তা হলে হার স্বীকার কর। বল, যে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে হাত ছাড়াতে পেরেছ, নইলে কখনো পারতে না। বল—

তা-ই, তা-ই। বলিয়া স্বচ্ছন্দে পরাজয় মানিয়া স্বর্ণলতা ঘুমাইতে লাগিল।

এ রকম আপোষে জিতিয়া কিন্তু কীর্তিনারায়ণের মনের মধ্যে কাঁটা বিঁধিতে লাগিল; ঘুম হোক, যা-ই হোক—তবু কীর্তিনারায়ণের হাতের মুঠি। বড় বড়

মরদে হিমসিম খাইয়া যায়, আর মেয়েমানুষ হইয়া সে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল!

বর ও বধূ বরণভাণ্ডায় গিয়াছে। কীর্তিনারায়ণ দিন-রাত পরীক্ষার সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু বধূর পাত্তা পাওয়া ভার। সারাদিন উৎসব উপলক্ষে আগত কুটুম্ব-মেয়েদের সঙ্গে হাসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া কাজকর্ম করিয়া বেড়ায়, গভীর রাত্রে নিদ্রা-কাতর চোখে ঘরে আসে। আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে, তখন আর জাগাইয়া তুলিতে মায়া হয়। এমনি করিয়া দিন কাটিয়া যায়, পরীক্ষা আর ঘটিয়া উঠে না।

একদিন ফাঁক পাইয়া কীর্তিনারায়ণ সুবর্ণলতার হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল আজ আর ছাড়ছি নে। কিন্তু ধরিয়াই তখনি ছাড়িয়া দিল। ছি-ছি—এই তাহার প্রতিপক্ষ! হাত তো নয়, যেন একমুঠা তুলা। যেখানটায় ধরিয়াছে, কাঁচা-হলুদের মতো রং একেবারে লাল টকটকে হইয়া উঠিয়াছে। হাসিয়া বলিল, আচ্ছা কুস্তিগির তো! লাঠি-কুস্তি শিখে শিখে এই শরীর বানিয়েছ?

কীর্তিনারায়ণ এতক্ষণে নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলিতে পারিল।

(৩)

আশ্বিন মাস, বাড়িতে পূজা। আবার বধূ আসিল। সৌদামিনীর শুচি-ব্যাধি সম্প্রতি উদ্ভট রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকজনের অভাব নাই, মুখের কথা মুখে থাকিতেই পরম শুদ্ধাচারে বাড়িতে সর্বরকম উদ্যোগ-আয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তাঁর উহাতে তৃপ্তি হয় না, ঘাটে বসিয়া ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া যান। চাতালে বসিয়াও শান্তি নাই, সেখানে কত লোকের আসা-যাওয়া, কত কি অনাচার! জলের ধারে একদিকে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুল-গুঁড়ি; ঐটি তাঁর একান্ত নিজস্ব। ধুইতে ধুইতে কাঠখানা প্রায় সাদা হইয়া উঠিয়াছে।

পূজামণ্ডপে ঢাক বাজিতেছে, অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাইবার কথা। সকাল সকাল সুবর্ণলতা আসিয়াছে, শাশুড়ি আসিয়াছেন, এবাড়ি-ওবাড়ির আরও কটি

মেয়ে আসিয়াছে। পুকুর শুকাইয়া গিয়া তেঁতুল-গুঁড়ি হইতে অনেকটা দূরে জল সরিয়া গিয়াছে। স্বর্ণলতা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, দূর হইতে জল আনিয়া গুঁড়ি ধুইতে মা'র বড় কষ্ট হইতেছে। মাথার উপর খররৌদ্র, এত বেলা পর্যন্ত এখনো তিনি জলগ্রহণ করেন নাই।···সাঁতার দিয়া তীরবেগে সে সেইখানে গিয়া গুঁড়িটা দু-বাহু বেড়িয়া ধরিল।

সৌদামিনী হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন, ছুঁয়ে দিলি পাগলি মেয়ে?

নেয়েছি তো। হাসিয়া ফেলিয়া স্বর্ণ বলিল, কাঠখানা জলের দিকে একটু সরিয়ে দিই—দেব মা?

হুঁ, হাত-পা ভেঙে কাণ্ড কর একখানা।···ওকি? ওকি? ওকি?

সকলের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। বধূ স্বচ্ছন্দে গুঁড়ি তুলিয়া জলের ধারে ফেলিয়া দিল।

আর-আর মেয়েরা ছুটিয়া কাছে চলিয়া আসিল। সকলের মধ্যে পড়িয়া স্বর্ণ লজ্জারক্ত মুখে আঙুলের নখ খুঁটিতেছে। সৌদামিনী আহ্নিক ভুলিয়া একেবারে তাকে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখে পরম স্নেহে বধূর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, সুখে থাক মা-লক্ষ্মী। আমার কীর্তিনারায়ণের জোড়া হয়ে চিরদিন বেঁচে-বর্তে থাক।

মুখ তুলিয়া স্বর্ণলতা আস্তে আস্তে কহিল, কেউ যেন বলে দেয় না মা, তা হলে অনর্থ হবে।

তাহা সকলেই জানে। হাসিমুখে সৌদামিনী মেয়েদের শাসন করিয়া দিলেন, কেউ তোরা বলবি নে কিন্তু—খবরদার!

মায়ের অসুবিধাটা কীর্তিনারায়ণেরও নজরে পড়িয়াছে। পূজা-বাড়ির নানা কাজকর্মের মধ্যে করি-করি করিয়াও এ ক'দিন হইয়া ওঠে নাই, আজ তেল মাখিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া একেবারে সে পুকুরের সেই দিক দিয়া নামিল।

ভাদুচাঁদও নাহিতে আসিয়াছিল, কীর্তিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, যাত্রা শুনে সব তো তোরা বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলি, এদিকে এলি কখন?

ভানুচাঁদ ঘাড় নাড়িল, আসে নাই তো!

গুঁড়িটা দেখাইয়া মহাবিস্ময়ে কীর্তিনারায়ণ তাকাইয়া রহিল।

তবে?

স্নান ঐ পর্যন্ত। মনের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো একটা কথা জাগিল, কীর্তিনারায়ণ ভিজা কাপড়ে অন্তঃপুরে ছুটিল। সৌদামিনী ভগবদ্গীতা পড়িতেছিলেন; খালি চোখে দিব্য পড়িতে পারেন। আর কপালে হোমের ফোঁটা পরিয়া স্নিগ্ধ তদ্গত মুখে সুবর্ণলতা ও মালতী পাশাপাশি বসিয়া পাঠ শুনিতেছিল। ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া কীর্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল, গুঁড়ি কে সরিয়েছে মা?

এক নজর চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সৌদামিনী পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন।

বধূর সঙ্গে কীর্তিনারায়ণের একবার চোখাচোখি হইল, বধূ মুখ নামাইল। অধীর কণ্ঠে কীর্তিনারায়ণ কহিতে লাগিল, ভানুচাঁদও ওটা একা নাড়তে পারে না। আজকে সবাই যাত্রা শুনে ঘুমুচ্ছে—তুমি কোথায় লোক-জন পেলে, কারা সরিয়ে দিল? ও তো এক-আধটা লোকের কাজ নয়—

পড়া থামাইয়া সৌদামিনী বলিলেন, একটা লোকেরই কাজ। তুই এখন নাইতে যা দিকি।

কে লোক? বল বল, নইলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

কীর্তিনারায়ণ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, বুকের উপর থাবা মারিয়া বলিতে লাগিল, আমি—আমি—এ অঞ্চলের মধ্যে একটা মাত্র লোক আছে, যে একলা ঐ কাঠ তুলতে পারে—সে তোমার ছেলে। আর পারতেন হয়তো নরহরি চৌধুরি—জোয়ান বয়সে। নরহরি চৌধুরির মেয়ে তুলেছে কি না—সেই কথাটা তুমি আমায় বল মা। আমি একবার ওর সঙ্গে লড়ে দেখব তা হলে।

বলিয়া সুবর্ণর দিকে এমন তাকাইতে লাগিল যে, ভয় পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। চেঁচামেচিতে আর মেয়েরা যে যেখানে ছিল, আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মালতী সুবর্ণর হাত ধরিল। ফিস-ফিস করিয়া ভয়ের ভঙ্গিতে বলিল, পালিয়ে আয় শিগগির। ভাই আমার বড্ড রেগে গিয়েছে। মেরে বসতে পারে।

বোধ প্রায় সেই রকমই। মালতী ঘাটে ছিল না, কাজেই সবটা জানে না। বৃত্তান্তটা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য হাসিতে হাসিতে স্বর্ণকে লইয়া সে দরজা দিল। দরজার উপর দমাদম লাথি পড়িতেছে। কীর্তিনারায়ণের চিৎকারে চারিদিক চৌচির হইয়া যাইতেছে। বলিতেছে, দুয়োর খোল দিদি। চৌধুরির মেয়ে ফাঁকে ফাঁকে জিতে যাবে, সে আমি কিছুতে হতে দেব না।

লাথির পর লাথি! খিল ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া গেল। দুই হাত কোমরে দিয়া তীব্রদৃষ্টিতে বধূর মুখে চাহিয়া কীর্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল, তুমি গুঁড়ি সরিয়েছ?

বধূর এত যে ভয়, কোথায় যেন চলিয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি কি পারি?

কীর্তিনারায়ণ বলিল, খুব পার! তোমরা বাপে-মেয়ে কি পার আর কি না পার, কিছু বলবার জো নেই। শোন, তোমায় না হারিয়ে আজকে আমি জলস্পর্শ করব না, এই আমার শপথ।

স্বর্ণলতা বলিল, কতবার আমি তো হেরে গেছি।

ছাই হেরেছ। সব মিছামিছি। বাঘা চৌধুরির মেয়ে তুমি, হারতে যে পার না, তা নয়—তবে অত সহজে নয়।

পিতৃগর্বে বধূর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, আমার বাবার হাতে লাঠি কবেই বা দেখলে তুমি! আমিও ভাল করে দেখতে পেলাম কি?

তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবু তো আমাদের হারিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে তুমি জকার দিয়ে এসেছ।

কীর্তিনারায়ণ চোখ ঘুরাইয়া রীতিমতো ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, হার না ছাই! চৌধুরি মশাই লাঠি ধরলে কারও সাধ্য ছিল? তারপর বলিল, শোন চৌধুরির মেয়ে, ঐ খিল-ভাঙা দুয়োর তুমি চেপে ধর। বাইরে থেকে আমি ধাক্কা দিয়ে খুলব। তোমার বাপের দোহাই—ইচ্ছে করে হারতে পারবে না।

মালতী কানে কানে কহিল, ধর্। জব্দ হোক। বড্ড ওর আস্পর্ধা হয়েছে।

তখন পিতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্বর্ণলতা দরজা চাপিয়া দাঁড়াইল। ঐরাবতের বেগে কীর্তিনারায়ণ ধাক্কার পর ধাক্কা দিতেছে, কবাট একবিন্দু নড়ে না। কখন বা মুহূর্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যেন শক্তি সঞ্চয় করিয়া লয়, আবার দ্বিগুণ বিক্রমে ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়ে। বদ্ধ কবাট এতটুকু ফাঁক হয় না। সৌদামিনী এতক্ষণ ইহাদের পাগলামিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে-ছিলেন। তিনি পূজার দালানে চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কীর্তিনারায়ণের সমুদয় রক্ত যেন ঘাম হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, পরিশ্রান্ত সারাদিনের অভুক্ত পালোয়ান অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। অমনি দুয়ার খুলিয়া বধূ পাখা লইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল।

কীর্তি বলিল, থাক পাখা—

কেন? বধূর মুখের উপর অভিমানের ছায়া।

কীর্তিনারায়ণ বলিল, আমি হারি নি এখনো। তুমি ঘরে যাও, আমি আবার দেখব।

বধূ বলিল, আমি হেরেছি। আমি আর পেরে উঠছি নে। ঘরে আমি যাব না।

খবরদার! বলিয়া কীর্তিনারায়ণ হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তোমার গুরুর দোহাই, কক্‌খনো হারতে পারবে না।

বধূ জেদ ধরিল, হারব-ই। এক্ষুণি যদি তুমি নেয়ে এসে খাওয়া-দাওয়া না কর, এই আমি বসে রইলাম—উঠব না, হেরে যাব।

বলিয়া পরম নির্ভয়ে কীর্তিনারায়ণের সামনে সে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল।

কীর্তিনারায়ণ কিছু নরম হইয়া কহিল, শপথ করেছি যে—

হোক গে শপথ।

নড়িয়া চড়িয়া বধূ আরো ভালো হইয়া বসিল।

বলপরীক্ষা মুলতুবি রাখিয়া অগত্যা কীর্তিনারায়ণকে স্নানে যাইতে হইল।

তারপর কোন গতিকে গোগ্রাসে ভোজন সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল এইবার—

স্বর্ণ বলিল, ঠিক তুমি জিতবে। তোমার সঙ্গে কি পারি? সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া কর নি, কেবল খেটে বেড়িয়েছ—তাই অতক্ষণ লড়তে পেরেছিলাম।

স্বামী কিন্তু বিশেষ ভরসা পাইল না। চিন্তিত মুখে বলিল, দেখি তো—

জয় সত্যসত্যই অতি অভাবিত ভাবে হইয়া গেল। দু'টা কি তিনটা ধাক্কা দিয়াছে, দড়াম করিয়া দরজা খুলিল। টাল সামলাইতে না পারিয়া কীর্তিনারায়ণ মেজের উপর পড়িয়া গেল।

বধূ খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। বলিল, হেরে গেলাম।

কিন্তু হারিয়া যে রকম মুখভাব হইবার কথা, মোটেই তাহা নয়। বরঞ্চ যেন সন্দেহ হয়, সে টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

কীর্তিনারায়ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তারপর গর্জিয়া উঠিল, বিশ্বাসঘাতক! যা বললে, তাই-ই করলাম! শপথ ভাঙলাম, স্নান করলাম, খেলাম, আর শেষকালে কি না—

চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। বলিল, এটা কি তোমার উচিত হল স্বর্ণলতা—আশা দিয়ে নিরাশ করা? ফাঁকে ফাঁকে জিতবার মতলব! আচ্ছা, তুমি না হয় বাইরে যাও—আমি দুয়োর চাপি।

না, দুয়োর দেব। স্বর্ণলতা দরজা ভেজাইয়া দিয়া আদেশের ভঙ্গিতে কহিল, উঠে এস। ধূলোয় থেক না বলছি।

কীর্তিনারায়ণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বলিল, না—

এস—বলিয়া স্বর্ণলতা হাত ধরিতেই এক ঝটকায় সে হাত ছাড়াইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করিয়া হাসি। রাগ-অভিমান কোথায় চলিয়া গেল, বিপুল উল্লাসে কীর্তিনারায়ণ হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। বলিল, এইবার তুমি সত্যি সত্যি হেরেছ স্বর্ণলতা। দেখ, হাত ছাড়িয়ে নিলাম, রাখতে পারলে না।

সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। কোথায় শিউলিফুল ফুটিয়াছে, তার গন্ধ আসিতেছে। পূজা-বাড়িতে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিল। অমনি নাটমণ্ডপের দিক দিয়া শত শত কণ্ঠের কোলাহল—

ছোট হুজুর! ছোট হুজুর!

কীর্তিনারায়ণ চমকিয়া বলিল, আমি যাই।

কোথায়?

আজ বীরাষ্টমী। আজকের দিনে বরাবর আমি একটু লাঠি নিয়ে বেরুই। হাজার হাজার লোক দেখতে আসে। ঐ তারা সব ডাক দিচ্ছে।

মহা উৎসাহে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বধূ বলিল, বা রে! সবাই পূজোর দালানে গেছে, একলা এই পুরীর মধ্যে—আমার ভয় করবে না বুঝি?

মুখ ফিরাইয়া কীর্তিনারায়ণ হাসিল। বলিল, এমন ভীরু—ছিঃ! আর এক দফা হার হয়ে গেল কিন্তু।

তখন সুবর্ণ ঝাঁপাইয়া স্বামীর বুকে পড়িয়া সজল চক্ষে কহিল, সবাই ওঁরা ফিরে আসুন, তারপর তুমি যেও। এখন আমি যেতে দেব না—যাও দিকি, কেমন—

হাজার লোকে অধৈর্য হইয়া মুহুর্মুহু বাহিরে ডাকাডাকি করিতেছে। বাহু-বেষ্টনে বন্দী প্যালোয়ান কি আর করিবে—ধীরে ধীরে খাটের উপর আসিয়া বসিল। জল-ভরা মুখের উপর মধুর হাসি হাসিয়া সুবর্ণলতা কহিল, ও বীরপুরুষ, হার হল কার?

চিন্তিত মুখে কীর্তিনারায়ণও তাই ভাবিতেছে, তাই তো, এ হইল কি? এতদিন ধরিয়া এত শিখিয়া এত লোককে হারাইয়া আসিয়া শত্রুপক্ষের মেয়ের কাছে অবশেষে হার হইয়া যায় নাকি?

অন্দর ও সদর-বাড়ির মধ্যে যে উঠান, বিশ-পঁচিশ জন সেই অবধি ধাওয়া করিয়া আসিল। একেবারে কীর্তিনারায়ণের জানালার নিচে আসিয়া ডাকাডাকি লাগাইল, ছোট হুজুর!

সে এমন কাণ্ড, মরা মানুষও নড়িয়া চড়িয়া ওঠে। কিন্তু নিরুপায় কীর্তিনারায়ণ বিপন্ন চোখে সুবর্ণর দিকে চাহিয়া চুপ রহিল।

সুবর্ণলতা পরম নির্বিকার। এত যে চিৎকার, তার যেন কিছুই কানে যাইতেছে না। বাঘা চৌধুরির মেয়ে সে—বাঘে-গরুকে একঘাটে জল খাওয়াইয়া ছাড়িতেন যিনি। সেই চৌধুরির সকল ইজ্জত এরাই ডুবাইয়া দিয়াছে, নরহরিকে আজ একরকম বিবাগী বলিলেই হয়। মা ও ছেলে এ ব্যাপারে কেউই কম যান নাই। আজ সুবর্ণলতা কি হাসিমুখে সেই শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছে?

কীর্তিনারায়ণ বিরক্ত হইয়া কহিল, ওগো শুনতে পাচ্ছ?

নিতান্ত ভালমানুষের মতো বধূ বলিল, ইচ্ছে যদি হয় তো চলে যাও—

কীর্তিনারায়ণ রাগিয়া উঠিল। স্বরের অনুকৃতি করিয়া কহিল, ইচ্ছে যদি হয়…। মুখে তো দিব্যি বলে দেওয়া হল—কিন্তু হাত দিয়ে বেড়া দেওয়া, ইচ্ছেটা হয় কি করে?

কালো কৌতুকচঞ্চল চোখ দু'টি নাচাইয়া সুবর্ণ বলিল, হাত ছাড়িয়ে যাও। পার না? এই জোরের বড়াই করে বেড়াও? ও মহাবীর, এই মুরোদ?

কীর্তিনারায়ণের শিরার মধ্যে রক্ত চনচন করিয়া উঠিল। ভাবিয়াছে কি মেয়েটা? চলিয়া যাওয়া যায় কিনা, একটু দেখাইয়া দিবে নাকি? কিন্তু তা পারিয়া উঠিল না। কথায় কথায় এত খোঁচাইয়া জ্বালাইয়া মারে, তবু মুখখানার দিকে তাকাইয়া মায়া হয় বড়। শুভ্র নিটোল সুকোমল অঙ্গ—একটা আঙুলের ভর সহে না, রক্ত যেন ফাটিয়া পড়ে। এমন অসহায় যে মানুষ—কি করিয়া তার উপর শোধ লওয়া যায়, ভাবিতে গিয়া লাঠিয়াল বর দিশাহারা হইয়া উঠিল। ভাবিল, দূর হোকগে ছাই—কি-ই বা বোঝে সুবর্ণ, আর কি-ই বা বলে! আর হাত সে স্বচ্ছন্দে ছাড়াইয়া লইতে পারে, তাহা তো আগেও দেখিয়াছে। হারিয়া যে হার স্বীকার করে না, তার কথায় রাগ করা বৃথা। জানালায় মুখ বাড়াইয়া নিচের লোকদের বলিয়া দিল, আমি যাব না—তোমরা যাও।

সুবর্ণলতা তখন স্বামীকে ছাড়িয়া একটু দূরে চৌকির উপর গিয়া

বসিল। আলতা-পরা পা দু'খানি আপন মনে দোলাইতে লাগিল, আর টিপিটিপি হাসি। অর্থাৎ পারিলে না তো?

রাগ আর কত সামলান যায়! এক লাফে কীর্তিনারায়ণ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মুখের দিকে চাহিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল, হাসছ যে?

আমার রোগ।

রোগ সেরে দিতে পারি, বুঝলে? কীর্তিনারায়ণ গর্জিয়া উঠিল, চাঁদমুখ থেকে হাসি নিঙড়ে মুছে দিতে পারি। এমন করতে পারি, কান্নায় পথ দেখতে পাবে না।

মেরে? তা তুমি পার। তখন এমন করলে, দিদি তো কেঁপেই খুন। বাবা গো বাবা, এত ভয় মালতী-দিদির? তোমাদের সবারই বড় ভয়।

বলিবার ভঙ্গিটি এমন, রাগিয়া থাকাও মুশকিল।

কীর্তিনারায়ণ বলিল, আশ্চর্য! তোমার কিন্তু একফোঁটা ভয় নেই। চৌধুরি-বাড়ির মেয়ে কি না! কিন্তু আমি মারব-টারব না—এখান থেকে শুধু চলে যাচ্ছি—তুমি একলা-একলা বসে ঢোলের বাজনা শোন আর হাস—

বলিল বটে, কিন্তু যাইবার ভাব নয়। এক মুহূর্ত নীরবে বধূর মুখে চাহিয়া আবার আরম্ভ করিল, শুনি, চৌধুরি মশায় আর রঘুনাথ মিলে কুস্তি-কসরৎ শিখিয়ে বীর কত্তো তৈরি করেছেন। নাটমণ্ডপে ঐ তো হাজার মানুষ জমা করছে আর একটুখানি একলা থাকা যায় না? এখানে সাপ না বাঘ?

স্বর্ণ বলিল, ভূত—

সদম্ভে কীর্তিনারায়ণ বলিতে লাগিল, ভূতের বাপের সাধ্য নেই বরণডাঙার দেউড়ি পার হবে। ভূত-টুত পিষে গুঁড়ো করে দেব না? নতুন এসেছ এখানে—আমাদের প্রতাপ জান না তো!

তবু স্বর্ণর কণ্ঠস্বরে ভয় যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। বলিল, আমি যে দেখছি, সত্যি—নিজের চোখে—

চোখে নয়—মনে। বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ।… কোথায় কি দেখছ? দেখাও দিকি।

এস। দেয়ালে বিলম্বিত আয়নার কাছে বধূ তৎক্ষণাৎ স্বামীকে ভূত দেখাইয়া দিল। তারপর হাসিয়া লুটোপুটি।

তখনই আবার হাসি থামাইল। তাকাইয়া দেখে, কীর্তিনারায়ণের মুখ কি রকম হইয়া গেছে, চোখে জল আসিবার মতো। ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল, ভয়ও হইল একটু। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মুখের নিচে মুখটি নামাইয়া বলিতে লাগিল, রাগ করলে? ঠাট্টা বোঝ না—একটা ঠাট্টা গো! ভূত কাকে বলে জান মশায়?

অভিমানে অপমানে কীর্তিনারায়ণের ওষ্ঠ দু'টি স্ফুরিত হইতেছে। বলিল, না—জানি নে। কিন্তু এটা জানি, হক-না-হক তুমি আমার মান-মর্যাদা নষ্ট করে আমোদ পাও। শ্যামগঞ্জ আর বরণডাঙ্গায় চিরশত্রুতা, সবাই জানে। কেউ কাউকে কসুর করে নি। এবার আর কোনদিকে সুবিধা না পেয়ে চৌধুরি মশায় মেয়ে লেলিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তিনিই এসেছিলেন, আমরা নই। রাগ তুমি কার উপর দেখাও সুবর্ণলতা?

কিসে কি আসিয়া গেল, সুবর্ণ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। কীর্তি-নারায়ণ বলিতে লাগিল, আমি ভূত কি আর-কিছু—একফোঁটা মেয়ে, তুমি তার জানবে কি? জিজ্ঞাসা করে দেখো তোমার বাবাকে, জিজ্ঞাসা করে এস তিনটে জেলার মধ্যে যে যেখানে আছে, আর জিজ্ঞাসা করগে ঐ বাইরে যারা জলে করে মরছে—

কিন্তু বেশিক্ষণ দমিয়া থাকার মেয়ে সুবর্ণ নয়! আ-হা—বলিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া লইল। আবার চাপা হাসি-ভরা উজ্জ্বল মুখে স্বামীর দিকে তাকাইল। বলিল, পুরুষের একেবারে মান গিয়েছে! আর নিজে যে আমায় যা-তা এক ঝুড়ি অপমান করছেন—আমি যদি রাগ করি?

বিস্মিত হইয়া কীর্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল, আমি অপমান করেছি তোমায়? কি বলেছি—বল?

সুবর্ণ দস্তুরমতো ঝগড়া আরম্ভ করিল, আর কি বলবে, শুনি? আমি একফোঁটা মেয়ে—তার মানে, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—একদম গাধা। আর বাবা আমায় লেলিয়ে দিয়েছেন—মানে, আমি কুকুর। আর আমার বয় বড্ড বেশি—মানে বাবার নাম ডোবাচ্ছি। আর কোনটা বলতে বাকি রাখলে?

এ সব আমি বলেছি?

গম্ভীর মুখে সুবর্ণ বলিল, না বলে থাক মানে তো দাঁড়াল এই—

খুব মানে বোধ হয়েছে। না—না—ওর হয়তো আবার মানে হয়ে যাবে, আমি নির্বোধ বললাম। মহা মুশকিল দেখছি। এই রকম উল্টো মানে করলে যে কথা বলাই দায়!

বিব্রত মুখে কীর্তিনারায়ণ চুপ করিল।

সুবর্ণলতা বলিল, আর নিজে বড্ড সোজা মানে ধরেন কিনা! শোন তবে, ভূত বললাম কেন।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া এক মুহূর্ত বোধকরি গল্পটি ভাল করিয়া রচিয়া লইল। বলিল, বিয়ের দিন সমস্ত বেলা না খেয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছি, বাবা চুলের মুঠি ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন, দেখ্ হারামজাদী, তোর বরের কাণ্ড। উঠোনে দেখতে পেলাম, অগুন্তি মাথা—চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটাচ্ছে। আমি বললাম, কই বাবা, ও তো ভূতপ্রেতের দল। ঠাস করে গালে এক চড় কসিয়ে বাবা বললেন, ওরে কাণি ঐ দেখ—। আমি তা বুঝব কি করে? মানুষে বিয়ে করতে যায় চেলী-টোপর পরে দিব্যি কার্তিক ঠাকুরের মতো। লাঠি হাতে মালকোঁচা মেরে হাউ-মাউ-খাউ করতে করতে যাওয়া—এসব তো ভূতের কাণ্ড।

বলিয়া নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া রহিল।

নিজের বীরত্বের কথায় মেঘ কাটিয়া কীর্তিনারায়ণের মুখ প্রসন্ন হইল। তা ছাড়া একটু আগেই নাকি মনের ঝাল ঝাড়িয়া অনেক কিছু বলিয়া ফেলিয়াছে, সুবর্ণলতা কিছুই গায়ে লয় নাই, সেই স্নেহের বাক্যগুলি এখন ফিরিয়া আসিয়া

তাকেই মনে মনে লজ্জা দিতে লাগিল। ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কীর্তিনারায়ণ বলিল, তা হলে একা আমারই কপাল ফাটে নি? চুলের উপর, গালের উপর তোমারও কিছু কিছু ঘটেছিল? অত রাগ তাই আমার উপর?

রাগ অনেক রকমের। এক নম্বর—। বলিতে বলিতে হাস্যমুখী তরুণীর চোখে বুঝি এতক্ষণে দুই বিন্দু অশ্রু ঝকমক করিয়া উঠিল। বলিল, এক নম্বর—তোমরা আমার বাবাকে জেলে দিয়েছিলে, সে তাঁর মরার বাড়া। বেরিয়ে এসে—কেবল ঐ আমার বিয়ের দিনটি ছাড়া, কেউ কোন দিন তাঁকে হাসতে দেখে নি।

গম্ভীর স্বরে কীর্তিনারায়ণ বলিল, কিন্তু তার আগে চিন্তামণি-ওস্তাদকে ঘায়েল করেছিলে তোমরা—সেটা ভুলো না। আমার চিন্তামণি-দাদা!

স্বর্গগত ওস্তাদের উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করিয়া কীর্তিনারায়ণ প্রণাম করিল।

যেন কি হইয়াছে—ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি পাক উঠিয়া পড়ে। যেন আদালতে দুই পক্ষে সওয়াল-জবাব চলিয়াছে। স্বর্ণলতা চুপ করিল। কিন্তু নীরবতা আরও বিশ্রী। হাসিয়া জোর করিয়া কণ্ঠে তরলতা আনিয়া বধূ আরম্ভ করিল, আর দুই নম্বর—চৌধুরি-উঠোনে তোমরা জকার দিয়ে এলে। শ্যামশরণের আমলে শুনেছি নবাবের লোক হাতী-ঘোড়া নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছিল, ঢুকতে পারে নি। তুমি তাই করে এলে, সহজ লোক তুমি? আর, তিন নম্বর—কথায় কথায় চটে ওঠ, যা চুকে-বুকে গেছে তাই নিয়ে খোঁটা দাও, হার মানলেও আমার সঙ্গে লড়তে এস।

হঠাৎ কৃত্রিম ক্রোধে তর্জনের ভাবে স্বর্ণলতা বলিয়া উঠিল, দেখ, মানা করে দিচ্ছি। আর ফের যদি ঐ রকম করবে কোনদিন—তা হলে, তা হলে—

তাহা হইলে কি যে করিবে চারিদিকে তাকাইয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। বলিল, তা হলে এই তোমার গলায় ঝুলে পড়ে চোখ বুজে মরে থাকব।

সমস্ত ঝগড়া-দ্বন্দ্ব মিটাইয়া এক মুহূর্তে নিবিড় বাহু-বেষ্টনে বধূ প্রিয়তমের কণ্ঠ বাঁধিয়া চোখ বুজিল।

লোকেরা গিয়া খবর দিল, ছোট হুজুর আসিবেন না। কেন? সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাদের সাহসে কুলায় নাই। ভানুচাঁদ নাছোড়বান্দা লোক। এত মানুষ-জন আসিয়াছে, ছোট হুজুর বুক ফুলাইয়া সকলের মধ্যে না দাঁড়াইলে কিছুতে সে শান্তি পাইবে না। একাকী সে পুনরায় তত্ত্ব লইতে আসিল।

শরীর-গতিক ভাল আছে তো ছোট হুজুর?

কীর্তিনারায়ণ উত্তর দিল, তোমরা যা পার, কর গিয়ে ভানু। আমার যাওয়া হবে না—মাথা ধরেছে।

বলিয়া খাটের উপর চুপচাপ শুইয়া পড়িল।

এই বীরাষ্টমীর দিনটি বিশেষ একটা দিন। শুইয়া শুইয়া কীর্তিনারায়ণের কত কথা মনে হইতে লাগিল। বউভাসির চক লইয়া যখন নরহরির সঙ্গে ঝড় বাধিয়া ওঠে, আদালতে মিথ্যার জিত হইল—মায়ের আর চিন্তামণির মুখে দীপ্যমান অপমানের অগ্নিশিখা এখনো সে মনে করিতে পারে। মা আজ ধর্মকর্ম লইয়া মাতিয়া আছেন; দেবতা-গোঁসাই ছাড়া সংসারের কুটাগাছির খবর রাখেন না। আজিকার ভক্তিস্নিগ্ধ তদগত মুখখানি দেখিয়া কিছুতে প্রত্যয় হইবে না, ইনি সেই সে-আমলের সৌদামিনী ঠাকরুন। কীর্তিনারায়ণের বয়স তখন আর কতটুকুই বা! এমনি এক বীরষ্টমীর দিন—সেদিন আবার ঝড়বৃষ্টি খুব চাপিয়া পড়িয়াছে, তারই মধ্যে সৌদামিনী ছোট্ট ছেলেকে চিন্তামণি-ওস্তাদের সঙ্গে ঠেলিয়া নাট-মণ্ডপে পাঠাইয়া দিলেন। পিছে পিছে নিজেও চলিলেন। চিন্তামণি সস্নেহে কহিল, ভয় কিসের কর্তা-ভাই? লাঠি ধর, এই এমনি করে। লাঠি সে ধরিতে গেল। মা গর্জন করিয়া উঠিলেন, আগে গুরুবন্দনা কর। গুরুবন্দনা করিতে গেলে ফুটফুটে কোমল অতি-সুন্দর বালককে চিন্তামণি তার লোহার দেহে জড়াইয়া ধরিল। সে গুরু নাই, সে আমলের নাম-করা

লাঠিয়ালদের ক'জনই বা আছে! কিন্তু প্রথম দিনের সে লাঠিখানা আজও রহিয়াছে। প্রতি বৎসর এই দিনটিতে নাটমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সে দেবী-প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর নামে হুকার দিয়া তারপর সেই লাঠিখানি উঁচু করিয়া তুলে। দূর-দূরান্তর হইতে মানুষ কীর্তিনারায়ণের লাঠিখেলা দেখিতে আসে, বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তারা তাকাইয়া দেখে। এবং যে-লোকে আজ গুরু চিন্তামণি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া লাঠি-বাজি করিয়া বেড়াইতেছে, আকাশ ভেদ করিয়া বোধকরি সেই অবধিও তার হুকার পৌঁছিয়া যায়। তিন সালে এই পূজার সময়টা প্রবল বান ডাকে, রাস্তার উপর হাঁটু-জল; রোয়াকে বসিয়া ছিপ ফেলিয়া লোকে পুঁটিমাছ ধরিতে শুরু করিয়াছিল। সেবারেও বাদ যায় নাই, লাঠি মাথায় করিয়া জল ঝাঁপাইয়া আসিয়া কীর্তিনারায়ণ জনহীন নাটমণ্ডপে গুরুবন্দনা সারিয়া গিয়াছিল। ···কিন্তু ভীরু মেয়েটা আজ এমন গণ্ডগোল বাধাইল যে কি করিবে কীর্তিনারায়ণ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। মাথাধরার ছুতা করিয়া অন্ধকার মুখে সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহাতেও নিস্তার নাই। সুবর্ণ বলিল, তাহা মিথ্যে কথাটা বললে?

ও-পক্ষ নিরুত্তর। সুবর্ণ বলিতে লাগিল, মাথা তো ধার নি, গলার ঐখানটা ধরেছিলাম শুধু। খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

গুড়-গুড় করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। লাঠির ঠকাঠক ও সহস্রের বাহবা ধ্বনি একটা মহল পার হইয়া আসিয়া কীর্তিনারায়ণের বুকের মধ্যে মুগুর মারিতে লাগিল। উঠিয়া বসিয়া অধীর হইয়া বলিল, আমার মাথা ধরেছে, তেষ্টা পাচ্ছে, বুক কাঁপছে, হাতদুটো কামড়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সব হচ্ছে। আর ইচ্ছে হচ্ছে, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করি। দোহাই তোমার, তুমি হেসো না অমন করে।

বালাই! হাত কামড়ে খায় কখনো? জল আনছি।

বলিয়া দুষ্ট চাহনি চাহিতে চাহিতে সুবর্ণলতা বাহির হইয়া গেল। গেল তো গেল আর আসিবার নাম নাই।

বাহিরে অবিরত আনন্দ-কোলাহল! কান আর পাতা যায় না।

হুজো!—বলিয়া কীর্তিনারায়ণ জোরে জোরে পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর আরও খানিকক্ষণ পরে এক পা দু'পা করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া ধীরে ধীরে নাটমণ্ডপের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

জনতা জকার দিয়া ওঠে। ভানুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে কীর্তিনারায়ণের দিকে লাঠি আগাইয়া ধরিল। কোলাহল মুহূর্তে একেবারে নিস্তব্ধ। কারও চোখে বোধ করি পলক পড়িতেছে না।

বিনোট—এই খেলার নাম। দেখিয়া মুগ্ধ হইবারই মতো। লাঠি তার হাতের মুঠায় আসিয়া যেন অকস্মাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; ডাহিনে বামে মাথার উপর পায়ের নিচে লাঠিই যেন আপন ইচ্ছায় অতি-দ্রুত চলাফেরা করিতেছে। কীর্তিনারায়ণ ঘুরাইতেছে না, আলগোছে কেবল যেন তার ডান হাতখানির উপর রহিয়াছে। লোকের চোখে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে লাঠি, বোঁ-ও-ও মৃদু মনোরম একটা আওয়াজ শোনা যাইতেছে।

ভানুচাঁদ একটু দূরে গিয়া কীর্তিনারায়ণকে তাক করিয়া ঢিল ছুঁড়িল। লাঠির গায়ে গুঁড়া-গুঁড়া হইয়া ঢিল মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। দেখাদেখি আরও অনেকে ছুঁড়িতেছে, নানা দিক হইতে ঢিল আসিয়া পড়িতেছে। একটিও কীর্তিনারায়ণের গায়ে কেহ লাগাইতে পারিল না। লাঠির উপর পড়িয়া ঠক-ঠক শব্দ হইতেছে, কোনটি ছিটকাইয়া কোন কোনটি ভাঙিয়া ধুলি হইয়া পড়িতেছে। 'বাহবা' 'বাহবা' রব উঠিল চারিদিকে—জন-সমুদ্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল।

কিন্তু একি! ঢিল নয়—স্থলপদ্মের একটি গুচ্ছ মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে উপরের দিক হইতে। উপর হইতে আক্রমণ হইবে, আন্দাজ করিতে পারে নাই। অতিথিশালার ছাতের উপর মেয়েদের জায়গা—সেইখান হইতে আসিল নাকি? দেবীর নির্মাল্য বলিয়া মনে হইতেছে। রক্ষা, মাথায় পড়িয়াছে—মাটিতে পড়িয়া খেলার এই উন্মত্ত ঝোঁকে পদপিষ্ট হইয়া যায় নাই। কে ফেলিল? মা পূজার ঘরে এখনো। মালতী? কিংবা ঘোমটা-ঢাকা পরম লজ্জাবতী ঐ যে একজন দেয়ালের ধারে গুটিসুটি হইয়া আত্মগোপনের চেষ্টা

করিতেছে? কখন আসিল সুবর্ণলতা? জল আনিতে গিয়া এইখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে! ফুলের আঘাত করিয়া সে হারাইয়া দিল, না—ফুল দিয়া অভিনন্দন জানাইল তাকে? মীমাংসা হওয়ার দরকার।

বিনোট চলিতে থাকুক, এ কাহিনীর আমি এইখানে আপাততঃ ছেদ টানিয়া দিলাম। ইহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকুক—রূপকথার শেষে যে রকমটা হইয়া থাকে। আমার তো মনে হইতেছে, রূপকথাই শুনাইয়া আসিলাম এতক্ষণ ধরিয়া।

খরস্রোতে যুগ বহিয়া চলিয়াছে—জোয়ার-প্রমত্ত মালঞ্চ কত ক্ষীণ-বেগ ইহার তুলনায়! স্রোতের খড়কুটার মতো পাশে ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছে অতীতের মানুষ, অতীত-মানুষের ঘর-বাড়ি, আশা-আনন্দ-সাধনা। সেই মানুষগুলির পরমত কাম্য পরের যুগের নবীন দলের নিকট সারহীন কল্পনা-বিলাস বলিয়া ঠেকে অতীত স্মৃতির কয়েকটি টুকরা আমি এই সাজাইয়া-গুছাইয়া ধরিলাম উদ্ধত জীব বর্তমানের সামনে। সেকালের ইহাদের রূঢ় বাস্তবতা যুগান্তরে ক্ষয়িত হই গিয়া কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া মধুর স্বপ্নটুকুই কেবল উত্তর-পুরুষের জন্য রহিয়া গিয়াছে। মানুষের জীবনে একদা সত্যসত্যই এরূপ ঘটিত, তোমাদের হয়তো বিশ্বাস হইবে না। বিশ্বাস না হউক, একেবারে মন্দ লাগিবার কথা তো নয়।

রাষ্ট্রিক রদবদলের আঘাত তখনও দেশের স্নায়ু-কেন্দ্রে পৌছে নাই। শুধু দু-চারিটি জানাশোনা গ্রাম এবং চেনা-জানা মানুষগুলি লইয়াই সমাজ; দূরের হাওয়া—বাহিরের কথাবার্তা একটু-আধটু হয়তো আসিয়া পৌছে, কিন্তু মন অবধি পৌছে না। তারপর তরঙ্গ আসিয়া পড়িল। দীর্ঘদিনের জীবন-ব্যবস্থা টলমল করিয়া উঠিল। সেই তরঙ্গ-বিস্তার আজ তো চোখের উপরেই দেখিতেছি। আমরা দুলিতেছি, ভাসিতেছি, অশ্বের মতো বল্গা পরাইয়া তার উপর আধিপত্য লাভের চেষ্টা করিতেছি। পরবর্তী এ সব কথা শুনিতে চাও তো আবার একদিন আসর করিয়া না হয় শুনাইয়া যাইব।